হিপিরা এসেছিল

সমরেশ মজুমদার

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৭২ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীসুধীর মৈত্র

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

উৎসর্গ

শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

হিপিরা এসেছিল

কাল রাতের বুলেটিনে বি বি সি বলেছিল আজ আকাশ মেঘলা থাকবে। চাই কি, কয়েক পশলা বৃষ্টিও নামবে। অথচ সামার এসে গেছে ক্যালেণ্ডারে। বছরের এই কটা মাস একটু হালকা হয়ে রোদ পোয়ানো, লিজা ঠিক থাকলে গাড়ি নিয়ে ব্ল্যাকহলে চলে যাওয়ার মজা পাওয়া ববের অনেকদিনের অভ্যেস। কনকনে বাতাসটা নেই, টিপটিপ বৃষ্টি বন্ধ, বরফ পড়ছে না, তার বদলে চারধার সবুজে চমৎকার, ভরদুপুরে সোয়েটারের তোয়াক্কা করতে হয় না, এক একদিন কি সুখের ঘাম বের হয় শরীর থেকে। কেডস হাফ প্যাণ্ট আর মোটা গেঞ্জি পরেও পার্কে গিয়ে বসা যায়। মানুষের শরীরটায় যাতে রোদ হাওয়া লাগে তাই তো ঈশ্বর সামার তৈরি করেছেন। মাস দুয়েক, তাই যথেষ্ট। সত্তর বছরের জীবনে যোগ করলে তা অনেক বছর। অথচ এবার মার্চ এসে গেলেও সামারের চরিত্র আসছে না প্রকৃতিতে।

বয়সের অনেক দোষ। কথা বলার ইচ্ছে বাড়ে অথচ লোক কমে যায়। এই গ্রামে তিনটে ক্লাব আছে। একটু বড় ধরনের পাব্ আর কি। তা সেখানে রাত এগারটা পর্যন্ত ছেলে ছোকরাদের ভিড়। বুড়োরা কেউ ধারে কাছে যায় না। বর্ষা বা শীতে তো কারো দেখাই পাওয়া যায় না। সামারে তবু পার্কগুলোয় মুখোমুখি হওয়া যায়। জন অবশ্য তাঁকে বলে মাঝে মাঝে ক্লাবে যেতে। এক বছরের ছোট কিন্তু এখনও টগবগে আছে। নইলে ক্লাব চালায় কি করে। বব জানেন ওখানে গেলে তিনি স্বস্তি পাবেন না। না, ছেলেমেয়েগুলো টকাস টকাস চুমু খাচ্ছে কিংবা মদের ঘোরে এ ওকে জড়িয়ে ধরছে বলে নয়, ও'দের দেখলেই নিজেকে খুব অশক্ত মনে হয়। শরীরের অনেক কিছুই হঠাৎ হঠাৎ অকেজো হয়ে যাচ্ছে। জনের ক্লাবে গেলে সেটা বড় বেশী মনে হয়।

কথা বলার মানুষ নেই। লিজার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বললেই ও চোখ বন্ধ করে হাত তোলে, 'ও বব, একটু চুপ করে থাকতে পারো না? ইণ্ডিয়ান ফিলসফিতে বলে যে চুপ করে থাকে সে বেশি দিন বাঁচে।'

'কি লাভ?' বব জানেন লিজার প্রতিক্রিয়া হবে এবার। চুপচাপ উঠে যাবে। হাসি পায় ববের। যত বয়স হচ্ছে তত দুজনের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। কেউ যেন কাউকে আগে মরতে দেবে না। প্রথমে যাওয়ার কৃতিত্বটা নিজেরই। কারণ যে পড়ে থাকবে তার অবস্থা অনুমানেও আনা যাচ্ছে না। অবশ্য এখন মরার মোটেই বাসনা নেই ববের। যে পৃথিবীতে সামার আসে, টিউলিপ ফোটে সেই পৃথিবীতে অনেকদিন থাকার ইচ্ছে তাঁর। এই খামার, এই ছবির মতো বাড়ি, লিজা, এই বসার ঘর, আরাম চেয়ার আর রঙিন টিভিতে বিবিসির দুটো চ্যানেল, বিজ্ঞাপনসংস্থার সিরিয়ালগুলো—এসব ছেড়ে চট করে

চলে গেলেই হলো !
ঝটপট ব্রেকফাস্ট তৈরি করবো ভেবেছিলেন বব। লিজা এখনও ওপরে। বয়স বাড়লে মেয়েদের ঘুম বাড়ে একথা আগে জানতেন না। ঘুম বাড়ে আর খিট-খিটে হয়ে যায়। অটোমেটিক কেটলির সুইচ অন করে বেসিনের কাছে আসতেই তাঁর বিরক্তি বাড়ল। কাল রাতের ডিনার প্লেট তিনি ধুয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু কারির বাটিগুলো বেসিনে রেখে জলে ভিজিয়ে চলে গেছে লিজা। খুব বেশী ঘুম পেয়েছিল নাকি জানে ভোরে বব আসবে কিচেনে ! নোংরা ফেলে রাখতে পারলেন না বব। শীত হলে গ্লাভস পরতে হত এখন গরম জলের কল খুলে সব ধুয়ে পরিপাটি করে রেখে ডিমের পোচ আর দুটো রুটি সেঁকে নিলেন। একবার মনে হলো অ্যাপল পাই উইদ হট ক্রিম নেবেন নাকি সঙ্গে? আজকাল বড় খেতে ইচ্ছে করে তাঁর! কিন্তু সেদিন উইলি বলল, 'নো বব, আমাদের এখন খাওয়া কমানো উচিত। যা কিছু এতদিন ভালো ছিল তাই এখন শরীরটাকে খারাপ করার জন্যে নখ বের করে বসে আছে।' উইলি অনেকদিন লণ্ডনে ডাক্তারি করেছে। এখন গ্রামে ফিরে এসে সেসব পাটে তুলে দিয়েছে। তবু দেখা হলে ওসব উপদেশ দিতে কার্পণ্য করে না। চা ডিম আর রুটি নিয়ে বব কিচেন থেকে বেরিয়ে বসার ঘরে চলে এসে ট্রেটা টেবিলে রাখলেন। তারপর জানলার পর্দা সরিয়ে কাঁচের আড়ালে আকাশে তাকালেন। রোদের কোনো লক্ষণই নেই অথচ ঘড়িতে এখন সাড়ে আটটা। সূর্য ওঠার সময় অন্তত আড়াইঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। বাগানটায় ঘন ছায়া জড়ানো। এবার আগাছাগুলোতে হাত দেওয়া দরকার। কিন্তু একটু রোদের জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।
খুব মন দিয়ে ব্রেকফাস্ট শেষ করলেন বব। তারপর প্লেটগুলো বেসিনে নিয়ে গিয়ে ভালো করে ধুয়ে আবার আরামকেদারায় ফিরে এলেন। লিজার সাড়া এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। কাল রাত্রে লিজা বলছিল এবার মাদার্স ডে-তে টেড আসতে পারে। দুবছর আসে নি কেউ। এবার মাদার্স ডে-তে টেলিগ্রামের বদলে যদি ও আসে তো ভালো। নিশ্চয়ই বউ মেয়ে নিয়ে আসবে না। টেডের মেয়ে, একমাত্র নাতনী ডেফনি আছে ম্যাঞ্চেস্টারে। সে তো এ তল্লাটে আসেই না। সিঙ্গল মাদার হয়েছে জানার পর লিজা একদিন গিয়ে দেখে এসেছিল তাকে। ফিরে এসে বলেছিল ডেফনি নাকি খুব গর্বিতা। এসব ভাবনা বড় অন্যমনস্ক করে দেয় ববকে। এগিয়ে গিয়ে টিভি খুললেন তিনি! বিবিসি-ওয়ান ওয়েদার ফোরকাস্ট করছে লিখে লিখে। সারাদিন মেঘলা থাকবে তবে বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার হতে পারে। কেন যে বিকেলে আকাশ পরিষ্কার হয়! কি লাভ তাতে। অন্য চ্যানেলগুলোতে এখন তেমন কিছু হচ্ছে না। সকাল বেলায় বাচ্চাদের পড়াশুনা নিয়ে থাকে টিভির চ্যানেলগুলো। গ্রানাডা খুললেও কোনো লাভ হবে না। বৃষ্টি পড়লে অথবা কোনো কাজ হাতে না থাকলে বব এই আরামকেদারায় বসে বিবিসির বদলে গ্রানাডার দিকেই তাকিয়ে থাকেন। ওদের বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো বেশ মজার হয়। আগে ব্রিটিশ টিভির বেশ কনজারভেটিভ মানসিকতা কাজ করত টেলিকাস্টের ব্যাপারে। আমেরিকানদের মতো মেয়েদের

শরীর দেখাতো ওরা ওরা। মাঝে মাঝে রাত বাড়লে ওভার এইট্টিন-এ যে সব ছবি আসতো তাতে সেক্স নেই বললেই চলে। মহিলা প্রধানমন্ত্রী নানান কাজ কর্ম করেছেন বলে শুনেছেন বব। লন্ডনের সোহো থেকে রাস্তার মেয়েদের প্রায় তুলে দিয়েছেন বললেই চলে। কিন্তু টিভিকে অপার ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছেন। গতরাত্রেই যে ছবিটা তাঁরা দেখেছেন দশ বছর আগে তা টিভিতে ভাবা যেত না। লিজা আর তিনি ডিনারের পর পাশাপাশি বসে টিভি দেখছিলেন। বিজ্ঞাপনের পর একটি সজ্জা সিরিয়াল সুরু হলো। মডেল মেয়েটিকে চার পাঁচজন ক্যামেরাম্যান বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসিয়ে ছবি তুলছে। ক্রমশ মেয়েটির ওপরের পোশাক খুলে ছবি তুলল ওরা। কিন্তু সে ব্যাপারে একজন অল্প বয়স্ক ক্যামেরাম্যান নার্ভাস হয়ে পড়ায় পোড়-খাওয়া আর একজন বিভিন্নরকম লাস্যময়ী ছবি তুলতে তুলতে মেয়েটিকে আরও নগ্ন হবার অথচ সামান্য আবরণ রাখার ইঙ্গিত করতেই মেয়েটি খেপে গেল। সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ওই ধাস্টামির বিরুদ্ধে গালাগাল দিতে লাগল। এই দৃশ্য দেখামাত্রই লিজা উঠে গেল ওপরে। বব-এরও অত্যন্ত অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু যাওয়ার আগে যখন লিজা রাবিশ বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল তখন তিনি বলে ফেললেন, 'কোন্ কোন্ ছবি আন্ডার এইট্টিন এবং অ্যাবাভ সিক্সটির মেয়েদের দেখতে নেই।' নেহাৎই রসিকতা কিন্তু শোওয়ার ঘরে পেঁাছে দেখেন লিজা ঘুমিয়ে পড়েছে। এটা তাঁর ওপরে অভিমান থেকেই বুঝতে অসুবিধে হয় নি। আজকাল সময় কাটানোর অদ্ভুত ভালো বন্ধু টিভি! বব-এর অবশ্য এইসব ছবি মন্দ লাগে না। কেমন একটা নস্ট্যালজিক ফিলিংস হয়।

বোতাম টিপে চ্যানেল ঘোরাতেই খবর পড়া শুরু হলো। যে মেয়েটি এইসময় খবর পড়ে সে সত্যিই সুন্দরী। মুখখানা যদিও বড় কিন্তু অদ্ভুত আদুরে ভঙ্গী আছে চোখের পাতায়, ঠোঁটের কোণে। শিক্ষা দপ্তরের নবনিযুক্ত সেক্রেটারি একটা প্রাইমারি স্কুলে হাজির হয়েছেন সাতসকালে। হিথরো এয়ারপোর্টে গত রাতে সত্তর হাজার পাউন্ডের মাদকদ্রব্য ধরা পড়েছে। তারপরেই পাঠিকা বললেন, 'হিপিস আর কামিং।'

বব দেখলেন হাইওয়ে দিয়ে একটা বিশাল কনভয় যাচ্ছে। ধারাভাষ্যকার জানা-চ্ছেন আড়াই হাজার হিপি তাদের ক্যারাভান এবং গাড়ি দিয়ে ইংলন্ডের শেষ-প্রান্তে চলেছে। এইসব হিপিদের মধ্যে যুবক-যুবতী এবং শিশুও আছে। পুলিস তাদের রুট বদলাতে বললে তারা হাইওয়ে বন্ধ করে দেয় গাড়ি দিয়ে। ফলে হাজার হাজার গাড়ি জ্যামে পড়ে যায়। পুলিসের সঙ্গে হিপিদের আলোচনা চলছে। হিপিরা কোনোভাবেই রুট বদলাতে রাজী নয়। পুলিস এই মিছিলকে বেআইনী ঘোষণা করতে চলেছে। হিপিরা তাদের বক্তব্য থেকে সরতে মোটেই রাজী নয়।

বব সোজা হয়ে বসলেন। দাড়িওয়ালা নোংরা পোশাকের একটি হিপি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলছিল, 'রুট বদলালে আমাদের পেট্রল থাকবে না, খাবার থাকবে না। এমনিতেই খুব টাকার অভাবে আছি আমরা। আমি ভেবে পাই না সাধারণ

মানুষ কেন আমাদের বন্ধু বলে ভাবে না।' পুলিসের কর্তা তাদের আধঘণ্টা সময় দিয়েছেন।
হিপিগুলোকে দেখামাত্র ববের শরীরে অস্বস্তি শুরু হলো। কোনো কোনো হিপি আবার পাঙ্কদের মতো খোঁচাছাঁট চুলে রঙ বুলিয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব বলে মনে হচ্ছিল ববের। ওরা আছে এই গ্রাম থেকে একশ মাইল উত্তরে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিজেদের রুটে চললে ওদের দেখতে হবে না। বব ভেবে পাচ্ছিলেন না পুলিস কেন ওদের এত খাতির করছে। নিশ্চয়ই বেকারভাতা হিসেবে ষাট পাউণ্ড ডোল পায় ওরা। ষাট পাউণ্ড ফালতু পেলে গাঁজা কিংবা ট্যাবলেট খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে একটা সপ্তাহ। তারমনে হলো এখনই খবরের কাগজে একটা চিঠি লেখা উচিত। বব উঠে তাঁর লেখার কাগজ এনে বসলেন। টেলিগ্রাফের সম্পাদককে তিনি লিখলেন, ব্রিটেনের একজন নাগরিক হিসেবে তিনি এবং তাঁর মতো যাঁরা নিয়মিত ট্যাক্স দিয়ে থাকেন তাঁদের নিশ্চয়ই জানবার অধিকার আছে কেন তাঁদের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় হিপিদের পোষা হচ্ছে। ওরা কেন বেকার ভাতা পায়। এরা যদি সবাই জন্মসূত্রে ব্রিটিশ হয়েও থাকে তাহলে সেই অধিকার অবিলম্বে কেড়ে নিয়ে ওদের এমন একটা দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত যেখান থেকে কখনই সভ্যজগতে ফিরে আসতে পারবে না। পুলিস যে কেন ওদের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের সম্মান দিয়ে ব্যবহার করছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না।
চিঠিটা শেষ করে খামে পুরে উঠে দাঁড়াতেই লিজা ঘরে ঢুকলেন, 'গুড মর্নিং।' বব সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি তো খুব ঘুমাচ্ছ, এদিকে হিপিরা রাস্তা জুড়ে বসে আছে।'
'হিপি ? কোথায় ? এখানে ? আমাদের গ্রামে ?' লিজা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।
'আঃ ! এখানে হতে যাবে কেন ?' বেশ বিরক্ত হলেন এমন অলুক্ষুণে কথায়, 'ওরা হাইওয়েতে আছে। একশ মাইল উত্তরে। এদিকে আসবে কেন ওরা ? ও হ্যাঁ, তুমি কারির বাটিগুলো কাল রাত্রে ধুয়ে যাওনি। অথচ এখানে বসে টিভি দেখলে। তোমার চেয়ে আমি পাঁচ বছরের বড়। অথচ আমাকেই সব কাজ করতে হচ্ছে। এটা ভালো কথা নয়।'
লিজা বললেন, 'পাঁচ নয়, চার। বব তোমার আজকাল হিসেবের খুব ভুল হয়ে যাচ্ছে।'
'কি করে হলো, যখন তোমাকে বিয়ে করেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল বাইশ আর তুমি সতের।'
'তুমি বিয়ে করোনি, আমরা করেছিলাম। তোমার বয়স তখন একুশ। কত বছর বিয়ে হয়েছে একবার গুনে দ্যাখো। বড্ড বাজে কথা বল তুমি। হ্যাঁ, হিপিদের কথা তোমাকে কে বলল ?' লিজা কিচেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।
'টেলিভিশন। তুমি তো কখনও নিউজ শুনতে সময় পাও না। পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তার খবর রাখ ? চোখ বুজে পৃথিবীতে বেঁচে আছ কি করে তুমিই

জানো।' বব দেখলেন টিভি-তে এবার খেলার খবর দেখাচ্ছে। মেক্সিকোয় ইংলণ্ড খুব দূরবস্থায় আছে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইন্যাল রাউণ্ডে উঠতে পারে কিনা সন্দেহ। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড আর স্কটল্যাণ্ড-এর অবস্থা তো আরও শোচনীয়। ব্রিটেনের খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। বব মগ্ন হয়ে গেলেন গতরাত্রে কেন ইংলণ্ড হারল তার ব্যাখ্যা শুনতে।

লিজা তাঁর ব্রেকফাস্ট তৈরি করে এসে উল্টোদিকের টেবিলে বসলেন। বৃদ্ধা হলেও তাঁর মুখ চোখে তেমন আঁচড় পড়ে নি। যদিও শরীরের চামড়া ঢিলে হয়েছে, চশমার শক্তি বেড়েছে আর বেশীক্ষণ হাঁটলে বড় হাঁফ ধরে। কিছুক্ষণ টিভির দিকে তাকিয়ে থেকে লিজা বুঝতে পারছিলেন না ও নিয়ে এত মাতামাতি করার কি আছে। আজকাল ক্রিকেট টিম তো খেলতে নামলেই হেরে যাচ্ছে অথচ তাতে কারও দুশ্চিন্তা হচ্ছে না। অথচ ফুটবলে হারলেই গেল গেল রব উঠছে। বব তো জীবনে ফুটবল মাঠে যায় নি, কিন্তু দ্যাখো, এমন মুখ করে বসে আছে যেন ওই টিমের কোচ। লিজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই হিপিগুলোকে দেখতে কেমন?'

বব হাত তুলে কথা বলতে নিষেধ করলেন।

লিজা খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'রাবিস!'

বব বললেন, 'যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। এত টাকা খরচ করে টিম করা হলো আর একটা ড্র একটা হেরে বসে আছে। এটা আমাদের জাতীয় অপমান।'

'হিপিরা কেমন দেখতে?

'হিপিদের মতন।' বব অন্যমনস্ক গলায় জবাব দিলেন।

'আঃ বব!' লিজা চোখ বন্ধ করতে টিভির পর্দায় আবার হাইওয়ের ছবি ফুটে উঠল। বব বললেন, 'আবার দেখাচ্ছে। এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন ওরা?'

লিজা চোখ খুললেন। ছেঁড়া জিনসের প্যান্ট জ্যাকেট পরা দাড়ি-মুখো একটা লোক টিভির প্রতিনিধিকে বলছে, 'পুলিস আমাদের বলছে রুট পাল্টাতে। কিন্তু আমাদের যা টাকা আছে তাতে ঘুর পথে তেল যা লাগবে কিনতে পারবো না। তাছাড়া হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার অধিকার আছে আমাদের। তাই না?'

পুলিস অফিসার বললেন, 'এই হাইওয়ে সব সময় খুব বিজি থাকে। হিপিরা তাদের ক্যারাভান নিয়ে যেভাবে যাচ্ছে তাতে রাস্তা আটকে থাকছে। ওরা যেখানে ইচ্ছে সেখানে থেমে আরও সমস্যা তৈরি করছে। আমরা ওদের আটকাতে চাইছি না, শুধু বলছি যাওয়ার পথটা পাল্টাতে। যে সময় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ওরা যদি কথা না শোনে তাহলে অ্যাকসন নিতে বাধ্য হব।'

বব বললেন, 'বেশী ভদ্রতা করে আমাদের জাতটা শেষ হয়ে গেল।'

লিজা বললেন, 'ওরা এত কষ্ট করে কেন? চাকরি-বাকরি করে ভালোভাবে বাঁচতে পারে তো!'

'আহা, দ্যাখো দ্যাখো, দুধের বাচ্চাটার পায়ে মোজা পর্যন্ত নেই। ইস!'

বব উঠে পড়লেন, 'আর ইস টিস বলতে হবে না। ক্যারাভান অফ বাস্টার্ড'স।

হিপিরা কেমন দেখতে জিজ্ঞাসা করেছিলে না ? এখন প্রাণভরে দেখে নাও। আমি একটু ঘুরে আসছি।'

'এই ওয়েদারে বাইরে যেতেই হবে ? কার্পেটগুলো পরিষ্কার করার কথা ছিল আজ।'

'চিঠি পোস্ট করতে যাচ্ছি। ওটা আরও জরুরী।'

মর্নিং জ্যাকেটটা পরার পর ছাতা নিলেন বব। তারপর দরজা টেনে দিয়ে বাইরে এসে চারপাশে তাকালেন। রাস্তাঘাটে লোকজন নেই। ববের বাড়িটা গ্রামের একপাশে। ঠিক উল্টো দিকে টেডের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স। তার পাশে নতুন জামাপ্যান্টের দোকান খুলেছে ওস্কার নামের একটা ছোকরা। বব আকাশের দিকে তাকালেন। এখনই নামবে মনে হয় না। রাস্তাটা পার হয়ে তিনি টেডের দোকানে ঢুকলেন। দুটো মেয়ে কাজ করে এখানে। টেড শুধু ঘুরে ঘুরে দ্যাখে। বুড়ি আর্নল্ড তখন জিনিসপত্র ট্রলিতে নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারের দিকে আসছিলেন। ববকে দেখে বললেন, 'কি দিন এল বব ! সামার বলে একে ? ভগবানের কি ইচ্ছে বলতো ?'

বব মাথা নাড়লেন, 'এ কথাই আমি ভাবছিলাম।'

'ভাববেই তো। আমাদের, যাদের বয়স হয়েছে তারা তো এই সময়টুকুর জন্যে হাঁ করে বসে থাকি। ববের কথাটা খারাপ লাগল। অন্তত কুড়ি বছর তিনি মিসেস আর্নল্ডকে এই চেহারায় দেখে আসছেন। লোকে আর মিসেস বলে না এখন। বুড়ি আর্নল্ড আজ তাকেও নিজের দলে টানল ! তিনি তো অত বৃদ্ধ হননি। দাম মিটিয়ে জিনিসপত্র ব্যাগে ঝুলিয়ে বুড়ি আর্নল্ড জিজ্ঞাসা করলেন, 'লিজা কেমন আছে ? অনেকদিন দেখিনি মেয়েটাকে। তোমাদের নাতনি শুনলাম সিঙ্গল লাইফ কাটাচ্ছে ? লিজাকে বলো তো একদিন আসতে, ওর কাছে গল্প শুনবো।'

টেড এলো। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'হ্যালো বব। দিনটার চেহারা দেখেছ ? সামারের অবস্থা যদি এই রকম হয় তাহলে বেঁচে থাকার কোনো মানে থাকে না। চললে কোথায় ?'

'চিঠিটা পোস্ট করব বলে বেরিয়েছিলাম। আজ টিভিতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। হিপিরা ক্যারাভান নিয়ে হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস পথটা আমাদের গ্রামের উল্টোদিকে। কি চেহারা, ভয়ংকর। আর পুলিসের অবস্থা দ্যাখো, ওদের তোয়াজ করছে।' বব উষ্ণ গলায় খবরটা দিলেন। অথচ টেডের এদিকে মনই নেই। তার চোখ কাউন্টারে বসা একটি মেয়ের দিকে। সে ফোনে হেসে হেসে কথা বলছে। টেড বলল, 'আজকালকার মেয়েরা প্রেমের অর্ধেকটা টেলিফোনেই শেষ করে দেয়। তুমি বেশ আছ বব। কাজকর্ম তেমন করতে হয় না, টিভি দেখে বেশ সময় কাটিয়ে দিচ্ছ।'

একটু বিরক্ত হয়েই বব দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। টেডের সঙ্গে আজকাল বেশীক্ষণ কথা বলা যায় না। সব সময় অন্যদের সুখী দ্যাখে ও। এই সময় কানে এলো ওস্কার তাকে ডাকছে, 'হ্যালো বব। চললে কোথায় ?'

ওস্কারের মুখের দিকে তাকালেন বব। ছোকরা কথা বলার সময় এমন একটা হাসি ঝুলিয়ে রাখে যে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ্যালো ওস্কার।' তারপর আর কথা না বলে পা বাড়ালেন। গ্রামটা মোটামুটি একটি রাস্তার দুধারে বাড়িঘর নিয়ে। বাইলেনগুলো আছে কিন্তু সে দিকটা জমাটি নয়। পোস্ট-অফিসে যাওয়ার পথেই তিনটে ক্লাব কাম পাব্। জনের ক্লাব এখন বন্ধ। নির্ঘাৎ ঘুমাচ্ছে সে। শনি রবি তো রাস্তায় লোক থাকেই না বলতে গেলে। রাত তিনটে পর্যন্ত ক্লাবে ক্লাবে হইচই করলে কি পরের দিন জেগে থাকা যায় ?

ঝকঝকে পিচের রাস্তার দুপাশে দোতলা বাড়িগুলো। বব জন্ম ইস্তক এমন দ্যাখে নি। বাড়িগুলো পরে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষ আসে নি পাকাপাকি বাইরে থেকে থাকতে। তবে দুটো ব্যাংকে কাজ করতে যারা বদলি হয়ে আসে অথবা অন্য সরকারি অফিসগুলোতে যারা কাজের জন্যে এসেছে তাদের কথা আলাদা। এই গ্রামের যাবতীয় ব্যবসা গ্রামের মানুষেরাই করে থাকে। এদের প্রত্যেককেই তিনি চেনেন। 'হ্যালো বব।'

বব ঘুরে দাঁড়ালেন। ওপরের জানলায় ঝুঁকে মেয়েটা তাকে ডাকছে, 'কাম হিয়ার।' বব একটু ইতস্তত করলেন। চিঠিটা পোস্ট করা দরকার। নইলে বিকেলেও লণ্ডনে পৌঁছাবে না। তিনি হাত নাড়লেন, 'আমি আসছি, অ্যান। একটা জরুরী চিঠি পোস্ট করার আছে।'

পোস্ট অফিসে গিয়ে বাক্সে নয়, একদম মিস্টার জোন্সের হাতে খামটা দিলেন বব। মিস্টার জোন্স খুব ঠাণ্ডা লোক। ব্ল্যাকপুলের দিকে বাড়ি। লাল দাড়ি সুন্দর করে ছাঁটেন। চিঠিতে ছাপ মেরে মিস্টার জোন্স বললেন, 'একটা খবর দিচ্ছি বব। আমাকে ট্রান্সফার করেছে। ম্যাঞ্চেস্টারে জয়েন করতে হবে কাল। ইনি হচ্ছেন তোমাদের নতুন পোস্টমাস্টার মিঃ হ্যারল্ড স্মিথ।'

উল্টোদিকের চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে একটা ছোকরা পাইপ খাচ্ছিল। মিস্টার জোন্স তাকে বললেন, 'মিট মিস্টার রবার্ট। এখানকার পুরোন মানুষ।'

'আলাপ করে খুশী হলাম।' মিস্টার স্মিথ বলল, 'কিন্তু জোন্স তুমি এখানে তিন বছর থাকলে কি করে? একটা ভালো ক্লাব নেই, ফুর্তি করার জায়গা নেই।'

মিস্টার জোন্স বললেন, 'এঁরা ছিলেন তাই ওসবের দরকার হয় নি।'

বব বললেন, 'জোন্স তুমি চলে যাচ্ছ বলে খারাপ লাগছে। পৃথিবীর নিয়মটাই হলো ভালো মানুষরা বেশীদিন থাকে না। আমার ঠিকানা তো তুমি জানো, মাঝে মাঝে চিঠি দিলে খুশী হব।'

বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকালেন বব। মেঘ নেমে এসেচে নিচে। একটা ছোকরাকে ওরা পোস্ট মাস্টার করে পাঠাল ? ছোকরা এখানে এসেই নালিশ করছে ফুর্তি করার জায়গা না পেয়ে। বিয়ে থা করেছে কিনা কে জানে। যদি উল্টোপাল্টা কাজ করে তাহলে আবার চিঠি লিখতে হবে। ব্রিটিশ সরকার এখনও অভিযোগ করলে বিচার করে।

ওপাশে একটা ক্যাসিনো। জুয়ো খেলার একটা চমৎকার আড্ডা। তবে আঠারো

বছরের নিচের ছেলেদের ওখানে ঢোকা নিষেধ। বব নিজেও মেম্বার। কিন্তু হেরে যাওয়ার মতো পয়সা নেই বলে তিনি সচরাচর যান না। বব দেখলেন ক্যাসিনোর দরজা খোলা। একটু বিস্মিত হলেন তিনি। আজ সারা গ্রাম যখন রাত জেগে ঘুমাচ্ছে..তখন ক্যাসিনো কি করে খোলা থাকছে? সিঁড়ি ভেঙে দরজা ডিঙিয়ে ঢুকতেই ম্যাথুজকে দেখতে পেলেন। ম্যাথুজ এখানকার একজন ডোরম্যান। এই গ্রামে এটা একটা লোভনীয় চাকরি। পাব, কাম ক্লাব, রেস্টুরেন্ট এবং ক্যাসিনোর জন্য ডোরম্যানদের রাখা হয়। কিছু ছেলে যাদের স্বাস্থ্য ভালো, নিয়মিত শরীরচর্চা করে, তারা বক্সিং শিখে নিয়ে এই চাকরিতে যোগ দেয়। ডোরমেন অ্যাসোসিয়েসন আছে একটা, তারাই যোগান দেয়। কিন্তু যেহেতু ওদের চাকরির জায়গা কম তাই বেচারাদের অন্য গ্রামে যেতে হয়। ম্যাথুজ মাথা নাড়ল, 'গুড মর্নিং, বব।'

বব জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ তোমাদের খোলা?'

ম্যাথুজ হাসল, 'মিসেস হোমস সব সময় খোলা রাখতে পারলে খুশী হন।'

খাতায় সই করে ভেতরে ঢুকলেন বব। পুরো ক্যাসিনো ফাঁকা। তিনটে মেয়ে একটা জায়গায় বসে গল্প করছে। আঠারো থেকে কুড়ি ওদের বয়স। বাপমাকে তিনি নিশ্চয়ই চিনবেন। ওঁকে দেখে একটি কালো মোটা মেয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খেলবে তুমি?'

বব চারপাশে তাকালেন। ওপাশে একটা ডিস্ক ঘুরছে। তার পাশেই লম্বা বোর্ডে ঘর কাটা। প্রত্যেক ঘরে একটা করে নম্বর। সেই নম্বরের একটায় পেনি কিংবা পাউন্ড রাখলে মেয়েটা গিয়ে ডিস্কের মধ্যে একটা সীসের বল ফেলে দেবে। ঘুরতে ঘুরতে বলটা ডিস্কের সঙ্গে যেখানে থামবে সেখানে একটা নম্বর পাওয়া যাবে। সেই নম্বরের সঙ্গে বোর্ডের নম্বর যদি মেলে এবং তাতেই তোমার পয়সা থাকে তাহলে তুমি নম্বর অনুযায়ী কয়েকগুণ বেশী ফেরত পাবে। তার-পাশে কয়েন বক্সে পয়সা ফেলে হাতল ঘোরালে যদি একই নম্বর পাশাপাশি তিনটে ওঠে তাহলে দশ পেনিতে আড়াই পাউন্ড পেতে পার। এদিকে একটা রেসবোর্ড আছে। দশটা প্লাস্টিকের ঘোড়া নিজেদের ট্রাকে সুইচ টিপলে দৌড়ায়। তোমাকে একটায় দশ পেনি বাজি ধরতে হবে। যত নম্বর ঘোড়া প্রথম উইনিং পোস্ট ছোঁবে ততগুণ পয়সা পাবে ফেরত। বব হিসেব করে দেখেছেন একশ পাউন্ড খেললে পাঁচ পাউন্ড ফেরত পাওয়া যায়। তবু লোকে খেলে। একবার হারতে আরম্ভ করলে আরও নেশা চেপে যায়। এইসময় বার কাউন্টার থেকে মিসেস হোমস চেঁচিয়ে বললেন, 'হাই বব। হোয়াট এ সারপ্রাইজ। তুমি তো জুয়ো খেলার পাত্র নও। এখানে চলে এস।'

বব সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলেন মিসেস হোমসের চোখ মুখ এখনও ফোলা। বোঝা যাচ্ছে সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। বেশ মোটাসোটা হয়ে পড়েছেন এখন। লিজারই বয়সী কিন্তু অনেক চটপটে। এক সময়ে এই গ্রামের সেরা সুন্দরী ছিলেন। সেসব সোনার দিন ছিল। হোমসটা ছিল বদমেজাজী। এই ক্যাসিনো করে গোল্লায় গিয়েছিল। ও মরতে যখন মিসেস হোমস দায়িত্ব নিলো

তখনই চব্বিশ পেরিয়েছেন। তারপর থেকে ক্যাসিনোটা স্টেডি চলছে।
ফাঁকা ক্যাসিনো, বার আরও ফাঁকা। একা মিসেস হোমস পা ছড়িয়ে বসে টিভি দেখছেন। বব যেতেই একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। 'আকাশের অবস্থা দেখেছ? একেই কি সামার বলে?'
বব বসতেই দেখতে পেলেন মোটা শরীরে ফুলতোলা যে রঙিন গাউন পরেছেন মিসেস হোমস তার বুকের কাছটা আজকালকার মেয়েদের মতো কাটা। সেটা ববের চোখে পড়েছে দেখে মিসেস হোমস বললেন, 'আবার উপদেশ দিও না। ঘরোয়া হয়ে বস। এককালে তোমরা, তুমি আমার দিকে হাঁ করে তাকাতে, বিলের জন্যে ঘেঁষতে পারোনি। মনে আছে?'
'সে সব কথা মনে করে কি লাভ?'
'যাই বল বাপু, আমার মনে করতে ভালো লাগে। তোমাকে দেখেই আমার ভালো লাগল। আচ্ছা আমি না হয় বুড়ি হয়েছি তাই বলে একটু চুমু আশা করতে পারি না?'
বব উঠে ঝুঁকে মিসেস হোমসের গালে একটা চুমু খেয়ে ফের ফিরে বসলেন। মিসেস হোমস গলা তুলে বললেন, 'ম্যাগি, ববের জন্যে একটা জিন উইদ টনিক দাও।'
'না না, এই সকালে—।'
'আঃ রাখো তো! বব, তুমি চিরকালই ভিজে রয়ে গেলে। ইটস অন মি।'
কালো মেয়েটা অকারণে হেসে কাউন্টারে ঢুকে মদ ঢালতে লাগল। এই একটা ব্যাপার হয়েছে। এখন ইংলন্ডের আনাচে-কানাচে কালো ছেলেমেয়ে ছেয়ে গেছে। বব শুনেছেন ছেলেগুলোর বেশীর ভাগ পড়তে এসে থেকে যায়। আর ওদের ওপর নাকি ব্রিটিশ মেয়েদের প্রচন্ড টান। কালোগুলোর মতো ডিস্কো নাকি সাদা ছেলেরা নাচতে পারে না। রাবিশ।
জিন উইদ টনিক হাতে নিয়ে বব বললেন, 'তুমিও কালো মেয়ে রেখেছ?'
'আঃ বব। যুগ পাল্টেছে। এখন যেসব ছোঁড়া এখানে খেলতে আসে তারা ম্যাগিকে বেশী পছন্দ করে। ওরকম বেঢপ হিপ আর ব্রেস্ট নিয়ে যখন তখন তো আর কেউ হাসতে পারে না। দিন পাল্টাচ্ছে বব। উই মাস্ট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট।' মিসেস হোমস শরীরটাকে তুলে এগিয়ে গিয়ে ক্যাসিনোটা দেখতে লাগলেন, 'কাল খুব ভালো বিজনেস হয়েছে। চারটে পর্যন্ত লোক ভর্তি ছিল। এখন আমার টাকা-পয়সার অভাব নেই বব কিন্তু শরীরটার দিকে তাকালেই বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়। খাওয়া ছাড়া কোনো আরাম আমার জন্যে নেই, ভাবতে পার? সেক্স-এর কথা বলছি না, একটা পুরুষমানুষকে মনের মতো ভালবাসার কথা ভাবলেই ঘুম পেয়ে যায়। আমার অবস্থাটা বোঝ বব! কি জন্যে বেঁচে আছি? কি হবে টাকা জমিয়ে!'
গ্লাস শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন বব, 'মনটাকে ঝেড়ে ফেল। তোমাকে দেখতে এখনও যে আমাদের ভালো লাগে, আমরা যে আসি এটা কম কথা নয়। ষাট বছর পর্যন্ত মানুষ নিজের জন্যে বেঁচে থাকে, তারপর বাঁচতে হয় অন্যের

জন্যে। বাই মিসেস হোমস।'

'বাই বব।'

আবার রাস্তায় নামলেন বব। আজ আর রোদ উঠবে না। নির্জন রাস্তায় একা একা হাঁটছিলেন তিনি। আজ একবার গাড়ি নিয়ে বেরুতে হবে। হাইওয়ের ধারে বাগানটায় এই সপ্তাহে যাওয়া হয় নি। একটু আগে শোনা কথাগুলো মনের মধ্যে এখনও টলটল করছে। নিজের উত্তরটাও। তিনি কার জন্যে বেঁচে আছেন? অন্যজন কে? লিজা? তিনি না থাকলেও লিজার ঘুমের অসুবিধে হবে না, আর্থিক অভাব হবে না। এখন রাত্রে শোওয়ার আগে অথবা মেজাজ ভালো থাকলে কোথাও বেরুবার আগে লিজা ওঁকে চুমু দিয়ে যায়। কোনোদিন বলেননি তিনি। করমর্দনে যে উত্তাপ তা চুম্বনেও পান না এখন। ঠোঁটে ঠোঁট ঘষলে শরীরের কোথাও উত্তেজনা জন্মায় না। বুকের ভেতর কোনো বল ড্রপ খায় না। শরীরের মধ্যে যে শরীর পনের বছর বয়সে জেগে উঠেছিল সে কবরে শুয়েছে কবে, শুয়েমাটিহয়ে গিয়েছে। মিসেস হোমসের তবু খেতে ভালো লাগে তাঁর তো তাও লাগে না। এখন শুধু দেখার জন্যে বেঁচে থাকা। এই গ্রামের মানুষ, বাড়িঘর, প্রকৃতি যা আজন্ম দেখে এসেছেন তাই রোজ চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। যেন তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত, সবকিছু ঠিকঠাক থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে তিনি টু-লেট ঝোলানো বাড়িটার সামনে দাঁড়ালেন। অ্যানরা ওদের নিচের ঘরটা ভাড়া দিতে চায়। এখন অফিস ব্যাংকের দৌলতে ভাড়াটে পেতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না। বব কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে বেল টিপলেন। দরজা খুলে অ্যান ঠোঁট ফোলালো, 'নো, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। আমি ডাকলে সমস্ত গ্রাম ছুটে আসে আর তোমার সময় হয় না। এসো, খুব জরুরী পরামর্শ আছে।'

বব হাসলেন, 'আমার কাছে সুন্দরী নারী আর ফুলের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।'

'খুব কথা শিখেছ।' অ্যান ওঁর হাত ধরে এসে সোফায় বসাল। তারপর একবার ভেতরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'মা ঘুমাচ্ছে। আচ্ছা বুড়োরা এত ঘুমায় কেন বল তো?'

'ঘুমায় না, ঘুমের ভাণ করে। এটাই কি তোমার সমস্যা?'

'না না। শোন, সাইমনকে ডিভোর্স করার পর ঠিক করেছিলাম এখন তিন বছর আর কোনো পুরুষকে পাত্তা দেব না। গ্রামে ফিরে এসে মাকে সাহায্য করছি জমিজমার ব্যাপারে। কিন্তু তুমি তো জানো কেন্ট ছেলেটা কি ভালো। অত ভালো ছেলে চাইলে কি না প্রেম দিয়ে পারা যায়? চারমাস পরে আমরা বিয়ে করব। তুমি এমন করে তাকিয়ে আছ যেন কিছু জানো না?' চোখ ছোট করল অ্যান।

'জানি। কেন্ট চমৎকার ছেলে। চাষবাসে ভালো মন। তুমি ছাড়া কোনো মেয়েকে মন দেয় নি। ওর সঙ্গে তোমার ভালবাসাবাসির কথা শোনার পর ভারি ভালো লেগেছিল।'

'লাগবেই তো। আমি কি খারাপ মেয়ে? সাইমনকে বিয়ে করে ভুল করেছিলাম তাই বলে খারাপ কেউ বলতে পারবে না।' অ্যান মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, যে সমস্যাটার কথা বলছিলাম, তুমি তো চার্লসকে চেনো। আরে, চার্লস হলো ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। কি সুন্দর দেখতে বল! তা চার্লস আমাকে প্রেম নিবেদন করেই চলেছে। আমি যত বলি ওর প্রেম নেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয় কারণ আমি কেন্টের বাগদত্তা তো কানেই নেয় না। তোমাকে কি বলব, অতবড় লোকটা কান্নাকাটি পর্যন্ত করেছে। আমি বাবা কেন্টকে ভালবাসি, ওসব ঝামেলায় যেতে চাই না। একটু আগে লোকটা ফোন করেছিল। আমার সঙ্গে একবার, মানে আমাকে অন্তত একবারের জন্যে পেতে চায় নাহলে আত্মহত্যা করবে। আমি কেন্টকে বিয়ে করলে ওর তো কিছু করার নেই কিন্তু তার আগে একবার আমাকে পেতে চায়। আর এইটেই আমার সমস্যা। অনেকবার ভেবেছি কাটিয়ে দেব। তোমাকে ভালবাসি না, তোমার সঙ্গে শোব কেন? কিন্তু তারপরই মনে হচ্ছে যদি আত্মহত্যা করে? ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে, ক্যাশিয়ার নেই। তাছাড়া, অত যখন ভালোই বেসেছে তাহলে একবারের জন্যে আশা মিটিয়ে দিই। একবারই তো! আমি কেন্টের জন্যে যেমন মনটাকে রেখেছি তেমনই থাকবে অথচ চার্লসকেও দুঃখ দেওয়া হবে না। কিন্তু কথাটা আমি কেন্টকে বলব কিনা বুঝতে পারছি না। আমার শরীর মনের ওপর, যদিও স্বামী হয় নি এখনও তবুও ওর অধিকার আছে, একটা অনুমতি নেওয়া দরকার। তুমি কি বল?'

পায়ের ওপর পা রেখে দুটো হাত হাঁটুর ওপরে নিয়ে বব চুপচাপ শুনছিলেন। প্রশ্নটার পর চোখ বন্ধ করলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন অ্যান উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে। চোখ না খুলে তিনি বললেন, 'এরকম জটিল প্রশ্নের উত্তর তো চট করে দেওয়া যায় না। সময় লাগবে।'

'দিচ্ছি সময়। চুপচাপ বসে ভাব। দ্যাখো, তোমার মতো অভিজ্ঞ মানুষকেই যখন ভাবতে হচ্ছে তখন আমার কি দোষ। আর কাউকে তো বলা যায় না এসব কথা তোমাকে ছাড়া। ভাব, আমি ততক্ষণ টিভি দেখি।' অ্যান উঠে টিভি খুলে দিল। চোখ না খুলে বব শুনলেন বিবিাস ওয়ানের সংবাদ পাঠক বলছেন, 'এই ঘটনার পর হাইওয়ে পরিষ্কার করা হয় এবং হিপিরা তাদের যাওয়ার রুট বদলায়। কিন্তু হিপিরা যাতে পরের গ্রামে আশ্রয় না নেয় রাত কাটাতে সেই-জন্যে গ্রামের মানুষ পুলিসের কাছে আবেদন করলে পুলিস জানায় কোর্টের হুকুম ছাড়া তাদের পক্ষে হিপিদের নিষেধ করা সম্ভব নয়।'

বব চোখ খুললেন। তৎক্ষণাৎ ছবিটা সরে গিয়ে ওয়েদার চার্ট ফুটে উঠল। যেটুকু চোখে এল তাতে দেখলেন হিপিদের ক্যারাভান এগোচ্ছে। ওরা এখন কোন্ রাস্তায় যাচ্ছে? আহা, যে গ্রামে রাত কাটাবে তাদের কি দুর্দশা! এখন তো কোর্ট থেকে অর্ডার আনার সময় নেই। তাঁকে তাকাতে দেখে অ্যান জিজ্ঞাসা করল, 'ভাবা হলো?'

'হুঁ। তুমি বরং চার্লসকেই বিয়ে কর। বেচারা কেন্টের একটু কষ্ট হবে কিন্তু বাকি জীবনটা ভালোই কাটবে। আমি বলছি, চার্লস আর তুমি খুব সুখী হবে।'

বব উঠে দাঁড়ালেন।
হাঁ হয়ে গেল অ্যান, 'তুমি কি বলছ ? কেন্টকে আমি যে ভালবাসি।'
'ভালবাস। ভাল বাসলেই যে বিয়ে করতে হবে তার কোনো মানে নেই। চার্লস কি পাত্র হিসেবে মন্দ ?'
'না তা অবশ্য নয়। তবে ওর তো বদলির চাকরি।'
'ভালোই তো। অনেক জায়গা দেখতে পাবে ওকে বিয়ে করলে। চলি।' বব আর দাঁড়ালেন না। তাঁর মনে হলো কেন্ট ছোকরাকে একটা ফোন করে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। এই মেয়েটার বুদ্ধি একটুও বাড়েনি। বাড়বেও না।
অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের একটু আধটু ফস্টিনষ্টি সবকালেই থাকে। বিয়ে না করেও একসঙ্গে থাকার নিয়মটা এই গ্রামেও চালু। তার নিজের নাতনী তো মা হয়েছে বিয়ে না করেই। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেই একটা সাধারণ শোভন মানসিকতা কাজ করে। যে যাকে ভালবাসে তাকে না হারানো পর্যন্ত সৎ থাকে। অথবা কি করছি সেটা নিজের কাছে স্পষ্ট থাকলে অন্য কাউকে বিরক্তও করা হয় না। বব নিজে খুব একটা কনজারভেটিব নন। তার যৌবনে লিজা আসার আগে অন্তত দুটো ক্ষেত্রে তিনি নরম হয়েছিলেন। কিন্তু তার একটা শোভন চেহারা ছিল।
কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে বব চট করে সরে এলেন বাস স্ট্যান্ডের ছাউনির তলায়। আর তখনই তিনশো এগার নম্বর বাসটা এসে দাঁড়াল। এই দোতলা বাসটা তিনটে গ্রামের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। আজ কোনো যাত্রী নেই, কোনো নামার লোকও নেই। কিন্তু না, একটু ভুল হলো। মাথায় ফুলের ছবি আঁকা টুপি, পরনে জিনসের প্যান্টের ওপর, জ্যাকেট, হাতে বড় সাদা ব্যাগ নিয়ে একজন নামল। তাকে প্রথমে চিনতে পারেন নি বব। কিন্তু বাসটা চলে যাওয়া-মাত্র ববের মনে হলো খুব চেনা চেনা মানুষটি। যদিও জিনসের প্যান্টে নিতম্ব বড় ভারি দেখাচ্ছে আঁট হয়ে কাপড় সেঁটে থাকায় কিন্তু একটু আগের চিন্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডোরা যে এখানেই এসে নামবে কে জানতো। ষাট বছর তো অবশ্যই, লিজার সমবয়সীও হতে পারে অথচ লিজার থেকে কি স্মার্ট। শরীর মাঝে মাঝে স্থূল হয়েছে বটে কিন্তু এখনও চমৎকার চটপটে। আর সেই সময় বব ধরা পড়ে গেলেন। ডোরা ওঁকে দেখে ব্যাগ রাস্তায় নামিয়ে ছুটে এল, 'আঃ বব। তোমাকে এখানে দেখতে পাব ভাবিনি। মাই সুইট বব।'
কিছু করার আগেই দুহাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল ডোরা। একটু সামলে নিয়ে বব বললেন, 'যাক চিনতে পারলে তাহলে।'
'চিনব না ? পঞ্চাশ বছর হলো, না ? পঞ্চাশ বছর আগে তুমিই আমাকে প্রথম নারীত্বের আনন্দ দিয়েছিলে। এই পঞ্চাশ বছরের সব ভুলতে পারি কিন্তু ওই দুপুরটা ? অসম্ভব।' ডোরার হাত তখনও ওঁর কাঁধে। দাঁতগুলো কি বাঁধানো? পঞ্চাশের হিসেবটা যদি ঠিক থাকে তাহলে ডোরার বয়সটা তিনি ভুল হিসেব করেছিলেন।
বব বললেন, 'তোমাকে কিন্তু এখনও চমৎকার দেখাচ্ছে। এখনওএ্যাট্রাকটিভ।'

'রিয়েলি ? এই নতুন প্যাণ্টটা বানাতে সাজেস্ট করল আমার নাতনী। ওঃ, তুমি যদি ওকে দেখতে! ঠিক আমার পনের বছর! যাক, সাতদিন এখানে থাকব বলে এসেছি। লিজার খবর কি ?'

'ভালো আছে। তবে বয়স হলে যা হয়।'

'ওঃ বয়স। ভাবলেই বয়স নইলে কি! লিজা কিন্তু চিরকালই ঘরকুণো, তোমার ওকে বিয়ে করা উচিত হয় নি বব, একথা তোমাকে চিরকাল বলে এসেছি। আমার স্বামীটির সঙ্গে ওকে চমৎকার মানাতো। তা তিনি গেলেন এমন সময়ে যে পাত্র খুঁজে পাব না আমি।' খিলখিলিয়ে হাসল ডোরা।

'চেষ্টা করলে পারতে।' বব কেমন যেন নার্ভাস বোধ করছিলেন।

মুখ চোখে কিশোরী হয়ে গেল ডোরা, 'সেকথা কি আর বলব। অন্তত তিনজন সত্তর পার হওয়া বুড়ো আমাকে এ্যাপ্রোচ করেছে। কিন্তু ওদের দিকে তাকালেই নিজেকে কেমন বুড়ি মনে হয়। তোমার মতো স্মার্ট মানুষ একটাও দেখলাম না। আমার ভাইটির খবর কি ?'

'ভালো। ও তো গত বছর আর একটা ফলের বাগান কিনেছে। নেশাও কম করে!'

'তাহলেই ভালো। ঠিক আছে, আমি চলি। তোমার সঙ্গে কখন দেখা হবে ?'

'আমার বাড়িতে এসো।'

'না না। ওখানে যাব অন্য সময়ে। আমাদের খামারবাড়িতে যাব কাল সকালে। ওখানেই চলে এসো। বাই বব।' হাত নেড়ে চলে গেল ডোরা। কিছুক্ষণ নেশাগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন বব। যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ যেন সমানে ঝড় তুলল। এবং হঠাৎ বব আবিষ্কার করলেন শরীরের রক্ত যেন স্রোত পাল্টেছে। এখনও যে জোয়ার ভাঁটা খেলে, খেলতে পারে তা জেনে চমকিত হলেন তিনি। যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, এবার হিসাবটা ঠিক, তিন ছেলে আর নাতি নাতনী নিয়ে অন্য গ্রামে যার সংসার সে এসে ওই আঁটো প্যাণ্ট আর কথার দোলায় এখনও তাকে দুলিয়ে দিল। সে ছিল না পঞ্চাশ বছর আগের এক উজ্জ্বল দুপুরে খামারবাড়ির খড়ের গাদায় শুয়ে থাকা পনের বছরের তেজী মেয়েটা ? এই গ্রামে ডোরা যখন আসতো তখন কদাচিৎই দেখা হত। ওর স্বামী মারা যাওয়ার পর দু'তিনবার দেখা হয়েছে। তখন হয় লিজা সঙ্গে ছিল নয় ওর ছেলেরা। আজ একা একা কেমন যেন করে দিয়ে গেল মেয়েটা। বাড়ির দরজায় এসে বব হেসে ফেললেন। পঁয়ষট্টি বছরের কোনো বৃদ্ধাকে কি মেয়ে বলা যায় ?

তন্ময় হয়ে হিচককের ছবি দেখছিলেন লিজা। এটা সেই গল্প যার শেষে খুনী ওষুধ খাচ্ছে ভেবে ভুল করে কেমিস্টের দেওয়া বিষের পুরিয়া মুখে ঢালবে। অন্তত দুবার দেখেছে লিজা অথচ টিভির দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন এর চেয়ে বিস্ময় আর কিছু নেই। বব পাশের সোফায় বসে বললেন, 'একটু আগে ডোরার সঙ্গে দেখা হলো।'

'ও।' লিজার ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হলো কি না বোঝা গেল না।

'তুমি এই ছবিটা দুবার দেখেছ।'
'ওঃ। ডোণ্ট টক। হোয়েন ইউ টক ইউ টক রাবিশ। এটা হিচককের ছবি।' হাত নাড়লেন লিজা। অতএব ছবির শেষ দৃশ্য পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন বব। ল্যাংড়া হয়ে যাওয়া খুনী প্লেনের সিটে বসে হোস্টেসের কাছে জল চাইল। হোস্টেস জল দিতে সে ওষুধ ভেবে তৃপ্ত মনে সেটা মুখে দিয়ে পুরিয়া ঢালল গলায়। ছবিটা শেষ হতেই লিজা বললেন, 'কার কথা বলছিলে?'
'ডোরা! ভাই-এর বাড়িতে থাকবে বলে এসেছে। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল।'
'ডোরা? ও, তোমার ডোরা! ইউ স্লেপ্ট উইদ হার ফিফটি ইয়ার্স ব্যাক। ইজ্ন্ট ইট, হাউ ইজ শী?' নির্লিপ্ত মুখে প্রশ্ন করলেন লিজা। ঠোঁট কামড়ালেন বব। এটা প্রশ্ন করার ধরন হলো? বউ-এর কাছে কিছুই লুকোবেন না ভেবে কত বছর আগে বিয়ের পরে ঘটনাটা স্বীকার করেছিলেন। আজ যেন আলমারি খুলে গাউন বের করল। তিনি উত্তর দিলেন না। লিজা সেটা লক্ষ্য করে বললেন, 'যে বয়সের যা। তোমার ডোরাকে বলো একটু যেন আয়নার সামনে দাঁড়ায়। ওর ভঙ্গী দেখে বাইশ বছরের ছোকরারাও রাত্রে ঘুমায় না। কিন্তু ও হলো মরুভূমির আলেয়া। ভঙ্গীটুকুই সার।'
চমকে গেলেন বব। এই বাড়ি এবং এই গ্রামের বাইরে জীবনে যায় নি লিজা। অথচ ডোরার হালফিল খবর রাখছে কেমন করে? মেয়েরা কি সবসময় একটা গোপন সূত্র রেখে দেয় স্বামীর প্রাক্তন প্রেমিকাদের জন্যে?
টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছিল। চাঁদে চকোলেট ফেলে এসেছিল একদল নভোচারী। ফলে সেই চকোলেটের লোভে অ্যামিবা এল, তা থেকে পিঁপড়ে জন্মে গেল। পিঁপড়ে থেকে পতঙ্গ, পতঙ্গ থেকে পাখি, পাখি থেকে মুরগী, মুরগী থেকে খরগোস, খরগোস থেকে বাঁদর, বাঁদর থেকে শিম্পাঞ্জি এবং শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষ। পরের ট্রিপে নতুন নভোচারীরা যেতেই সেই মানুষটি হাত বাড়িয়ে চকোলেটের মোড়ক দেখিয়ে আর একটা চাইল।
তারপরই বিবিসি'র নিউজ বুলেটিন শুরু হলো। 'মার্গারেট থ্যাচার বলেছেন লিবিয়ার সঙ্গে এখন কোনোরকম কথা শুরু করার সময় হয় নি। সিংহলে তামিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘাতে দশজন রাষ্ট্রীয় সেনা মারা গেছে। ওয়ার্ল্ড কাপে ব্রাজিল এখন বুকিদের কাছে ফেবারিট। হিপিরা পুলিসের আদেশ মেনে রুট পাল্টেছে। কিন্তু যেসব গ্রামের ওপর দিয়ে তারা যাবে এবং রাত কাটাবে তারা শঙ্কিত। হিপিরা বলছে তাদের টাকা ফুরিয়ে আসছে, গাড়ির তেলও নেই।'
বব খবরটা শুনছেন মন দিয়ে। লিজা উঠে গেলেন কিচেনে। সব খবর শেষ হবার পর হিপিদের ছবি এল। বাচ্চাগুলোর পায়ে মোজা নেই। লোকগুলো যেন শয়তানের সন্তান। ববের মনে হলো এদের এখনই দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তারপরেই তিনি সোজা হয়ে বসলেন। টিভি-র পর্দায় হিপিদের যাওয়ার পরিবর্তিত রুট লিখে দেওয়া হবে। প্রথমে এল হিপিদের প্রতিবাদের ছবি একটা অল্পবয়সী হিপিনী করুণ গলায় বলল, 'কাল সারাদিনে আমি মাত্র

দু'পিস রুটি খেয়েছি । বিজি হাইওয়ে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে পুলিস আমাদের যে রাস্তায় যেতে বলছে সেখানে খাবার দেবে কে ? আমাদের বাচ্চাদের নিয়ে আকাশের তলায় থাকতে পারি না । আমি আমাদের বাচ্চাদের জন্যে আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করছি । আমরাও মানুষ ।'
মানুষ ! বব মাথা নাড়লেন, মানুষ কাকে বলে । ওই সঙের মতো সাজ, নোংরামির জন্যে যাদের কাছে যাওয়া যায় না তারা মানুষ । এই সময় টিভির পর্দায় ম্যাপটা আঁকা হলো । পরিবর্তিত পথ ধরে, হিপিরা কিভাবে যাবে ! এবং তখনই তাঁর গলায় চিৎকার ছিটকে উঠল । লিজা ছুটে এলেন, 'কি হলো বব ? শরীর খারাপ লাগছে ? বব !'
বব কোনরকমে আঙুল তুলে টিভিটাকে দেখালেন । লিজা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে ? কি দেখেছ ওখানে ? কেউ মারা গেছে ?'
ততক্ষণে বব লাফিয়ে উঠেছেন । একেবারে টিভি-র পর্দার কাছে চলে গেলেন তিনি । যাচ্চলে ! ওয়ার্ল্ড কাপের প্রস্তুতি দেখাচ্ছে । তারপর সেখান থেকে ঘুরে উত্তেজিত ভঙ্গিতে জানালেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেল লিজা । হিপিস আর কামিং ।'
'কোথায় ? কখন ? কবে ?'
'ওঃ । তুমি কি বুঝতে পারছ আমি বলছি হিপিরা আসছে ! এই গ্রামের পাশ দিয়ে ওরা যাবে । এখন কি হবে ? উঃ, আমি ভাবতে পারছি না ।' বব ছটফট করছিলেন ।
লিজা একটু অবাক, 'তাতে হয়েছে কি ? হাইওয়ে দিয়ে যে যার মতো যাবে তাতে তোমার উত্তেজিত হওয়ার কি আছে । ও বব, দিস ইজ টু-মাচ !'
বব দৌড়ে এলেন, 'যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলতে এস না । এরা কারা ? পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা জীব । ওরা প্রকাশ্যে সেক্স করে, চুরিচামারি, ছিনতাই ওদের হাতের ময়লা । সবরকমের ড্রাগস ওরা খেয়ে থাকে । স্নান করে না । তার চেয়ে বড় কথা কোনো সামাজিক নর্মস মানে না । এরা যে কি তা শুধু ওরাই জানে ! এই লোকগুলো যদি গ্রামে ঢুকে যায় ? সমস্ত গ্রামটা বিষাক্ত হয়ে যাবে তাহলে । উই মাস্ট ডু সামথিং ।'
বব উত্তেজিত হয়ে আবার ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন । ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের সামনে টেড দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিল । বব চিৎকার করলেন, 'হেই টেড ! শুনেছ ? খবরটা শুনেছ ?'
'কি খবর বব ?' নির্লিপ্ত চোখে তাকাল টেড ।
'দে আর কামিং । হিপিস । ওরা এই গ্রামের পাশ দিয়ে যাবে । ওরা যদি গ্রামে ঢুকে পড়ে ! ভাবতে পারছ ব্যাপারটা ? আড়াই হাজার হিপি ।' বব ওর কাছে চলে এলেন ।
এবার টেডের চোখ কপালে উঠল, 'মাই গড ! কিন্তু কে তোমাকে খবরটা দিলে ?'
'টিভি ! টিভিতে এইমাত্র বলল । আমাদের গ্রামের নামও লিখে দিয়েছিল ।'

'কিন্তু ওরা যদি আসে কি করতে পারে বল তো ?'

'তুমি জানো না ? তোমার দোকান থেকে জিনিস নিয়ে দাম না দিয়ে চলে যেতে পারে। তোমার ছোট ছেলেটাকে ট্যাবলেটের নেশা ধরিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া ওরা যে এইডসের জার্ম ক্যারি করছে না তা তুমি জানো না।'

'দেন উই মাস্ট স্টপ দেম। লেটস গো টু শেরিফ।' দোকান খোলা রেখে পারতপক্ষে বের হয় না টেড। পা বাড়াতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর দোকানটার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে মানুষকে বিশ্বাস করা উচিত, তাই না বব ?'

বব বললেন, 'মাঝে মাঝে।'

এখনও রাস্তা ফাঁকা! টেড জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার লাঞ্চ হয়ে গেছে বব ?'

বব মাথা নাড়লেন, 'না। আমি সাধারণত লেট লাঞ্চ করে থাকি।' ববের খুব খারাপ লাগল। এইরকম সমস্যা যখন ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে তখন টেড খাওয়ার কথা ভাবছে।

আধ ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত গ্রাম জেনে গেল হিপিরা আসছে। একা বব নয় অনেকেই টিভির পর্দায় খবরটা দেখেছে। তবে বেশীর ভাগ রাতজাগা মানুষ তখনও ঘুমিয়ে থাকায় খবরটা তাদের শুনতে হলো। বব এবং টেডের উত্তেজনার অনেকটাই তখন ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামের মানুষদের মধ্যে। শেরিফের অফিসের সামনে বেশ ভিড় জমেছে। রুটির কারখানার মালিক ফিলিপ চিৎকার করে বলছিল, 'হাইওয়ে দিয়ে ওদের ক্যারাভান যদি যায় যাক কিন্তু আমাদের গ্রামের মধ্যে যেন না ঢোকে।'

আলোচনারত শেরিফের কানে কথাটা পেঁছাতে তিনি মাথা নাড়লেন, 'ঠিক কথা। বব, কেউ যদি হাইওয়ে দিয়ে কোথাও যায় তাহলে আমরা তার যাওয়া বন্ধ করতে পারি না। হাইওয়ে সরকারের সম্পত্তি। কিন্তু ওরা যদি গ্রামে ঢুকতে চায় তাহলে আপত্তি জানাতে পারি। দরকার হলে আমরা কোর্টে যেতে পারি।'

ইলিংওয়ার্থকে এই গ্রামের সবচেয়ে বিষয়ী মানুষ বলা হয়। হাইওয়ের ধারে তাঁর বিশাল ফলের বাগান আছে। বৃদ্ধের কৃপণ হিসেবেও ভালো নাম। শেরিফের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'কোর্ট ?'

'হ্যাঁ। কোর্ট থেকে আমরা ইনজাংশন আনতে পারি। আমাদের এলাকায় কেউ যেন ঢুকতে না পারে। পুলিস তো ওদের সঙ্গেই আসছে। কোর্টের অর্ডার ওদের দেখালে পুলিস সেটা মানতে বাধ্য করবে। বাট, স্টিল এসব করার কোনো দরকার নেই বলে আমার বিশ্বাস। আপনারা অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছেন!' শেরিফ বললেন।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সর্বসম্মত একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, 'আমরা এই গ্রামের শান্তিপ্রিয় ব্রিটিশ নাগরিকরা আশঙ্কা করছি যে হিপিদের ক্যারাভানটি যদি এই গ্রামে প্রবেশ করে তাহলে আমাদের শান্তি বিপন্ন হবে। তাই মহামান্য আদালতের কাছে আবেদন করছি যাতে তিনি অগ্রিম আদেশ জারি করে ওদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন।'

ইলিংওয়ার্থ বললেন, 'কিন্তু কোর্টে গেলে তো খরচ আছে। গ্রামের স্বার্থে সবাই চাঁদা দিক। একটা ফান্ড তৈরি হোক। শেরিফ প্রেসিডেন্ট, আমি ক্যাশিয়ার।'
ফিলিপ প্রতিবাদ করল, 'কেন বাবা? হাইওয়ের কাছাকাছি আমার কোনো সম্পত্তি নেই, আমি চাঁদা দিতে যাব কেন? আর চাঁদা দিলে কে ক্যাশিয়ার হবে তা ভাবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।'
ডোরম্যান ম্যাথুজ বলল, 'হিপিদের এত ভয় পাওয়ার কি আছে। ওদের চেহারা তো দেখেছি। একটা ঘুঁষি মারলে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।'
শেরিফ বললেন, 'না না। কোনো মারামারি নয়।'
ওস্কার ছোকরা বলল, 'শেরিফ। এই গ্রামের লোকগুলো কি পাগল? কোথায় রইল হিপিরা আর এখানে বসে সবাই আকাশ-পাতাল ভাবছে। ওরা একটু নোংরা বটে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ওদের আমার খুব রোমান্টিক লাগে। ঘর ছাড়া বাঁধন হারা—।'
সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত প্রতিবাদ উঠল। বব বললেন, 'ওস্কার একথা বলতেই পারে। দূরে দাঁড়িয়ে অন্যের বাড়িতে আগুন লাগতে দেখে কেউ কেউ তো খুশি হয়। সে এই গ্রামের ছেলে নয়। তাই গ্রামের মানমর্যাদা সেন্টিমেন্ট সে বুঝবে কি করে!' বলতে বলতে ঘড়ি দেখলেন বব। তারপর বললেন, 'তিন মিনিট বাদেই টিভিতে খবর শুরু হবে। উই মাস্ট ওয়াচ দ্যাট।'
শেরিফের হুকুমে সেখানেই একটা সেট আনানো হলো। সবাই উন্মুখ হয়ে দেখল নিউজ বুলেটিন, 'আজ একটু আগে হিথরো এয়ারপোর্টে এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে বোমা রাখার খবর আসায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বথামের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। হিপিরা হাইওয়ের পাশে একটি গ্রামে আশ্রয় নেওয়ায় গ্রামবাসীরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন।'
বব চিৎকার করে উঠলেন, 'লুক, শুধু আমরাই নয় অন্য গ্রামের মানুষেরাও আদালতে যাচ্ছে। ওরা আগে থেকে ইনজাংশন না চেয়ে যে ভুল করেছিল আমরা তা করব কেন? কি হে ওস্কার, এখনও কি ওদের রোমান্টিক বলে মনে হচ্ছে তোমার?'
ওস্কার নীরবে মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। টেড বলল, 'আসলে যে এই গ্রামে জন্মায় নি, বড় হয় নি, সে কি করে বুঝবে গ্রামের সেন্টিমেন্ট।'
শেরিফ বললেন, 'ওকে! চাঁদা তোলার কোনো প্রয়োজন নেই। হাইওয়ের পাশে যার জমি অথবা ফলের বাগান আছে সে এখনই কোর্টে যাক। এ ব্যাপারে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব সাহায্য করব। ছুটির দিন হলেও স্পেশ্যাল অর্ডার বের করতে অসুবিধে হবে না। এটা করলেই হিপিরা আর গ্রামে ঢুকতে পারবে না।'
বিকেলের মধ্যে এগারটা আবেদন জমা পড়ল আদালতে। এবং ইনজাংশন পাওয়া গেল। হাইওয়ে বরাবর প্রতিটি বাগান এবং জমি এখন আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। কোনো ব্যক্তি বা দল মালিকের বিনানুমতিতে সেখানে পা দিতে পারবেন না

আগামী এক মাসের মধ্যে। মোটামুটি একটা নিশ্চিন্তভাব এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শেরিফ জানিয়ে দিয়েছেন হিপিরা যখন হাইওয়ে দিয়ে যাবে তখন গ্রামের কেউ যেন সেখানে না যায়। এর ফলে হিপিদের উপেক্ষা করা হবে। সারা বিকেল বব আর টেড যার সঙ্গে দেখা হলো তাকেই বললেন ওই সময় যেন অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের বাড়িতেই আটকে রাখা হয়। কিন্তু এটা অত্যন্ত আন্তরিক ইচ্ছে হলেও সবাই বলল, 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের তো তুমি জানো। তারা কোনো উপদেশই শুনতে চায় না। হিপিরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তাই শান্তি পাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই।

রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি। হিপিরা এখন এই গ্রাম থেকে মাত্র নব্বুই মাইল দূরে আছে। তার মানে ইচ্ছে করলে দুপুরের অনেক আগেই ওরা এই এলাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইচ্ছেটা কি করবে? যেভাবে ওরা পুলিসের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে?

ঘুম না হওয়ার আর একটা কারণ লিজা। হঠাৎ কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আজ ক্যাসিনোয় গিয়েছিলে?'

বব সরল মনে উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ।'

'তুমি তো জুয়া খেল না তাহলে ওখানে যাওয়ার কি দরকার?'

বব হেসে ফেলেন, 'মিসেস হোমসের সঙ্গে একটু গল্প করতে ইচ্ছে হলো।'

'আমার সঙ্গে তো কথা বলতে গেলে তোমার মুখে হাসি ফোটে না।'

'এই তো হাসছি।'

'শোন বব। ডোরার সঙ্গে দেখা করবে না আলাদা।'

'কি আশ্চর্য, কথা হচ্ছিল মিসেস হোমসকে নিয়ে, এর মধ্যে ডোরা আসছে কোত্থেকে?'

'আসছে। আমি সব আগাম টের পাই।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ। আমার কবরে যাওয়ার বয়স হয়ে গেছে।'

'পুরুষমানুষের স্বভাব যা তাতে কবরে শোওয়ার পর পাশের কফিনে কোনো মেয়ে থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া বোকামি।' ধীরে ধীরে শব্দগুলো উচ্চারিত হয়েছিল প্রতিবাদ করেন নি বব। কোনো লাভ হত না। মেয়েরা যখন বাঁকা কথার স্রোত বইয়ে দেয় তখন তাতে যুক্তির বাঁধ দেওয়া বোকামি। কিন্তু তারপর থেকেই মন খারাপ হয়ে গেল। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখলেন আকাশের অবস্থা একটুও পাল্টায় নি। কিন্তু ওয়েদার ফোরকাস্টে বলল দুপুরের পর রোদ উঠবে। হিপিদের খবরটা আগ্রহ নিয়ে দেখলেন বব। একই অভিযোগ, আমাদের তেল নেই, খাবার নেই টাকা নেই। কিন্তু কখন তারা বিদেয় হবেন তা বলল না ওরা। বব ইলিংওয়ার্থকে ফোন করলেন, 'তুমি কি একবার বাগানটা দেখে আসবে?'

ইলিংওয়ার্থ বলল, 'আমি কাল রাত্রে ওখানে ছিলাম বব। সব ব্যবস্থা করে এসেছি। আবার লাঞ্চের পর যাব। তবে তোমার জমি আর হাইওয়ের মাঝখানে বাউন্ডারির তার একটু নিচু হয়ে গেছে দেখে এলাম।'

খবরটা শোনার পর আর দেরি করলেন না বব। লিজা ঘুমাচ্ছে এখনও। তিনি দরজা টেনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হলেন। আজও সকালে রাস্তায় লোক নেই। অনেক ঘুরে ঘুরে জমিতে পেঁছতে হয়। বুড়ো জন ওকে দেখে এগিয়ে এলো, 'গুড মর্নিং, বব। হঠাৎ সাতসকালে, শরীর ঠিক আছে তো?'

বুড়ো জন হলো কেয়ারটেকার। অনেককালের লোক। এমন ভালমানুষ বড় একটা দেখা যায় না। বব জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব ঠিক আছে তো জন?'

'আমি যদ্দিন না মাটিতে যাব তদ্দিন সব ঠিক থাকবে বব। কাল মিস্টার ইলিংওয়ার্থ এসেছিলেন। তাঁর কাছেই হিপিদের খবর পেলাম। ষাট বছর আগে একবার পঙ্গপালের খবর হয়েছিল। তোমরা সেইরকম ভয় পাচ্ছ দেখছি।'

'ভয় নয় জন। তুমি টিভি দেখলে বুঝতে পারতে।' বব ভেতরে ঢুকলেন। ছোট বাংলো। ফলের বাগান। আর তারপর জমি। তিনি জনকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাইওয়ের সামনে পেঁছে গেলেন। মাঝখানে খানিকটা ঢালু জমি আর একটা তারের বেড়া ব্যবধান তৈরি করেছে। এখন ফসল শেষ। তবু এখানে এলেই বুক জুড়িয়ে যায় ববের। ছেলে কিংবা নাতনী এসবের মর্ম বুঝল না। তিনি চলে গেলে এদের কি করে সামলাবে লিজা! এত সবুজ এত নরম মাটি। বব চারপাশে তাকালেন। ইলিংওয়ার্থ বলেছে সে দেখেছে তার ঝুলে পড়েছে। কিন্তু কোথাও তেমন চোখে পড়ল না। অনেক খুঁটিয়ে দেখার পর একটা জায়গায় সামান্য নিচু মনে হওয়ায় তিনি জনকে বললেন ওখানকার তারটা যেন এখনই ঠিক করে দেওয়া হয়।

জন বলল, 'হোয়াট ফর? ওখান দিয়ে কোনো জন্তু ঢুকতে পারবে না।'

'হিপিরা ঢুকতে পারে জন।'

'মাই গড। কেউ যদি ঢুকতে চায় তো তারটা টপকেও ঢুকতে পারে। জন্তুরা সেটা পারবে না। মানুষ এলে অবশ্য মামলা করতে পার।'

বব স্বীকার করলেন কথাটা। তারপর বললেন, 'তুমি এখানে একটা বোর্ড টাঙিয়ে দাও জন। বিনানুমতিতে প্রবেশ করলে শাস্তি পেতে হবে। আদালতের আদেশে সুরক্ষিত এলাকা। আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না।'

জনকে ওখানে রেখে খামারবাড়িতে ফিরে এলেন বব। কাঠের দুটো ঘর আছে। একসময় লিজাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে দু'তিন দিন থেকে যেতেন। এখন আর আসা হয় না। জন সব ব্যবস্থা অবশ্য ঠিকঠাক রেখেছে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন বব। শৈশবের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। এবং তখনই তার মনে পড়ল ডোরার কথা। ডোরা বলেছিল আজ সকালে সে ওদের খামারবাড়িতে আসবে। পঞ্চাশ বছর আগে এক দুপুরে ওদের সেই খামারবাড়িতে তার যৌবনের স্মৃতি রয়েছে।

লিজার কথা মনে পড়ল। ওর আপত্তির কথাও। এবং সেই সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো। তিনি কোন অন্যায় করছেন না তবু লিজার অন্যায় আপত্তিতে যুক্তি থাকলে অস্বীকার করার প্রশ্নই উঠত না। তিনি আবার গাড়িতে উঠলেন। অন্তত একবার হ্যালো বলে যাওয়া ভদ্রতা। লিজা যাই মনে করুক।

নেশাভাং করে ডোরার ভাই সম্পত্তির অনেকটাই ইলিংওয়ার্থকে বিক্রি করে দিয়েছিল। কিন্তু এখনও যা আছে তা যথেষ্ট। ওদের খামারবাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বব ডোরার ভাই-এর গাড়িটাকে দেখতে পেলেন। অর্থাৎ ওরা এসেছে।

পা বাড়াতেই ডোরার ভাই-এর সঙ্গে দেখা। ষাট ছুঁয়েছে কিন্তু ডোরার চেয়েও বয়স্ক দেখাচ্ছে। তাঁকে দেখে বলল, 'গুড মর্নিং বব। তুমি এসে ভালোই হলো। আমাকে এখনই একটা কাজে যেতে হবে কিন্তু ডোরা চাইছে আর একটু থেকে যেতে। আশা করি তুমি ওকে একটা লিফ্ট দিতে আপত্তি করবে না।'

কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে সে চলে গেল। ওর গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে গেলে বব চারপাশে তাকালেন। এদের এখানে এত পাখি আসে কোত্থেকে! তাঁর খামারেও পাখি ডাকে কিন্তু এত একসঙ্গে নয়। বব এগিয়ে গাছপালার মধ্যে দাঁড়ালেন। এদের খামারবাড়িটায় তিনটে ঘর। ওপাশে খানিকটা কৃত্রিম জঙ্গল। ওখানেই পঞ্চাশ বছর আগে—! বব নিশ্বাস ফেললেন। মানুষের জীবনটা এত ছোট আর তার চেয়ে দ্রুত ফুরিয়ে যায়। পঞ্চাশ বছর আগে এই চামড়া দুই আঙুলে টানলেন বব। একটু টান টান হলো কিন্তু তাতে অজস্র সাদা ফাটা দাগ। ছেড়ে দিয়ে এবার আঙুল বোলালেন জায়গাটায়।

কিন্তু ডোরা কোথায়? বব চারপাশে তাকালেন। এখন রোদ নেই কিন্তু উত্তাপ বেড়েছে, বৃষ্টি খুব জলদি আসবে না। বব খামারবাড়িতে ঢুকলেন। নিচের দুটো ঘরে কেউ নেই। সেখানকার আসবাবও খুব সামান্য। জন তার বাড়ি অনেক ভালো সাজিয়েছে। ডোরা গেল কোথায়? বব কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতেই ডোরার গলা শুনতে পেলেন, 'কে আসছে?'

'আমি বব।'

'মাই গড! তুমি অনেকদিন বাঁচবে হে। এতক্ষণ তোমার কথা ভাবছিলাম আমি। সোজা ছাদে চলে এসো। সিঁড়িটা একটু দেখে এসো। বাঁ দিক ঘেঁষে!' ডোরার উৎসাহী গলা শুনে তিনি সিঁড়িটার দিকে তাকালেন। ডান দিকে কোন হাতল নেই অথবা ঘেঁষবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। খুব সাবধানে তিনি উঠে এলেন ছাদে। একঘরের ছাদ। তার মাঝখানে একটা আরামচেয়ারে মাথায় টুপি চাপিয়ে শুয়ে রয়েছে ডোরা। ছোট প্যান্টি আর ব্রেসিয়ার ছাড়া অঙ্গে কিছু নেই। ওকে দেখে ডোরা বলল, 'সূর্য কখন উঠবে বলতে পার? এটাকে কি সামার বলে? শরীরে একটু রোদ লাগাতে এখানে এলাম। ভাই চলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'যাক। তোমার গাড়িতে ফিরব আমি। বসো। দাঁড়িয়ে দেখছ কি? তুমিই বলতে পারবে, এই শরীরটাকে তো পঞ্চাশ বছর আগেও দেখেছ, এখন কি পরিবর্তন হয়েছে বল তো?' ডোরা আবার শুয়ে পড়ল মাথা হেলিয়ে।

বব তাকালেন। সত্তরের কাছাকাছি যার বয়স তার এমন শরীর থাকা সত্যি গুণের কথা। যদিও কোমরের চাব একটু ঝুলছে, বুকের ধার ভোঁতা হয়ে স্তূপে পরিণত হয়েছে কিন্তু ডোরার পায়ের গড়ন এখনও চমৎকার। এবং

কোনোমতে যে বাঁকগুলো বেঁচে আছে তাকে সময় নষ্ট করতে পারে নি। তিনি হেসে বললেন, 'ডোরা, তোমার মনে নেই।'

'ননসেন্স। সেটাও তোমার ওপেনিং ছিল, না?'

'হলেও। পঞ্চাশ বছর কম কথা নয়। নিজের মুখই মনে পড়ে না।' ববের কথা শেষ হওয়া মাত্র ডোরা উঠে একটা চাদর ছাদে বিছিয়ে দিল। তারপর ববের হাত ধরে বলল, 'আমি তোমার বুকে মাথা রেখে একটু শোব বব। একদম পবিত্র শোওয়া।'

বব বললেন, 'সেই অর্থে আমাদের তো অপবিত্র হবার কোনো ক্ষমতাও নেই।'

হঠাৎ সজোরে চড় মারল ডোরা। বব এমনটা আশা করেন নি। তিনি আচমকা আঘাতটা কোনোমতে সামলালেন। গাল জ্বলছে। ডোরা তখন চিৎকার করছে, 'ইউ কাওয়ার্ড'। পঞ্চাশ বছর ধরে তুমি আমায় জ্বালিয়েছ।'

'আমি, আমি জ্বালিয়েছি?'

'অফকোর্স'। যাকে ভালবাসি তাকে বিয়ে করব না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু যখনই ওই দিনটার কথা মনে পড়ত তখনই তুমি জ্বালাতে।'

ববের শরীরে ক্রোধ এলো। তিনি দুহাতে ডোরাকে ধরেও ঠিক করতে পারলেন না কিভাবে আঘাত করবেন। ডোরা কোনো আপত্তি করল না। হঠাৎ তার বুকে মুখ ঘষে বলল, 'তোমার লেগেছে বব?'

'হ্যাঁ।' নিজের গলা ফ্যাসফেসে শোনাল ববের।

'তুমি আমাকে মারো। আমাকে রক্তাক্ত কর। আমাকে শেষ করে দাও। এইভাবে মৃতের মতো বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। আমার মনে সমুদ্র কিন্তু শরীরটা কেন কালাহারি হয়ে গেল বব? আমাকে বাঁচাও তুমি।' পাগলের মতো আচরণ এখন ডোরার এবং সেই মুহূর্তে ববের মনে হলো উঠে দাঁড়ানোর পর ডোরার এই লাস্যময়ী পোশাকে চেহারাটা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তিনি ধীরে ধীরে ডোরার শরীরে হাত বোলাতে লাগলেন। সেই স্পর্শে বোধহয় স্নেহ একটু বেশীমাত্রায় ছিল নইলে ছিটকে সরে যেত না ডোরা, 'লুক বব, আমি ছয় বছরের মেয়ে নই। তুমি আমায় স্নেহ করছ? আমি ফসিল হয়ে গেছি তাই অনুকম্পা দেখাচ্ছে! আই ডোন্ট মিন ইট। আর কিছু না থাক তোমার ঠোঁট দুটো তো আছে, দাঁত আছে, আমাকে শুষে নিতে পারছ না? কামড়াতে পারছ না? এগিয়ে এসো, আমি তোমাকে বলছি বব। তোমার এলিজার পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এই শরীর আছে? কাম অন—।'

আর তখন বুকের বাঁ দিকটা চিনচিন করে উঠল। বব চট করে বুক চেপে ধরলেন, মুখে একটু ভাঁজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে কৌটো বের করে একটা ট্যাবলেট জিভে ফেলে দিলেন। ডোরা দেখছিল ব্যাপারটা। তার গলার স্বর বদল হলো, 'তুমি কি বুকে ফিল করছ?'

বব চারপাশে তাকালেন। তারপর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। অন্তত দশ মিনিট লাগবে ট্যাবলেটটার সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। অবশ্য জিভে পড়া মাত্র আর বাড়বে না ব্যথাটা। যেন সাপের ফণা নামবার

শেকড় নিয়ে চলাফেরা। কদিন আগেই বি বি সি একটা সাপুড়েদের ওপর তথ্যচিত্র দেখাচ্ছিল। সাপটা ফণা তুলছে কিন্তু যেই শেকড় দেখছে অমনি নুয়ে পড়ছে। আরামচেয়ারে শুয়ে চোখ বন্ধ করতে ধীরে ধীরে শরীর স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। এবং তখনই তিনি ডোরার গলা পেলেন, 'বব, আই অ্যাম সরি।' তিনি চোখ খুলে দেখলেন ছাদে বসে আছে ডোরা। তার নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে তোমার ?'

'আই ডোণ্ট নো। আজকাল একটু টেনশন বাড়লেই বুকের মধ্যে লোহার বল ড্রপ খায়, দম বন্ধ হয়ে আসে।' ডোরা কোনোমতে বললেন।

'ই সি জি করিয়েছ কখনও ?'

'না।'

'করিয়ে ফেল। ঠিক আছে, তুমি এই ট্যাবলেটটা জিভে রাখ। ইট উইল হেল্প ইউ। কাম অন বেবি। যে বয়সের যা। ইউ মাস্ট নট ফরগেট দ্যাট।' পরম স্নেহে বব ডোরাকে একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিলেন, 'গিলে ফেল না, লজেন্সের মতো ব্যবহার কর।'

তারপর অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললেন না। খোলা আকাশের নিচে দুজনে পাশাপাশি। একজন আরাম চেয়ারে চোখ বন্ধ করে অন্যজন ছাদের ওপর বিছানো চাদরে টানটান। দুজনের শরীরে ওষুধের কাজ শুরু হয়েছে এবং শিগগির অশান্ত হৃদয় আরও জখম হওয়ার বদলে শান্ত হয়ে এলো। এই সময় অত্যন্ত ক্লান্তি লাগে। ঘুমাতে পারলে আরও ভালো হত। উঠতে একটুও ইচ্ছে করছিল না ববের। তিনি আবার চোখ বন্ধ করলেন। হাওয়া দিচ্ছে। ঈশ্বর। নিজেই জানেন এখন শুধু অন্যের জন্যে বেঁচে থাকা। কার জন্যে ? কিসের জন্যে।

ঘুম ভাঙতে কিছুক্ষণ ঘোরে রইলেন বব। এ কোন্ জায়গা, সময়টা কি বুঝতে বুঝতে সময় গেল। তারপর ধড়মড় করে উঠে পাশে তাকালেন। ডোরা নেই, চাদরটাও। চট করে কবজি ঘোরালেন, লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। লিজা নিশ্চয়ই খুব খেপে গেছে এতক্ষণ। চিন্তিত না হবার কোনো কারণ নেই। তিনি ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই ডোরাকে দেখতে পেলেন, 'শরীর ঠিক আছে ?'

'হ্যাঁ।' বব হাসলেন, 'তোমার ?'

'সাফোকেশন এখনও যায় নি। এসো লাঞ্চ রেডি।' ডোরা ডাকল।

'লাঞ্চ ? আমি তো এখানে লাঞ্চ করব না।'

'কেন ? ও, লিজা বসে আছে বুঝি ? আমি এতক্ষণ কষ্ট করে— !'

'ওকে। ঠিক আছে। চল।'

'না, তোমাকে এখানে খেতে হবে না।' লাঞ্চের প্যাকেটগুলো আবার বন্দী করে ডোরা বলল, 'আশা করি তুমি আমাকে একটা লিফ্‌ট দেবে ?'

'উইদ প্লেজার।'

খামার এলাকা ছেড়ে অনেকটা ঘুরে আসতে হয়। পথে কেউ কোনো কথা বললেন না। বাড়ির কাছাকাছি এসে ডোরা বলল, 'আমাকে এখানে নামিয়ে দিলেই চলবে।'
'আর ইউ সিওর ?' বব গাড়ি থামালেন। ডোরা ওঁর দিকে তাকাল। হঠাৎ বব ওর হাত ধরলেন, 'আমাকে একটু চুমু খেতে দেবে ?'
ডোরা সংগে সংগে হাত ছাড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল, 'নো !'
'কেন ?'
'আজ চুমু খেলে এটাই আমাদের জীবনের শেষ চুমু হয়ে যাবে। বাই বব।'

বাড়িতে ফিরে বব লিজার চিরকুটি পেলেন। তিনি মিসেস আর্নল্ডের বাড়িতে গিয়েছেন। যদি বব লাঞ্চ খায় তাহলে সেটাকে তৈরিই পাবে। বুড়ি আর্নল্ডের বাড়িতে এই গ্রামের গুজব তৈরি হয়। ওখানে আজ যাওয়ার কি দরকার ছিল ! বব খেয়ে নিলেন। তারপর টিভির সামনে পা ছড়িয়ে বসলেন। হিচককের ছবি দেখাচ্ছে। ছবিটা তিনি এর আগেও দেখেছেন। একটু ঝিমুনি এলো দেখতে দেখতে। বব চোখ বন্ধ করলেন। এরপর কতটা সময় গিয়েছে তিনি জানেন না। হঠাৎ হিপি শব্দটা কানে যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠলেন। খবর হচ্ছে। হিপিদের কনভয়টা এগিয়ে আসছে টিভির পর্দায়। ওটা কোন্ জায়গা। রাস্তার নাম পড়তে তিনি চমকে উঠলেন। তাদের গ্রাম থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে আছে ওরা। যেখানেই ওরা থামতে চেয়েছিল সেখানকার গ্রামবাসীরা কোর্ট থেকে নেওয়া আগাম হুকুম ওদের দেখাচ্ছিল। পুলিস সেটা পরীক্ষা করে হিপিদের গ্রামের মাটিতে পা রাখতে দিচ্ছিল না !
এখন হিপিরা আসছে।
বব এবার ওভারকোট, কোর্টের কাগজপত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। শেরিফের অফিসের সামনে বেশ ভিড়। হিপিরা এসে পড়ল বলে। শেরিফ নির্দেশ দিলেন যে যার জায়গায় যেন চলে যায় কোর্টের অর্ডার নিয়ে। শেরিফ থাকবেন হাইওয়েতে। তিনি পুলিসকে সাহায্য করবেন। সংগে সংগে যে যার গাড়ি নিয়ে রওনা হলো জমি-বাগান-হাইওয়ের দিকে। ববের মনে হলো এটা একটা যুদ্ধের মতো ব্যাপার। এইরকম উত্তেজনাতে তাঁর বুকে কোনো যন্ত্রণা হয় না। আশ্চর্য !
দূর থেকে ওদের দেখা যাচ্ছিল। বিশাল কনভয়টা এগিয়ে আসছে। সামনে পুলিসের একটা গাড়ি। বব ঠোঁট কামড়ালেন, এটা একটু খাতিরের মতো হয়ে যাচ্ছে না ? ইলিংওয়ার্থের জমির সামনে কনভয়টা দাঁড়িয়ে গেলে সে চিৎকার করতে লাগল কোর্টের অর্ডার হাতে নিয়ে, 'ট্রেসপাসার্স উইল বি প্রসিকিউটেড বাই দ্য অর্ডার অফ ল।' শেরিফ এবং একজন পুলিস অফিসার অর্ডারটা পরীক্ষা করে হিপিদের লাউডস্পিকারের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেই একটি মেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আমরা কি পাগলা কুকুর ? আমি আর পারছি না '
বব উত্তেজিত, এবার তাকে অর্ডার দেখাতে হবে। জন তার পাশে দাঁড়িয়ে।

দেখতে দেখতে জন বলল, 'দে নিড শেল্টার, দে মে গো টু পল'স প্লেস।' এখন তাঁর চোখের সামনে দিয়ে কনভয়টা যাচ্ছে। কি নোংরা পোশাক। রুগ্ন দলাপাকানো নেশাগ্রস্ত মানুষেরা গাড়িগুলোর ওপর বসে আছে। ওরা কি বাচ্চাদের নেশা করায়? হঠাৎ কনভয়টা থেমে গেল। পুলিস আর হিপিরা কথা বলছে। টিভির ক্যামেরা চলছে পাশ থেকে। আলোচনার বিষয়টা বুঝতে পারছিলেন না বব। এই সময় জন তার টপকে এগিয়ে গেল। শেরিফ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিছু বলবে জন?'

'ওরা কি চাইছে?'

'ওরা বলছে ওদের কাছে যা গ্যাস আছে তাতে আর মাইল পাঁচেক যেতে পারবে। পুলিসের কাছে ওরা একটা জায়গা চাইছে রাত কাটাবার। কারণ সরকারি সাহায্য কাল সকালের আগে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমার গ্রামে কোনো জায়গা কোর্টের অর্ডারের বাইরে নেই, তাই না জন?'

'একটু ভুল হয়ে গেছে শেরিফ!' বিনীত গলায় বলল। 'পলের জমিটার অর্ডার আনা হয় নি। পল মারা যাওয়ার পর থেকেই তো একটা ঝগড়া চলেছে ছেলেদের মধ্যে। কেউ মালিক হতে চায় না। ওটার কথা আপনারা খেয়াল করেন নি।' জন যেন অনুযোগ করল।

লাল দাড়ির একটি হিপি জনের কথাগুলো শুনে সঙ্গে সঙ্গে সিটি মারল। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। এই হাইওয়ের পাশে একটি জায়গা পাওয়া যাচ্ছে যেখানে আদালতের হুকুম নেই। কিন্তু কোন্ জায়গাটা?

বব চিৎকার করলেন, 'হেই জন। কাম ব্যাক!'

জন ফিরে তাকাল। তারপর সুড়সুড় করে নেমে এলো হাইওয়ে থেকে। সে ভেতরে ঢোকার পর বব প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'তোমার কি দরকার ছিল ওদের খবরটা দেওয়ার। বদমাস।'

জন মাথা নাড়ল, 'ওদের তো বলিনি। শেরিফ জিজ্ঞাসা করায়—তাছাড়া, ওই মেয়েটাকে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। পাঁচ বছরের বাচ্চা অথচ পায়ে মোজা নেই। ওর কি দোষ? ও যে কষ্ট পাচ্ছে ঈশ্বর কি দুঃখিত হচ্ছেন না?'

ততক্ষণে হিপিরা এসে জড়ো হয়েছে সামনের হাইওয়েতে, 'এই যে ওল্ডম্যান, সেই খালি জায়গাটা কোথায় দেখিয়ে দাও। উই উইল বি গ্রেটফুল টু ইউ। এই যে, এইদিকে তাকান, আমাদের দেখে কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না? খবরটা আর্ধেক দিলেন কেন? জমিটা কোথায়?'

ক্রমাগত এইরকম অনুরোধ হতে দেখে বব বললেন, 'জন, ভেতরে যাও, জলদি।' সেই সময় একটি হিপিনী ছুটে এলো তাদের কাছে, 'এই যে, তুমি যদি আমাদের জমিটার খবর দাও তাহলে আমি তোমার সঙ্গে শুতে রাজী আছি।'

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র জন দৌড়তে শুরু করল খামারবাড়ির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অশ্রাব্য শব্দগুলো ছুঁড়তে লাগল ওরা। এমন কি মেয়েটিও। বব কানে হাত দিলেন। ক্যারাভান আবার চলা শুরু করল।

কিন্তু ওরা জমিটা খুঁজে পেয়ে গেল। গ্রামের শেষপ্রান্তে পলের জমিতে কেউ

কোর্টের আদেশ নিয়ে দাঁড়িয়ে না থাকায় ওরা ধরতে পেরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিল পিল করে নেমে এলো ওরা হাইওয়ে থেকে। গাড়িগুলো এমন করে সাজাল যাতে দেওয়াল হয়ে যায়। তারপর ত্রিপল তুলে ঘর বানালো। মুহূর্তেই পলে-দের সুন্দর মাঠ আর বাগান নরক হয়ে গেল। মাঠে নামবার সময় অবশ্য পুলিস এবং শেরিফের সঙ্গে হিপিদের শেষবার ঝগড়া হয়ে গেল। যেখানে সেখানে ক্যারাভান রাখার নিয়ম নেই। তার জন্যে নির্দিষ্ট পার্কিং লট আছে। কিন্তু পুলিস আইনত একটা সময় ঠিক দিতে পারে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। হিপিরা স্পষ্ট বলে দিল যতক্ষণ না সরকারি সাহায্যে ওরা তেল কিনতে না পারছে ততক্ষণ ওরা এখানে থাকছে। টিভির লোকেরা এখন ছবি তুলছে। ওপর তলায় খবর পাঠিয়ে পুলিস খানিকটা দূরে অপেক্ষা করছে। হিপিরা রাত কাটাবার আয়োজনে ব্যস্ত।

যে ভয় করা হচ্ছিল তাই হলো। শেরিফ বললেন, 'এখন আর জনকে কিছু বলে লাভ নেই। বুড়ো মানুষ, মুখ ফসকে বলে ফেলেছে।'

পলেদের এক ছেলে বলল, 'কিন্তু ওরা আমাদের জমি নোংরা করে ফেলেছে এর মধ্যে। শুকনো ডালপালা ভেঙে আগুন জ্বালছে।'

বব রেগে গেলেন, 'এখন এসব বলে কি হবে? ভাই-এ ভাই-এ ঝগড়া করার সময় খেয়াল ছিল না? কাল সকালে দেখবে ওখানে কিছুই পড়ে নেই।'

ইলিংওয়ার্থ বলল, 'দেখতে হবে ওরা যেন গ্রামের মধ্যে না আসে। তবে জিনিস-পত্র কিনতে চাইলে প্রব্লেম হবে।'

'কিসের প্রব্লেম?' বব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেউ কিছু বিক্রি করবে না। আজ গ্রামের সব দোকান বন্ধ করে দাও।'

ওস্কার ছোকরা বলল, 'দেখছেন ওদের পয়সা নেই আর খামোকা আপনারা ভয় পাচ্ছেন। তবে দেখতে হবে ওদের কাছে এল এস ডি আছে কিনা! আমি কোনোদিন জিনিসটা দেখিনি।'

শেরিফ বললেন, 'নো ওস্কার। কখনও ওসব করো না। তাহলে আমি কঠোর হতে বাধ্য হব। ওদের আজকের রাতটা কাটাতে দাও। পুলিস কাল সকাল ছটার মধ্যেই ওদের তেল দেবে। ততক্ষণ আমরা ওয়াচ রাখতে পারি।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা পাহারাদার বাহিনী তৈরি হয়ে গেল। ঠিক হলো হিপিদের দৃষ্টির বাইরে জঙ্গলের আড়ালে থেকে নজর রাখা হবে।

ছোট ছোট তাঁবুও পড়েছে। খোলামাঠটায় আড়াই হাজার মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। মাঝে মাঝে উনুন জ্বলছে। কুৎসিত চেহারার লোকগুলো কাঁদছে। গাছের আড়ালে টেডের পাশে দাঁড়িয়ে বব দেখলেন সন্ধে হয়ে আসছে। আলো জ্বলল। অনেকটা বেদুইনদের মতো দেখাচ্ছে দূর থেকে। তিনটে হিপি মাটিতে বসে গাড়িতে হেলান দিয়ে ওটা কি খাচ্ছে? টেড বলল, 'গাঁজা।' মেয়েগুলোর স্বাস্থ্য এককালে ভালো ছিল। এখন সবাই টলছে। সন্ধের হাওয়া বইবার পর থেকেই ঠান্ডা নেমেছে। কিন্তু ওই মেয়েটাকে দ্যাখো, পাতলা একটা লুজ খাটো

প্যাণ্ট আর নাভি অবধি নামা শার্ট পরে চোখের তলায় রঙ বোলাচ্ছে। মেয়েটার থাই ও পায়ে বেশ ময়লা। মোজা দূরের কথা একটা হাওয়াই চটি ছাড়া পায়ে কিছু নেই। অথচ কানে বাহারি গয়না ঝুলছে। বিকট সাজ শেষ হলে মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে গান ধরল। গানের কথা শুনে চমকে উঠলেন বব। মেয়েটির গান ধরা মাত্র ওপাশ থেকে লিকলিকে রোগা একটা দাড়িওয়ালা হিপি চলে এল গিটার হাতে। মেয়েটা গাইছে, 'পুরুষজাতটার ওপরেই আমার ঘেন্না। পৃথিবীর সব পুরুষের শরীরের ওপর পা ফেলে আমি জীবনটা কাটিয়ে দিই। আমরা পয়দা করি আর ওরা কৃতিত্ব নেয়। আমাকে একটা পুরুষ দাও যার মুখে প্রথমবার থুতু ফেলার সুখ পাব।'

বব ফিসফিস করে বললেন, 'হরিবল্!'

টেড বলল, 'লুক বব, ওরা গাছগুলোর পেছনে প্রাকৃতিক কাজ শেষ করছে। আড়াই হাজার লোকের আবর্জনায় কাল গ্রামে থাকা যাবে না!' তারপর হেসে বলল, 'পলেরা ভালো সার পাবে অবশ্য।'

বব দেখলেন ক্যারাভানগুলোর ওপর বিচিত্র লেখা, 'আই অ্যাম কেয়ার অফ মি।' 'আই অ্যাম ট্রাভেলিং ফ্রম হেয়ার টু এটারনিটি।' 'হোম ইজ মেড ফর হোমোস।' 'জয়েন টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড'।'

রাত বাড়লে এক সময় সব শান্ত হয়ে গেল। সমস্ত মাঠ, চরাচরের সঙ্গে সঙ্গে হিপিরাও ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে আগুনের কুণ্ডের পাশ থেকে অবশ্য বাচ্চাদের কান্না উঠছে। জড়ানো গলায় তাদের থামানোর চেষ্টা চলছে। কখনও কখনও কোনো পুরুষ কণ্ঠ চিৎকার করে কিছু বলল। ব্যস আর কিছু নয়। পুলিসের গাড়ি দূরে দাঁড়িয়ে। বব আর পারছিলেন না। তিনি বললেন 'মনে হয় এবার আমরা যেতে পারি। ওরা সকালের আগে উঠবে না।

কিন্তু তখনই একটা ঘটনা ঘটল। ম্যাথুস দুটো ছেলেকে ধরেছে। তাদের বয়স বড়জোর সতের আঠারো। একজন কালো। চোরের মতো কখন হিপিদের আড্ডায় ঢুকে পড়েছিল। বেরুবার সময় ধরা পড়ে গেছে। ওদের কাছে পাউডার পাওয়া গেল। স্বীকার করল তিরিশ পাউণ্ডে ওরা একটা হিপির কাছ থেকে তিনটে পুরিয়া কিনেছে। এর আগে কখনও নেশা করেনি, শুনেই এসেছে। কৌতূহলী হয়ে আজ এসেছিল। কালো ছেলেটা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয়জন এখানকার স্কুল মাস্টার মিস্টার গাওয়ারের ছেলে। শেরিফ বললেন, 'এ নিয়ে জল ঘোলা করে লাভ নেই।' ওদের ছেড়ে দেওয়া হলো। পুরিয়া দুটো নষ্ট করে ফেলে স্থির করা হলো ব্যাচ বাই ব্যাচ পাহারা দেওয়া হবে। টেড বলল, 'বব, তোমার খামারবাড়িতে রাত্রে থাকা যাবে?' বব আপত্তি করলেন না। তাঁর একবার মনে হলো লিজাকে জানানো উচিত। তারপরেই স্থির করলেন কোনো প্রয়োজন নেই। গ্রামের সবাই জানে আজ তাঁরা কি করছেন।

বারোটা পর্যন্ত বব পাহারায় ছিলেন। এর মধ্যে তিনি অনেকবার অসুস্থ বোধ করলেন। তাঁর মনে হলো সেক্সকে এরা হাত ধোওয়ার চেয়ে সহজ করে ফেলেছে। হিপিনীদের তুলনায় হিপিরা সেক্স সম্পর্কে অত্যন্ত নিস্পৃহ। নিজেদের কষ্ট

দিতে এদের বেশ আরাম লাগে। ডিনারে যা ওরা খেয়েছে তা কোনো মানুষ খেতে পারে বলে ধারণায় ছিল না। কিন্তু এসব ব্যাপারে ওরা বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। সেই সাজুন্তি হিপিনী তিনজন পুরুষের সঙ্গে শোওয়ার চেষ্টা করে থুতু ছড়িয়ে এখন আগুনের পাশে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বারোটার সময় খামার-বাড়িতে ফিরে এলেন তিনি টেডকে নিয়ে। জন খাবার করে রেখেছিল। তাই খেয়ে ওয়াইন নিয়ে বসে বব টেলিফোন করলেন বাড়িতে। এর মধ্যেই লিজা ঘুমিয়ে পড়েছে?

মিনিট দুয়েক পরে লিজার গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো বব।'

বব বললেন, 'আজ আমি খামারবাড়িতে থেকে গেলাম ডার্লিং।'

লিজা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি খেয়েছ?'

'হ্যাঁ। জন বোকামি করে হিপিদের জায়গা বাতলে দিয়েছে।'

একটু চুপ করে থেকে লিজা বললেন, 'কখনও কখনও মানুষের মনে দয়ামায়া উঠে আসে, কি করবে বল।'

কথাটা খুব খারাপ লাগল ববের। তিনি বললেন, 'দে আর রিয়েল বিস্ট। তার চেয়েও অধম। একটা হিপিনী তিনটে লোকের সঙ্গে শোয়।'

লিজা বললেন, 'ওটা রুচির ব্যাপার। বার্ধক্যেও অনেকে যুবতী হতে চায়, তাই না?'

বব আবার হোঁচট খেলেন। লিজা কি ডোরার কথা বলছে? তিনি বললেন, 'যা হোক তুমি চিন্তা করো না। ও হ্যাঁ, আজ ডোরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'জানি। তোমার বুকের ব্যথাটা কেমন আছে ডার্লিং?'

এবার সত্যি ধক্ করে লাগল ববের বুকে। তিনি কোনোমতে বলতে পারলেন, 'এখন নেই, ডার্লিং, গুড নাইট।'

'গুড নাইট বব।' লিজার গলার স্বর কি শীতল!

সকাল আটটায় হিপিরা চলে গেল। সরকারি সাহায্যে তেল কিনে, কিছুটা খাবার পেয়ে ওরা আবার হাইওয়েতে উঠে গেল। শেরিফ, বব, ইলিংওয়ার্থ, টেড, ম্যাথুজ, ওস্কাররা ওদের চলে যাওয়ার পর বিষণ্ণ হয়ে পলেদের মাঠের দিকে তাকালেন। নরক হয়ে গেছে ওটা। মাঝে মাঝে পোড়া ছাই, নোংরা এমন কি মলমূত্র ছড়ানো। বব বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ওরা গ্রামে ঢোকে নি। এই গ্রামের পবিত্রতা ওরা এক রাত্রে নষ্ট করে দিয়ে যেত তাহলে।'

শেরিফ বললেন, 'তবু প্রত্যেককে চেক করো, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সবাই ঠিকঠাক আছে কিনা!'

না, গ্রামের কারো গায়ে আঁচড় পড়ে নি একমাত্র গাওয়ারের ছেলেটার ঘটনা ছাড়া। ওরা দুজনেই শেরিফের কাছে গ্রামের সবার সামনে ক্ষমা চাওয়াতে ব্যাপারটা মিটেও গেল।

অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছিল ববের। দশটা নাগাদ বাড়িতে ফিরলেন তিনি। লিজা এখনও ঘুমাচ্ছে। টিভি খুললেন। বি বি সি হিপিদের দেখাচ্ছে। দেখাক।

এখন ওদের দায় পরের গ্রামের। ব্রেকফাস্ট তৈরি করে খেয়ে নিলেন বব। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে লিজার ঘরে উঁকি মারলেন। লিজা নেই। সাতসকালে কোথায় গেল? হয়তো আর্নল্ডের বাড়িতে।

নিচে নেমে বব আবার টিভি খুলে পা ছড়িয়ে বসলেন। ঘুম পাচ্ছে। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি। বিজ্ঞাপনের পালা শেষ হলে সেই সুন্দরী সংবাদপাঠিকা আবার পর্দায় এলেন, 'এখন আপনারা একটি স্পেশ্যাল ইণ্টারভ্যু দেখতে পাবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে টিভির পর্দায় হাইওয়ের ছবি ভেসে এল। হিপিদের কনভয় চলছে। পাশের গ্রামের লোকরা তাদের জমির সামনে আদালতের আদেশ হাতে দাঁড়িয়ে। হিপিদের নেতা সেই লাল দাড়ির সঙ্গে টিভির প্রতিনিধি কথা শুরু করল। নেতা বলল, 'মনে হচ্ছে আপাতত আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। আমরা দু হাজার পাঁচশো একজন ঠিকঠাক যেতে পারব।'

'সংখ্যাটা ঠিক আছে? একজন বাড়ল না?'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। আমাদের দলে একজন এসেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্যারাভানের দরজায় টিভির ক্যামেরা। আর চমকে সোজা হয়ে বসলেন বব। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল। এবার বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন তিনি। কাঁপা হাতে কৌটোটা খুলে ট্যাবলেট জিভে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন বব। পর্দায় তখন ক্যারাভানের ভেতরের ছবি ফুটেছে। একটি কিশোরী হিপিনী লিজাকে সাজিয়ে দিচ্ছে। একটু একটু করে হিপিনীর চেহারা পাচ্ছেন লিজা। টি. ভির প্রতিনিধির প্রশ্ন ভেসে এলো 'আপনার নাম যদি অনুগ্রহ করে বলেন।'

লিজার কুঁচকে যাওয়া মুখে হাসি ফুটল, 'আমি লিজা ছিলাম। এখন কি নাম হবে জানি না।'

'আপনি কি এখন জয়েন করলেন?'

'হ্যাঁ। রাত চারটের সময়।'

'আপনি এতকাল কি করতেন?'

'হাউসওয়াইফ ছিলাম। স্বামীর সংসার দেখেছি, তার বাচ্চাদের মানুষ করেছি, তিনি যত কষ্ট দিয়েছেন সয়েছি, যা আনন্দ দিয়েছেন তা ভোগ করেছি।'

'আপনি কখনো গ্রামের বাইরে যান নি?'

'না কখনো না। যাওয়া বা গিয়েছি স্বামী নিয়ে গেলে তার সঙ্গে। আটচল্লিশ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। মেয়েদের যা হয়, ক্রীতদাসীর মতো তাঁর ইচ্ছে নিজের ইচ্ছে বলে জেনেছি।'

'তিনি কি অত্যাচার করতেন আপনার ওপর?'

'না। তিনি মানুষ হিসেবে ভালোই ছিলেন। সরাসরি কষ্ট দিতেন না।'

'গ্রামের সবাই তো হিপিদের ঘেন্না করে। তাই না?'

'করে। কিন্তু ওরা ভয় পায় বলেই করে।'

'আপনি কেন হিপিনী হলেন ?'

'বললাম তো, বিয়ের পর সংসার আর স্বামী ছাড়া আর কিছুই আমাকে দেখতে দেওয়া হয় নি। এরা লিখেছে এদের গন্তব্য ফ্রম হেয়ার টু এটার্নিটি। কত ঘুরে বেড়ায় এরা। পৃথিবীটাকে দেখব বলে এদের সঙ্গে চলে এলাম।'

'আপনার স্বামী কিছু বলবেন না ?'

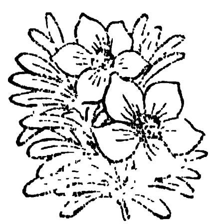
লিজার মুখ শক্ত হলো, 'আটচল্লিশ বছরে অনেক সুখ দিয়েছি তাকে। আমার আর কোনো দায় নেই তাঁর কাছে।'

'শেষ প্রশ্ন, আপনার বয়স কত ?'

ফিক করে হেসে ফেললো লিজা, 'মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে নেই জানেন না ? আমি আমার স্বামীর চেয়ে চার বছরের ছোট ছিলাম।'

সেই সময় কিশোরীটি লিজার চোখের তলায় কালো রঙ বুলিয়ে দিল। কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় রঙ বসাতে বেচারার কষ্ট হচ্ছিল।

বব এক হাতে বুক ধরে অন্য হাতে আবার কৌটোটাকে খুঁজছিলেন। ক্রমশ এই ঘর, ঘরের দেওয়াল তার কাছে অস্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছিল। শুধু তীব্র একটি চৌকো আলো সামনে জ্বলছে কিন্তু সেটা টি. ভি. কিনা এমন বোধ তার ছিল না। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে তিনি বলতে চাইছিলেন, 'লিজা, আমাকে ট্যাবলেটটা খুঁজে দাও।'



মানুষের মতো

এই বাড়ি ওর। মাঝে মাঝে নিজের কাছেই কেমন অস্বস্তিকর মনে হয়। চার কামরার দোতলা এই বাড়িটা সে কিনেছে বারো হাজার পাউন্ডে। দোতলাটা কাঠের কিন্তু সর্বত্র কার্পেট পাতা ; ওটা আগে থেকেই ছিল। এমন কি বাথ-রুমের আধুনিক ব্যবস্থাটাও। নিচের ঘরের রঙিন টি ভি, স্টিরিও, ভি সি আর, কিচেনের যাবতীয় আধুনিকীকরণ যার যে কোনো একটার দিকে তাকালে দেশে থাকতে চমকে উঠত। পনের বছর বিলেতে থেকে এসবের মালিকানা পেয়ে গেছে সে। বাড়ির পেছনে একটা সরু প্যাসেজে গাড়িটা। গাড়িতে এসি না থাকলে এদেশে বাস করা যায় না কিন্তু গাড়ি চালাতে চালাতে সে বাংলা গানের ক্যাসেট শোনে। এটুকুই তার নিজস্বতা। লেক ডিস্ট্রিক্টের চওড়া হাইওয়েতে গাড়ির গতি বাড়িয়ে হেমন্ত মুখার্জীর গলা চারপাশে ছড়িয়ে দিলে মনে চমৎকার আরাম হয়। বাড়িটার মতো গাড়িটা অবশ্য এমন কিছু অভিনব নয়। এমন কি তার রেস্টুরেন্টের হেড ওয়েটার আমেদেরও একটা গাড়ি আছে। আমেদকে সে মাইনে দেয় সপ্তাহে দুশো পাউন্ড। এখানে এক পাউন্ড মানে উনিশ টাকা নয়, আমেদ বলে একটা টাকাই। যাই হোক এখন সে বেশ সুখে আছে। প্রতি মাসে হাইলাকান্দিতে টাকা পাঠায়। সিলেট থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে সে একদা মা বাবার সঙ্গে ওখানেই আশ্রয় নিয়েছিল। তাঁরা রয়ে গেছেন আসামেই।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কেউ বলতে পারে না কার কিরকম কাটবে। ওসব হাত দেখা কিংবা ঠিকুজি বিচারে যদি ঠিক হত তাহলে এতদিনে তো তার মরে যাওয়ার কথা। তিরিশের একটা অতিরিক্ত দিন তার বেঁচে থাকার কথা নয়। কিন্তু সে দিব্যি বেঁচে আছে ব্রিটিশ পাশপোর্টের মালিক হয়ে।

হাইলাকান্দি থেকে কি করে সে ইংলন্ডে এসে পড়েছিল, এত জায়গা থাকতে কেমন করে এই লেক ডিস্ট্রিক্টের গ্রামের রেস্টুরেন্টে কাজ পেয়েছিল, ক্রমশ মালিক অসুস্থ হয়ে পড়লে সে পার্টনার হয়ে গেল এবং সবশেষে মালিক হয়ে দোকানটাকে ভারতীয় খাবারের দোকানে রূপান্তরিত করে ফেলল সেটা প্রায় রূপকথার মতো। কিন্তু এখন এটা সত্যি সে যে রেস্টুরেন্টের মালিক তার নাম 'প্রেম'। সব রকম ইন্ডিয়ান ডিস পাওয়া যায়। তার খদ্দেরদের নব্বুই ভাগ ব্রিটিশ। দিনের বেলা বন্ধ থাকে। শুক্র শনি সারারাত আর অন্য দিন রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা। সাতজন কর্মচারী তার। তিনজন নিচের কিচেনে, তিনজন সার্ভ করে আর একজন ডোরম্যান। সে নিজে থাকে কাউন্টারে, ড্রিংকস মেপে দেয়, ক্যাশ গুনে নেয়।

রাত্রে যখন রেস্টুরেন্ট থেকে ক্যাশ নিয়ে বাড়ি ফেরে তখন তার ভয় লাগে। যদিও এই গ্রামে আজ পর্যন্ত কোনো ডাকাতি হয় নি তবু ওটা তার ভারতীয়

অভ্যাসেই থেকে গেছে। এমনি দিনের গড় বিক্রি সাত আটশোর বেশি হয় না। শুক্র শনি ওটা প্রায় সতের আঠারশোতে পেঁছয়। পরের দিন ব্যাঙ্ক না খোলা পর্যন্ত দারুণ অস্বস্তি। একটা পাউন্ড তখন তার কাছে উনিশটা টাকাই হয়ে যায়।

আজ শুক্রবার। দুপুর অবধি ঘুমিয়ে তৈরি হয়ে নিল সে। কে কবে ভেবেছিল দুটোয় ঘুম থেকে উঠে ইলেকট্রিক কেটলিতে জল চাপিয়ে দিয়ে টি ভি দেখতে দেখতে খবরের কাগজের পাজল পাতাটা পেন্সিলে ভরবে সে! তারপর চা আর হট ক্রিম পাই খেয়ে বাজারে বেরুবে? ইদানীং নিজের রেস্টুরেন্টে সে খায় না। পেটে সইছে না। সিলেটি রান্না সিলেটের ছেলের পেটে সয় না পনের বছরের অভ্যাসে, ভাবা যায়! আজ রেস্টুরেন্ট খুলবে আটটায়। ছটা নাগাদ ডিনার কাম লাঞ্চ তৈরি করবে সে ঢ্যাঁড়স ভাজা, মুগের ডাল, রুইমাছের কালিয়া দিয়ে। ছিমছাম খাবার। এদেশে মানুষের দাম বড্ড বেশি। হারানের বউ বা বাসুর মা জাতীয় কাউকে পাওয়া গেলে এসব ঝঞ্ঝাট কে পোয়াতো! দরজা খুলে বাইরে বের হলো সে। এখন একটা পুলওভারই যথেষ্ট। সামার শেষ হতে চলেছে। এবার তেমন রোদ ওঠে নি। কিন্তু হাওয়ার দাঁত ধারালো হয়েছে এরই মধ্যে। তাছাড়া গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলে আর ঠান্ডা কি! গাড়ির দিকে এগোতে সে থমকে দাঁড়াল। অনেকদিন পরে ববকে দেখতে পেল। দুটো বাড়ির পরে বব থাকে। এই গ্রামের একজন কর্তাব্যক্তি। কিন্তু কিছুদিন আগে হিপিরা যখন এই গ্রামে এসেছিল তখনই বব ছন্নছাড়া হয়ে গেল। ওর বউ লিজা হিপিদের সঙ্গে চলে গেল কাউকে না জানিয়ে। পঞ্চাশ বছর স্বামীর সঙ্গে বাস করে কোনো বৃদ্ধা যে এমন করবে তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল গ্রামবাসীদের। বব কদিন যাকে পেত তাকেই জিজ্ঞাসা করত, ‘আমার দোষটা কি বলতে পার? আমি তো ওর ওপর কোনো অত্যাচার করতাম না। হয়তো আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়ার কথা আমি ভাবিনি কিন্তু আমাদের সময়ের মানুষেরা সবসময় বউ বউ করতে তো অভ্যস্ত ছিলাম না। আমি যেহেতু ওকে নিয়ে খুব একটা ঘোরাঘুরি করিনি তাই পৃথিবী দেখতে বেরিয়ে গেল। আচ্ছা বল তো, কার বউ সংসার সামলায় না, বাচ্চাদের জন্ম দেয় না? কিন্তু সেই কারণে কেউ কি নিজেকে নিঃস্ব ভাবে! লিজাটা একটা পাগল ছিল, বুঝলে! কিন্তু আমার দোষটা কি?’

‘হাই বব!’ সুদেব যতটা পারল সহজ গলায় ডাকল।

‘হ্যালো দেব।’ মাথাটা ঝাঁকাল বব। সত্তর ছোঁয়া বৃদ্ধ এখন যেন আরও জরাগ্রস্ত। এই কয়েক মাসেই ওঁর শরীর যেন দ্রুত ভাঙছে। বব সেই ইংরেজ যিনি এখনও হাই বলেন না। অন্যায়কে অন্যায় বলতে যাঁর জিব অসাড় হয় না। ব্রিটিশ টিম হেরে গেলে তিনদিন খুব মন খারাপ হয়ে যায় ওঁর।

‘বব, তোমার শরীর কি ভালো নেই?’

‘নো ইয়ংম্যান, আমি ঠিকই আছি। সন্ধ্যেবেলায় আকাশে কি করে সূর্য থাকবে বল!’ বব হাসলেন।

‘টেডের দোকানে আজকাল আড্ডা হয় না?’

'না, কোথাও যাই না। আসলে ভালো লাগা বোধটাই আমার হারিয়ে গিয়েছে। বেঁচে থাকাটা বড় ক্লান্তিকর দেব।' সুদেব একটু ইতস্তত করল। তারপর খুব ঘনিষ্ঠ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'লিজার কোনো খবর পেলে ?'

'ও হ্যাঁ। মাসখানেক আগে লিখেছিল একটা চিঠি। কেমন আছে লেখেনি তবে আমার কি কি করা উচিত তাই জানিয়েছে। কোথায় আছে তাও লেখেনি। আই নো শী উইল কাম ব্যাক। পঞ্চাশ বছরের অভ্যেস যে কোনো ড্রাগের চেয়ে শক্তিশালী। নইলে চিঠি দিয়ে আমাকে সচেতন করাতো না। গুডবাই দেব।'

'বাই বব।' শব্দ দুটো বলে সুদেব লক্ষ্য করল বব কোনোদিকে না তাকিয়ে নিজের বাড়ির দিকে এগোচ্ছেন, ওঁর হাঁটার ভঙ্গিটা মোটেই ভালো লাগল না তার। অস্কার ছোকরা দাঁড়িয়েছিল ফুটপাতে। নিজের দোকানের চেয়ে ফুটপাতে দাঁড়াতেই যেন বেশি ভালবাসে ও। বব চলে যেতে সোজা সামনে এসে দাঁড়াল, 'তুমি লক্ষ্য করেছ লোকটা যেন কবরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই জন্যেই বলে মেয়েরা হলো সব সর্বনাশের মূলে। তুমি বিয়ে না করে বেঁচে গেছ !'

'তুমিও তো বিয়ে করোনি।'

'এবার করতে হবে। জেন উঠে পড়ে লেগেছে। আমি জানি বিয়ে করাটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু জেনকে তুমি তো জানো, ও একবার যা ভাবে তা থেকে সরানো মুশকিল।' অস্কার মাথা নাড়ল।

'বিয়ে করাটা ঠিক হচ্ছে না কেন ?' সুদেবের মজা লাগছিল।

'বিয়ে মানেই তো অ্যাডজাস্টমেন্ট। তোমার ভালো না লাগলেও শান্তি ঠিক রাখার জন্যে বউ-এর কথা শুনতে হবে। পঞ্চাশ বছর ঘর করার পরও তো লিজা চলে গেল। আচ্ছা, লোকে বলে পঞ্চাশ, বছরটা কি ঠিক পঞ্চাশ ?'

'আমি ওদের বিয়ে দিইনি অস্কার যে তোমাকে বলতে পারব। আজ রাতে 'প্রেমে' আসছ ?' ওকে কাটাবার জন্যেই সুদেব হাঁটার চেষ্টা করল। মাথা নাড়ল অস্কার. 'না। আমার মায়ের শরীর খারাপ। ওঁর ইচ্ছে একসঙ্গে ডিনার করি। লিজার ঘটনাটার পর মাকে নিয়ে প্রব্লেমে পড়ে গেছি।'

অবাক হয়ে দাঁড়াল সুদেব, 'কেন ? কি হয়েছে ওঁর ?'

অস্কার কাঁধ নাচাল, 'মা বলছে লিজা ঠিকই করেছে। সারাজীবন সংসারের পেছনে ব্যয় করে মাও না কি কিছু পাননি। শুধু বাবা বেঁচে নেই বলে মা লিজার মতো যেতে পারছেন না।'

সুদেব আর দাঁড়াল না। এই গ্রামে এখন বৃদ্ধাদের খাতির বেড়ে যাবে। লিজা বাড়িয়ে দিয়েছে। কবে কোন্ বৃদ্ধা উধাও হয়ে যায় সংসার বৈরাগ্যে তাই নিয়ে সবাই চিন্তিত। সঙ্গে সঙ্গে তার একটা মজার কথা মনে হলো। ছেলেবেলা থেকেই দেশে শুনতো অমুকের ছেলে বা বাবা সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন বাদে খোঁজ পাওয়া গেছে উত্তর কাশীতে কিংবা হরিদ্বারে তাঁকে দেখা গেছে। কিন্তু কখনই শোনেনি কারো বোন বা মা সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছেন। কেন ? মেয়েদের মনে সংসারাসক্তি অত্যন্ত বেশী। ভারতবর্ষে তো মেয়েরা সব-

চেয়ে বেশী শোষিত ছিল এককালে। বৈরাগ্য তো তাদেরই প্রথমে আসা স্বাভাবিক।

গাড়ির আরামে বসে লাইটারের সুইচটা অন করে সিগারেট ধরিয়ে নিল সুদেব। এই গাড়ি এখানে জগাইমাধাইও চাপে কিন্তু ভারতবর্ষে কটা মানুষের আছে? এখানে সবাই তাকিয়ে থাকে রোলসের দিকে। সম্রাটের সম্মান ওর। যে মালিক তার টাকা আছে বলেই মালিকানা। লিটারে চার যাবে বা পার্টস পাল্টাতে সর্ষের ফুল দেখতে হবে বলে যাদের ভাবনা তাদের জন্যে রোলস নয়। মাঝে মাঝে হাইওয়েতে সে দেখেছে অন্য গাড়িগুলো রোলসের জন্যে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। এমন দিন কি হবে মা তারা যেদিন সেও রোলস কিনতে পারবে? এক লাখ পাউন্ডের বাক্স?

গাড়ি চালাতে বড় আরাম, একটুও টেনশনে ভুগতে হয় না। রাস্তায় অবাঞ্ছিত পদাতিক নেই, শুধু নিয়মটুকু মাথায় রেখে চালিয়ে যাও। একটা কুটো পড়ে নেই কোথাও। এখন পাব্ কিংবা ক্লাব বন্ধ। স্ন্যাক্সের দোকান খোলা। ফুটে লোকজন বেশ। গ্রামের বিপরীত প্রান্তে পেঁাছে প্যাটেলের পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড় করালো সুদেব। মিষ্টি রোদ উঠেছে এখন। কিন্তু ঠাণ্ডাটাও জানান দিচ্ছে। প্যাটেলের দোকানে ঢুকে সে চারপাশে তাকিয়ে নিল। সামনের হলঘরে যাবতীয় ভারতীয় মশলা এবং তরিতরকারি সাজানো। এলাচ কিংবা দারুচিনির দাম হাইলাকান্দির তুলনায় অর্ধেকের কম। ওগুলো আসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে। বাঁ দিকের ঘরে শাড়ি এবং জামাকাপড়ের একজিবিশন। প্যাটেলের সমস্ত আত্মীয় সেজেগুজে সেগুলো বিক্রি করে আর সারাদিন টেপে হিন্দি গান বাজায়। এখানে ঢুকলে কে বলবে বিলেতে আছি। মুদির দোকানে কোনো হেলপার নেই। যে যার পছন্দ নিয়ে আসছে ট্রলিতে করে। কাউণ্টারে বসে তাই দেখে মেশিনে দাম যোগ করে টাকা নিচ্ছে প্যাটেল। একটু ফাঁকা হতে সুদেব তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই প্যাটেল বলল, 'হাই দেব।'

'গতবারে চালটা খারাপ ছিল। ওই মাল এবার দিও না।'

প্যাটেল কাঁধ নাচাল, 'অত ভালো চাল অথচ তোমার অপছন্দ। আসলে বাংলাদেশের মানুষদের কাছে চাল বিক্রি করতে যা ঝকমারি।'

সুদেব বলল, 'আমি যখন দেশ ছেড়েছি তখন জায়গাটার নাম ছিল পাকিস্তান। এই নাও গত সপ্তাহের চেক। তুমি গলা কাটছ জেনেও এখানে আসছি কারণ আমি আমার ব্রিটিশ খদ্দেরদের সেরা জিনিস সার্ভ করতে পছন্দ করি।'

প্যাটেল কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর ইশারায় কাছে ডাকল, 'তুমি কি খবরটা শুনেছ?'

'কোন্ খবর?'

'ইণ্ডিয়া কমনওয়েলথ থেকে ব্রিটেনকে বাদ দিয়ে দিতে চাইছে।'

'আই অ্যাম নট ইণ্টারেস্টেড ইন পলিটিক্স!'

'ওহ্ গড! এর রেজাল্ট তো আমাদের ভুগতে হবে।'

'কেন?'

'ব্রিটিশরা খুব খচে গেছে। মিসেস থ্যাচার বলেছেন এখন থেকে ইণ্ডিয়ান বাংলাদেশীদের ব্রিটেনে ঢুকতে ভিসা লাগবে। অর্থাৎ আমার ভাইপোকে চাইলেই আমি এখানে হুট করে আনতে পারব না।'

সুদেব এই মুহূর্তে তার কেউ আসবে কি না মনে করতে পারল না। তবে মাকে এখানে একবার নিয়ে আসার ইচ্ছে তার অনেকদিনের। সে বলল, 'ট্যুরিস্ট ভিসা তো পাওয়া যাবে।'

'সেটা ওদের ইচ্ছে হলে। এদেশে আমাদের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে না কি সরকার খুব উদ্বিগ্ন। লণ্ডনের একটা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে তিনজন ইণ্ডিয়ান ইলেকটেড হয়েছে। এখন সারা দেশে আমরা ছড়িয়ে। ওরা ভয় পাচ্ছে একদিন আমরা কমন্সে মেজরিটি পেয়ে যাব। তুমি ভাবতে পারো ব্রিটেনের প্রাইমমিনিস্টারের নাম যদি দেশাই হয় তাহলে ব্রিটিশদের কি অবস্থা হবে? তাই ওরা চাইছে আমরা এদেশ থেকে চলে যাই।'

'আমাদের তো ব্রিটিশ পাশপোর্ট আছে। চাইলেই হলো!'

'জানি না। এরা দু'শ বছর আমাদের শাসন করেছে। আমরা যুদ্ধ না করে এদের দেশ দখল করে নেব তা এরা বরদাস্ত করবে না। নিশ্চয়ই কোনো কায়দা বের করবে।'

'চলে যেতে বললে তখন দেখা যাবে।'

'বাঃ চমৎকার। এই যে ছোট সুইচটা, দেশে এর দাম বড়জোর পাঁচটাকা। এখানে বিক্রি করছি এক পাউণ্ডে। চোদ্দ টাকা প্রফিট। দেশে তা পাব? গভর্নমেণ্ট কিছু করলে কেস করতে পারে, কিন্তু শুনছি ওরা আমাদের তাড়াতে ইয়াং ছোকরাদের লেলিয়ে দেবে। কি যে করি!'

প্যাটেলের দোকান থেকে জিনিসপত্র গাড়িতে চাপিয়ে সুদেব চারপাশে তাকাল। এখন এই গ্রাম তার নিজের হয়ে গিয়েছে। ওরা তাদের তাড়াবে? হ্যাঁ, এখন ভারতীয়রা সংখ্যায় হু হু করে বাড়ছে! লণ্ডনের টেলিফোন ডিরেক্টরির কয়েকটা পাতা জুড়ে শুধু ইণ্ডিয়ান নাম। একটা পাড়ায় ঢুকলে মনে হয় গুজরাটিদের এলাকায় এসে গেছি। হিথরো এয়ারপোর্টের পোর্টার থেকে সুইপার ইণ্ডিয়ান। ইংলণ্ডের অনেক টাকা প্রতি মাসে ইণ্ডিয়ায় চলে যাচ্ছে। একসময় বিহার থেকে আসা শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের এই রকম অনুভূতি হত। হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা অসহায় বোধ ছড়িয়ে পড়ল। এই দেশে সব আরামের শুধু দেশটাকে নিজের বলে ভাবতে না পারার অভ্যেসটাই পায়ের তলায় কাঁপুনি ছড়ায়। ফেরার পথে ফুটপাতে মানিকে দেখে সে গাড়িটা থামাল। মানি হাসছে একটা ঢ্যাঙা ব্রিটিশের হাত ধরে। দেড় ফুট বেশি লম্বা ছেলেটার পাশে কালো মানিকে অদ্ভুত লাগছিল। সুদেব চিৎকার করল, 'হাই মানি?'

মুখ ফিরিয়েই মানির মুখ উদ্ভাসিত। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'প্রথমে প্রেমে তারপর বাড়ি।'

'আমাকে তুমি লিফট দেবে ?'

'আপত্তি নেই।'

কথাটা শোনামাত্র মানি তার ঢ্যাঙা বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল, 'আঃ, আমি টায়ার্ড।'

'কোন্ চুলোয় গিয়েছিলে ?'

'ওঃ দেব। আই ডিড ইট। খুব ভয় হচ্ছিল যদি না পারি! কিন্তু পেরে গেলাম।'

'তুমি মরবে। খামোকা কেউ প্যারাসুটার হয় ?'

'মরব তো একবারই। কিন্তু কি থ্রিল তা তুমি বুঝবে না। ব্যাপারটা কি রকম হয় জানো ? আমরা আটজন বসে আছি প্লেনের ফ্লোরে। কোনও চেয়ার-টেয়ার নেই। ট্রেনার এক একজনকে ডেকে দরজায় নিয়ে যাচ্ছে। তারপর সামান্য পুশ আর তোমার শরীর শূন্যে ভাসছে। প্যারাসুটটা নিজে থেকেই খুলে যাওয়ার পর নিচে তাকাও, ওঃ কি দারুণ লাগে পৃথিবীটা।' গাড়ির সিটে মানির শরীরটা নেচে উঠল।

'এসব করে কি হবে মানি, চাকরি-বাকরির চেষ্টা কর।'

'কি হবে চাকরি করে ? আমাকে যা বেকার ভাতা দিচ্ছে তাতে চমৎকার চলে যাচ্ছে। চাকরি করলে ওই ফ্ল্যাট আমাকে ছাড়তে হবে। তিন ডবল ভাড়াতেও আর আমি ওরকম ফ্ল্যাট পাব না।'

সুদেব চুপ করে গেল। মানি এককালে ওর রেস্টুরেন্টে কাজ করত। সপ্তাহে দেড়শ পাউন্ড পেত। ওর ব্যবহারে তার খদ্দের বেড়ে গিয়েছিল বেশ। এখন চাকরি না করেও ও সমান টাকা পাচ্ছে বেকারভাতা হিসাবে সরকারের কাছ থেকে। দক্ষিণ ভারতের এই মেয়েটি তিন বছর বয়সে এসেছিল মা বাবার সঙ্গে। এ দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বড় হয়ে তাদের মতোই আঠারো পেরিয়ে আলাদা হয়ে একা আছে মা-বাবাকে ছেড়ে। দুবার দুটো প্রেম করেছিল ভারতীয় ছেলের সঙ্গে। প্রসঙ্গ উঠলেই কাঁধ নাচায়, 'ম্যাড! আর নয়। প্রেমট্রেম আমার দ্বারা আর হবে না। আর ইন্ডিয়ান ছেলে ? রক্ষা কর। ওরা সব সময় ডাবল ক্রশ করে। গাছেরও খাব আবার তলারও কুড়োবো। এর সঙ্গে মিশবে না, ওর সঙ্গে থা বলবে না, আর আমি সাদা মেয়ে দেখে যখন ছোঁক ছোঁক করব তখন চোখ ন্ধ করে বসে থাকবে। ননসেন্স।'

ংরেজ ছেলেরা তো আজকাল কালো মেয়ে পছন্দ করে। নিগ্রোদের তাই এখন ব ডিম্যান্ড। ওদের সঙ্গে—।'

রে। ওরা শুধু চমৎকার ঘুমাতে জানে কিন্তু কথা বলতে গেলেই বোবা হয়ে ায়।'

ঠাৎ মানি ওর দিকে ঘুরে বসল, 'হেই দেব, তুমি কাউকে বিয়ে করছো না কন ?'

দেব হাসল, 'সেম প্রব্লেম। এই দ্যাখো না, তুমি সেবার সারারাত আমার এক-লার সোফায় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে অথচ আমি দোতলা থেকে নেমেই এলাম

না। আমার দ্বারা কিছুই হবে না।'

'তুমি খুব ভদ্রলোক, তোমাকে বিশ্বাস করা যায়। আমি তোমার সঙ্গে একটা মেয়ের আলাপ করিয়ে দিতে পারি। শী ইজ সামথিং। শী লাইকস ইণ্ডিয়ান বয়েজ।'

'আই অ্যাম নট ইণ্ডিয়ান, আই অ্যাম হোল্ডিং ব্রিটিশ পাশপোর্ট।'

'রাবিশ।' বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে গেল মানি।

হেসে ফেলল সুদেব, এখানকার কট্টর ইংরেজমনা ভারতীয় যুবতীও মনে করে না সে ব্রিটিশ। অথচ এই দেশ ছেড়ে যাওয়ার কোনো বাসনা তার নেই। মনে মনে সে হঠাৎ মার্গারেট থ্যাচারকে সমর্থন করল। এদেশের বুকে বসে এদেরই দাড়ি ওপড়ানোর স্বভাব এরা কেন সহ্য করবে?

নিচে ব্যাঙ্ক। তার পাশে হেয়ার ড্রেসার। মাঝখান দিয়ে সিঁড়িটা উঠে গেছে সোজা ওপরে। সিঁড়ির শেষে ভারী কাঁচের দরজা। দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকে ডোরম্যান। ইংলণ্ডের প্রায় প্রতিটি বার রেস্টুরেন্ট কিংবা ক্লাবে ডোরম্যান রাখতেই হয়। এই গ্রামে ডোরম্যানদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে। মোটা বুদ্ধির ছেলেরা পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সেখানে স্বাস্থ্যচর্চা করে। হাতেপায়ের পেশী ফুলিয়ে নানারকম কায়দা কৌশল শেখে যাতে শত্রুকে কাবু করা যায়। এরাই ডোরম্যান সাপ্লাই করে। 'প্রেমের' ডোরম্যানের নাম জিমি। বছর চল্লিশেক বয়স, চওড়া কাঁধ, বিশাল বুক, হাতের পেশীগুলো বুঝিয়ে দেয় ওর শক্তির পরিমাণ। কিন্তু জিমি খুব বেশী লম্বা নয়। আর ওর মুখে হাসি লেগেই আছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলেই জিমি দরজা খুলে দাঁড়ায়। অত্যন্ত ভদ্র গলায় বলে, 'গুড ইভনিং।'

তিরিশটি টেবিল এবং একশ কুড়িটি চেয়ার। প্রতিটি নতুন খদ্দেরের জন্য সাদা টেবিল ক্লথ পাল্টানো হয়। আমেদ, ফারুক আর পল সেজেগুজে তিনটে রো দেখাশোনা করে। প্রত্যেকের পরনে সাদা জ্যাকেট কালো বো, কাউণ্টারে ওই একই পোশাকে সুদেব দাঁড়িয়ে। এখন আটটা বাজে। নিচের কিচেনের চার্জে আছেন আকবর ভাই। সিলেটের লোক। বয়স হয়েছে। খুব ভালো রান্না করেন। আমেদের বউ এদেশী। আকবরভাই বিয়ে করেন নি। সত্তর সাল থেকে দেশে ফিরে যান নি। কারণ ওঁর পাশপোর্ট নেই। লুকিয়ে জাহাজে করে চলে এসেছিলেন এদেশে। বেআইনি ঢোকার অভিযোগে একটার পর একটা কেস চলছিল। ব্রিটেন এখন কোথায় ফেরত পাঠাবে ওকে? বাংলাদেশ না পাকিস্তানে? মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে আদালতে ছোটেন আকবরভাই। পল ছোকরার বয়স আঠারো। মিষ্টি চেহারা। খুব হাসিখুশী। ইয়ান বথামের ফ্যান। ওকে সাসপেণ্ড করার পর পল দুদিন কথা বলে নি। বিরিয়ানি খেতে খুব ভালবাসে। রেস্টুরেন্টের সবাই রাতের খাওয়াটা এখানেই সেরে নেয়। পল আর আমেদ একসঙ্গে ট্যাক্সিতে ফেরে। রাত্রে গাড়ি নিয়ে আসে না আমেদ। ফারুক ছেলেটা নিরীহ। আমেদের মতো চৌখস কিংবা পলের মতো হাসিখুশী নয়, কিন্তু খুব বিশ্বাসী। খাটতে

পারে বেশ। এখন ইংরেজদের উচ্চারণ বুঝে নিয়েছে। ও থাকে আক্‌বরভাই-এর সঙ্গে।

প্রথম খদ্দের এলো আটটা পাঁচে। জিমি দরজা খুলে ধরে হাসল, 'গুড ইভনিং।'

'হাই জিমি!'

'হাই।'

আমেদ এগিয়ে গেল, 'গুড ইভিনিং মিসেস হাটন।'

সুন্দর হাসলেন মিসেস হাটন। তাঁর শরীরে দুধসাদা স্কার্ট, সোয়েটার। আমেদ বলল, 'শুক্রবারের সন্ধ্যার প্রথম অতিথি হবার গৌরব আপনার। বলুন, কোন্ টেবিলে বসলে আপনার ভালো লাগবে।'

'সো নাইস অফ ইউ। হোয়ার ইজ দেব? ও দেব! মাই নটি বয়। হাউ আর ইউ!' বালিকার মতো ছুটে এলেন মিসেস হাটন। মিস্টার হাটন অন্তত কোটি-পতি। মহিলা এলেই চল্লিশ পাউন্ডের নিচে বিল দেন না। সুদেব খুশী হলো, বউনি ভালো হলে, রাতটা খারাপ যাবে না। কাউন্টার থেকে প্রসারিত হাতের আঙুলগুলো সযত্নে তুলে ঠোঁটে ছোঁয়ালো সে, 'এতক্ষণ মন খারাপ ছিল, এখন ভালো হয়ে গেল।'

হাত ফিরিয়ে নিয়ে ঠোঁট ফোলালেন মিসেস হাটন, 'ওঃ। এত মন রেখে কথা বলতে পার। অল্প বয়স হলে নির্ঘাৎ প্রেমে পড়ে যেতাম আমি।'

সুদেব মুখ গম্ভীর করল, 'আই অ্যাম সরি, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আমাকে আঘাত দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

থতমত হয়ে গেলেন মিসেস হাটন, 'আঘাত দিলাম? আমি? কি বলছ?'

'নিশ্চয়ই। আপনার দিকে তাকালে আমার বয়সের কথা মনেই থাকে না, আর আপনি সেটা মনে করিয়ে দেন।'

'ওঃ, হাউ নটি, হাউ সুইট।' খিলখিলিয়ে হেসে হাত নাড়লেন মিসেস হাটন, 'গিভ মি এ ভদকা উইদ টনিক। অ্যান্ড হোয়ট ইজ ইওর স্পেশ্যাল টু-নাইট?'

'প্রেম স্পেশ্যাল। ইউ নো দ্য মিনিং অফ প্রেম!'

'সো নটি ইউ আর। পে-রেম, লব। ইউ ইন্ডিয়ান আর পোয়েট।' বৃদ্ধার মুখে রক্তাভা।

'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, আই অ্যাম নো মোর ইন্ডিয়ান। আই হ্যাভ টু অবটেন ভিসা টু গো দেয়ার।'

'ও।' যেন খুব খারাপ কথা শুনলেন এমনভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে কোণের টেবিলে বসলেন মিসেস হাটন।

কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে পল সংলাপগুলো শুনছিল। এবার বলল, 'দেব, আমার মনে হচ্ছে বুড়ি আজ চল্লিশ পাউন্ড খরচ করবে না। তুমি ভুল করলে।'

'কেন?' সুদেব পলের দিকে তাকাল। ওই বয়সে সে ভালো করে কথাই বলতে পারত না। এই ইংরেজ ছোকরা তাদের সঙ্গে চমৎকার মিশে গেছে। কিছু কিছু বাংলা শব্দ আয়ত্তে। অবশ্য আমেদ নির্বাচিত শব্দ শিখিয়েছে।

'ও তোমাকে ভারতীয় ভাবতেই পছন্দ করে।' তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বাংলা বলল, 'শালা !'
জিমি যার জন্য দরজা খুলেছে তার নাম এরা দিয়েছে হাড়কেপ্পন। সবচেয়ে কম দামের খাবার নিয়ে বুড়ো অনবরত খুঁত ধরার চেষ্টা করে। টিপস দেওয়ার সময় হাত কাঁপতে থাকে। পল এগিয়ে গেল, 'গুড ইভনিং মিস্টার জোন্স। ডু ইউ থিংক রাইস উইথ ভ্রাই মিট উইল বি ফাইন ফর ইউ ?'
মিস্টার জোন্স কথার জবাব না দিয়ে চারপাশে নজর বোলালেন। তারপর মিসেস হাটনের দিকে তাকিয়ে টুপিটা তুলে বাউ করলেন। মাঝখানের টেবিলে বসে টুপিটা পলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওয়াইন।'
পল হকচকিয়ে গেল, 'এক্সকিউজ মি ? ডিড ইউ সে ওয়াইন।'
'ডব্লু আই এন ই। হোয়াই ডোণ্ট ইউ টেক হেল্প অফ হিয়ারিং এইড।'
'শালা। বদমাস।' বলে হেসে মাথা নামাল পল। তারপর টুপিটা র‍্যাকে রেখে দিয়ে সোজা সুদেবের কাছে পৌঁছাল, 'শাইলক ওয়াইন চাইছে আজ। সামথিং রঙ। আই ডোণ্ট নো হোয়াই ?'
সুদেব কোনো কথা বলল না। কর্মচারীদের সঙ্গে তরল ব্যবহার সাধারণত করে না সে। খদ্দেরদের সামনে তো নয়ই। এইসময় টেলিফোন বাজল, রিসি-ভার তুলে সুদেব অভ্যস্ত গলায় বলল, 'প্রেম' !'
ওপাশ থেকে জুডির গলা ভেসে এল, 'হাই দেব।'
'হাই জুডি।'
'লুক ! তোমাকে একটা ওয়ার্নিং দেওয়ার জন্য এই ফোন করছি। নাইট সার-ভিস আমরা চালু রেখেছি গ্রামের মানুষের সুবিধের জন্য। কিন্তু তোমার রেস্টুরেণ্ট থেকে প্রায়ই ফলস কল আসছে। আমাদের ড্রাইভাররা ওখানে গিয়ে কাস্টমার না পেয়ে ফিরে আসছে।'
'সেটা যদি পাবলিক করে আমার দোষ কি ?'
'পাবলিককে আমরা চিনি না, ফোনটা আসছে তোমার রেস্টুরেণ্ট থেকে।'
'ও কে ! আমি দেখছি। বাট জুডি ! কতদিন তোমাকে দেখিনি। তোমার মুখটা কেমন আছে ?'
'সেটা জানতে হলে তোমাকে এসে দেখতে হবে।' হেসে জুডি লাইন কেটে দিল।
সুদেব দরজার পাশে পাবলিক টেলিফোনটার দিকে তাকাল। পয়সা ফেলে যে কেউ ওখান থেকে ট্যাক্সি নাইট-সার্ভিসকে ডাকতে পারে। কিন্তু ওরা যদি জেনুইন কল অ্যাকসেপ্ট করা বন্ধ করে দেয় তাহলে নির্ঘাৎ খদ্দের কমে যাবে। কি করা যায় ! পাশাপাশি সিগারেট বক্স। পয়সা ফেললে সিগারেটের প্যাকেট বেরিয়ে আসে। এসবই খদ্দেরদের সুবিধের জন্য। ব্যাপারটা নজরে রাখতে হবে।

এগারটা নাগাদ আজ রেস্টুরেণ্ট ভর্তি। এই গ্রামের সম্মানিত ইংরেজ পুরুষ

রমণী সুসজ্জিতা হয়ে বিভিন্ন টেবিলে। আমেদরা প্রত্যেক টেবিলে মোমবাতি জেবলে দিয়েছে রঙিন জারে। কিন্তু খুব ধীরে দেওয়ালে লুকানো স্পিকারে রবীন্দ্রসংগীত বাজছে। ভারতীয় খাবার খেতে হলে ভারতীয় সংগীত শুনতে হয় এমন ধারণা দিতে চায় সুদেব। মিসেস হাটন চলে গেছেন অনেকক্ষণ। তার বিল আজ দশ পাউন্ড ছাড়ায়নি। কিন্তু তার জন্য দুঃখ নেই। পল মাঝে মাঝে গজগজ করছে, হাড়কিপ্টের খাওয়া কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। এই সময় দুজন সুন্দরী এলেন। জিমি দরজা খুলে বিগলিত গলায় তাদের বলল, 'গুড ইভনিং।'

'হাই জিমি!' 'সো নাইস অফ ইউ জিমি বয়।'

জিমি খুব খুশী হলো, 'একটু বসুন, এখুনি সেরা টেবিলটা খালি হয়ে যাবে।'

অ্যানবলল, 'মাইগড। পুরো গ্রামটাই তো এসে গেছে। দেবের খুব ভালো দিন যাচ্ছে তাহলে।'

জিমি বলল, 'এই আর কি!' সে দুটো চেয়ার এগিয়ে দিল। মার্গারেটকে সেখানে বসতে বলে অ্যান এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে। দুই বান্ধবীর বয়স চল্লিশের গায়ে। কিন্তু শরীরের বন্দোবস্ত এবং চামড়ার তোয়াজ তাদের তরুণী রেখেছে। অ্যানের মুখে একটা মাদকতা আছে এবং সেটা সে চমৎকার কাজে লাগায়। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে অ্যান ঘোষণা করল, 'দিস ইজ মি।'

দেব হাসল, 'আঃ, বিউটিফুল।'

'ডোন্ট বি সিলি। এই সপ্তাহে তোমার একবারও ফোন করার সময় হলো না?'

'তোমার বন্ধুর স্বামী যে গোয়েন্দা অফিসার তা আমি জানতাম না।'

'তাতে আমার কি?'

এবার সুদেবের মনে হলো, সত্যিই তো, তাতে অ্যানের কি? অ্যানের স্বামী তো ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। অ্যান বলল, 'ইউ ইন্ডিয়ান্স আর স্টিল ইন স্টোন এজ। রোজ দুপুরে তোমার জন্য অপেক্ষা করে করে আমার লাইফ হেল হয়ে গেল। আই ওয়ান্ট এ টেবল, রাইট নাউ।'

সুদেব চোখ তুলে তাকাল। কোনো টেবিল খালি নেই। শুধু হাড়কিপ্টে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। সে পলকে ডাকল, 'টেল মিস্টার জোন্স টু পে দি বিল।'

পল অ্যানের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল, 'আমার কথা শুনবে না।'

অ্যান কাঁধ নাচাতে সুদেব উত্তেজিত হলো। কাউন্টারের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে সে জোন্সের সামনে দাঁড়াল, 'এক্সকিউজ মি মিস্টার জোন্স।'

খাবারের প্লেট শেষ করে একটা টেবিল দখলে নিয়ে বুড়ো চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। সুদেবের ডাকটা শুনতেই পেলেন না যেন। সুদেব উষ্ণ হলো। সে খুব আস্তে একটা চামচ তুলে প্লেটে ঠুকল, 'মিস্টার জোন্স!'

চোখ দুটো খুব ছোট খুললেন জোন্স। কোনো কথা বললেন না।

সুদেব বলল, 'আপনার যদি খাওয়া শেষ হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে ভদ্র-

মহিলাদের জন্যে টেবিল ছেড়ে দিন।'

জোন্স ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, 'লুক লেডিস এন্ড জেন্টলমেন, এই ইন্ডিয়ানটা আমাকে অপমান করছে। আমাকে এই রেস্টুরেন্ট থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এদেশে ওদের বাস করতে দিয়ে বিনিময়ে কি ব্যবহার পাচ্ছি তা আপনারা দেখুন।'

সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ হয়ে গেল রেস্টুরেন্ট। সবাই অবাক হয়ে দেখছে। থতমত ভাবটা চটপট কাটিয়ে উঠল সুদেব, 'আমি আপনাকে অপমান করিনি। আপনি চার ঘণ্টা ধরে টেবিল দখল করে আছেন সেটাই মনে করিয়ে দিয়েছি। এবং আপনি জেনে রাখুন আমি ব্রিটেনের নাগরিক।'

জোন্স বেরিয়ে এলেন। তারপর খিকখিক করে হাসলেন সময় নিয়ে, 'ব্রিটিশ! ব্যাঙাচিও নিজেকে মাছভাবে। বাট আই উইল লজ কমপ্লেন এগেনস্ট ইউ।'

তিন পাউন্ডের নোট টেবিলে ফেলে দিয়ে টুপিটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন জোন্স। পল তাড়াতাড়ি টেবিল ঠিক করে ডাকতেই অ্যান এসে বসল মার্গারেটকে নিয়ে। জিমি এসে দাঁড়াল সুদেবের পাশে, 'লোকটা এত বুড়ো যে আমি কিছু করতে সাহস পেলাম না। ছুঁলেই যদি মরে যায়।'

সুদেব বিরক্ত গলায় বলল, 'ও কে! তুমি তোমার কাজ কর।'

অ্যান বলল, 'একটু বসো দেব। লোকটার বয়স হয়েছে, বুড়োরা বেশী কথা বলে।' বলে সে মদির হাসল।

সুদেব চেয়ার টেনে নিল। ভেতরে ভেতরে সে অত্যন্ত উত্তেজিত বোধ করছিল। অনেক বড় গুণ্ডাকে সে এই রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে দিয়েছে। কিন্তু এভাবে অপমানিত কখনও হয় নি।

অ্যান বলল, 'মার্গারেটকে তোমার কেমন লাগছে দেব? শী ইজ রিয়েল লোনলি।'

সুদেব মুখ তুলে তাকাল। সাধারণ চেহারা মেয়েটার। সে ভদ্রভাবে বললো, 'আচ্ছা!'

মার্গারেট বলল, 'অ্যান ইজ ডায়িং ফর ইউ!'

সুদেবের আর এদিকে মন ছিল না। সে লক্ষ্য করছিল খুব দ্রুত রেস্টুরেন্ট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এইসময় পল এসে তার কানে কানে বললো, 'কাম হিয়ার বসো।'

ক্ষমা চেয়ে নিয়ে টেবিল ছাড়ল সুদেব। পল বললো, 'হাড়কিপ্টে নিচে দাঁড়িয়ে লোক জড় করছে। তারা নতুন খদ্দেরদের ভেতরে ঢুকতে নিষেধ করছে।'

মাথায় আগুন জ্বলে গেল সুদেবের। সে দরজা খুলে আধেক সিঁড়ি নেমে এলো। অন্তত জনা দশেক লোক জমা হয়েছে। বুড়ো সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। সুদেব বলল, 'মিস্টার জোন্স, আপনি এইরকম করতে পারেন না। আমার বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকলে পুলিস স্টেশনে যান।'

'পুলিস স্টেশন? লোকটা আমার দেশে থেকে আমাকেই আইন দ্যাখাচ্ছে!' জোন্স চিৎকার করল।

সুদেব বলল, 'আপনারা আমাকে চেনেন। জোন্স যা বলছে সেরকম করতে পারি বলে মনে হয় ?

জনতা কিছু বলল না। খানিক বাদে তারা চলে যেতে জোন্স বিদায় নিলেন। সেই রাত্রে দরজা বন্ধ করার সময় দেখা গেল শুক্রবারেরর বিক্রি সোমবারের চেয়েও কম। 'প্রেমে' গোলমাল হয়েছে খবরটা কানে যাওয়া মাত্র খদ্দেররা অন্য-মুখো হয়েছে। কিন্তু সুদেবের মনে হচ্ছিল না জোন্সকে টেবিল ছাড়তে বলে সে কোনো অন্যায় করেছে। আজ আমেদ পল আর ফারুক তাকে বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করার পর সুদেব সোফায় বসে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। খুব ক্লান্ত লাগছে, নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে।

সকালে ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। পুলিশ স্টেশন থেকে তাকে তাড়াতাড়ি রেস্টুরেণ্টে যেতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনোমতে তৈরি হয়ে গাড়ি নিয়েই সে পেঁাছে গেল। এর মধ্যে বেশ ভিড় জমে গেছে। পুলিস চারপাশে। অফিসার এগিয়ে এসে বললেন, 'সরি দেব।'

সমস্ত রেস্টুরেণ্টটায় কেউ যেন দুরমুশ চালিয়েছে। একটা প্লেট ডিশ, চেয়ার টেবিল এবং কয়েক হাজার পাউণ্ডের মদের বোতল আস্ত নেই। এমন কি কার্পেটগুলোতেও আগুন ধরানো হয়েছিল। বুকের পাঁজর গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল সুদেবের। এবং তখনই তার মনে পড়ল এসবই ইনস্যুরেন্সের আওতায় আছে। যা গেছে তার অনেক বেশী পাওয়া যাবে। অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কাউকে সন্দেহ হয় ?'

কি বলবে সুদেব। সে শেষ পর্যন্ত নামটা বলল। অফিসার দ্রুত মাথা নাড়লেন, 'নো নো। ইটস ইম্পসিবল্। জোন্সের বয়স যা তাতে এসব তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া গতরাত্রে সে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গিয়েছে। সেটা করার পর এসব ! অন্য কারো কথা ভাবো।'

সুদেব বললো, 'এই গ্রামের কোনো মানুষ আমার শত্রুতা করবে তা ভাবতে পারছি না।'

পুলিস স্টেশন থেকে বের হতে দেরি হয়ে গেল। যা যা ক্ষতি হয়েছে তা লিপি-বদ্ধ করে একটা কপি নিয়ে নিয়েছে সে। ইনসুরেন্স কোম্পানির লোক এসে দোকানটা সিল করে দিয়েছে। ওরা ক্ষতির মূল্যায়ন করবে। গাড়িটা বাড়ির পেছনে রেখে কয়েক পা এগোতে সে ফারুক, আকবরভাই এবং আমেদকে দেখতে পেল। প্রত্যেকের মুখ শুকনো। বাড়িতে ঢোকার পর সে বলল, 'সাতদিন বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে ঠিকঠাক করে নেব। আপনাদের মাইনে পাবেন। কিন্তু কে করল ?'

আকবর ভাই বলল, 'দেব ভাই, খবর ভালো নয়।'

'কি খবর ?'

'গ্রামে অ্যান্টি ইণ্ডিয়ান ফিলিং জোরদার। সকালে প্যাটেলের দোকানে হামলা হয়েছে।'

'কিন্তু আমি তো ব্রিটিশ সিটিজেন।'

ফারুক বলল, 'সেকথা তো বেশী লোক জানে না। আমি বাংলাদেশের লোক, আমাকেও ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ফেলেছে ওরা। কদিনের জন্যে এখান থেকে চলে গেলে ঠিক হয়।'

আকবরভাই বলল, 'কোথায় যাবে? আস্তে আস্তে সমস্ত ইংলণ্ডেই এই হবে। তোমাদের অবশ্য দেশ আছে, আমার তো তাও নেই।'

আমেদ চুপচাপ বসেছিল। এবার বলল, 'আমারও অস্বস্তি হচ্ছে। আসবার সময় দুটো ছোকরা আমার দিকে তাকিয়ে সিটি দিচ্ছিল। বউ বলছে কদিন লণ্ডন থেকে ঘুরে আসতে।'

সুদেব তাকাল। আমেদের বউ ইংরেজ। এখনও সিটিজেনশিপ পায় নি। তবে পেয়ে যাবে। তবু ও ভয় পাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হলো হিন্দু মুসলমানদের রায়টের সময় এই রকম ভয়ার্ত হয়ে থাকত দুই ধর্মের মানুষ। আর আজ দুই ধর্মের মানুষ একসঙ্গে ভয় পাচ্ছে সাদা চামড়াকে। ধর্মের চেয়ে অস্তিত্ব এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'আমরা মিছিমিছি ভয় পাচ্ছি। ব্রিটেনের ডেমোক্রেসি বিশ্ববিখ্যাত। সরকার নিশ্চয়ই আমাদের প্রোটেকশন দেবে। তাছাড়া এই গ্রামের সবাইকে আমি চিনি। সামনাসামনি কেউ কিছু করতে সাহস পাবে না।

এই সময় ফোন বাজল। সুদেব রিসিভার তুলে বলল, 'হেলো।'

'হাই দেব। অস্কার।'

'ও, অস্কার। বল, কি খবর?'

'কাল রাত্রে যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দুঃখিত।'

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে সুদেব আমেদকে বলল, 'দ্যাখো, অস্কার সমবেদনা জানাচ্ছে। সবাই এক গোত্রের নয়।' তারপর হাত সরিয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। আমি এটাকে দুর্ঘটনা বলে ধরে নিচ্ছি।'

'না না। এটা দুর্ঘটনা নয় অ্যাণ্টি ইন্ডিয়ান ফিলিং ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। খুব দুঃখের কথা, কিন্তু বাস্তবকে তো মানতেই হবে। বাই দ্য বাই; আমি শুনলাম তুমি নাকি তোমার রেস্টুরেণ্ট বিক্রি করে দিতে চাইচ। আমার মনে হয় আমি তোমাকে ঠিক দাম দিতে পারব।'

'বিক্রি?'

'হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম। তুমি বিপদে পড়েছ ভেবে সবাই দাঁও মারতে চাইবে। আমি সেই দলে নই।'

'সরি অস্কার, আমি রেস্টুরেন্ট বিক্রি করতে চাই না।'

'কি যাতা বলছ? তুমি ওখানে ব্যবসা করতেই পারবে না!'

'সেটা আমি বুঝব।'

'ঠিক আছে। তবে যদি কখনও বাধ্য হও, টেল মি।' লাইন কেটে দিল অস্কার।

হাওয়া গরম হয়ে উঠল। সুদেবের বাড়ির সামনে পুলিস পোস্টেড। এখন শুধু এই গ্রাম নয়, সমস্ত দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিস, আমেরিকা অথবা এশিয়ার অন্য দেশের মানুষ নয়, ভারতীয় এবং তাদের মতো দেখতে

বাংলাদেশী এবং পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ। কোথাও কোথাও সংঘর্ষ হচ্ছে। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক কাঠামো ভারতীয়দের জন্যে দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে বিক্ষোভকারীদের ধারণা। টিভি-তে এই ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখানো হচ্ছে। একজন বৃদ্ধ বললেন, 'কুড়ি বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলাম শান্তিতে থাকব বলে। কিন্তু মনে হচ্ছে না ফিরলেই ভালো হত। কারণ ব্রিটেন আর ইন্ডিয়ার কোনো পার্থক্য নেই। রাস্তায় হাঁটলে তিনজনের মধ্যে একজন ইন্ডিয়ান। দেশে এসে লাভ কি হলো!' লন্ডনের উপকণ্ঠে একটা ভারতীয় এলাকায় গুলি চলেছে। প্রধানমন্ত্রী সমস্ত দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছেন শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে। পুলিসকে কঠোর হতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারী নীতি খুব শিগগীর ঘোষণা করা হবে। সম্প্রতি ব্রিটেনে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। সমস্ত পৃথিবী থেকে কলোনি উঠে যাওয়ায় চাকরি কমে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমর্থনের প্রশ্ন নিয়েও জটিলতা দেখা দিয়েছে। বেকার সমস্যা যখন প্রবল হতে চলেছে তখন ভারতীয়দের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং তারা ব্যবসা করে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে—এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার সময় এসেছে।

সকালে পুলিস স্টেশন থেকে টেলিফোন এল। গ্রামের সমস্ত ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশী লন্ডনে চলে গিয়েছে। শুধু সুদেবকে নিয়ে পুলিস চিন্তিত। যদি সে চায় তাহলে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত তার এসকর্টের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এখানে সে ব্যাংকে যেতে পারছে না, দোকানে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু লন্ডনে অবস্থা খুব ভালো। সেখানে যা গোলমাল হয়েছিল তা শহরতলিতে কিন্তু তাও থিতিয়ে গিয়েছে। সুদেব চিন্তা করার সময় চাইল।

টি ভি খুলল সুদেব। ভারতীয় বাংলাদেশীরা দলে দলে ব্রিটেন ছাড়ছে। সরকার যতই প্রতিবাদ করুন কিন্তু সুদেবের মনে হচ্ছিল যতটা কঠোর হওয়া উচিত ততটা হচ্ছে না। যদিও আজ অবধি তার বাড়িতে কেউ কিছু করে নি কিন্তু—! সুদেব ঠিক করল এইভাবে বোকার মতো সে বসে থাকবে না। মন হাল্কা করার জন্যে সে অ্যানকে ফোন করল। কিছুক্ষণ বাজার পর অ্যান ফোন ধরল।

'হাই অ্যান, দিশ ইজ দেব।'

'ও মাই গড! ইউ আর স্টিল হেয়ার!' অ্যানের গলায় বিস্ময়।

'বাঃ আমি কোথায় যাব! আমি তো ব্রিটেনের নাগরিক!'

'বাট—!'

'না না কোনো কিন্তু নেই। কেমন আছ বল! দেখা হতে পারে? এখন তো আমার কোনো কাজ নেই।' সুদেব খুব মন-খোলা কথা বলার চেষ্টা করল।

'কিন্তু দেব, আমি যে ভীষণ ব্যস্ত!'

'ব্যস্ত?'

'হুঁ। মাইক এসেছে। মাইককে চেন? ওয়েস্ট ইন্ডিসের সেই লম্বা ছেলেটি যে দারুণ নাচে। আমরা দুপুরটাকে এনজয় করছি। বাই দেব।'

টেলিফোনটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল দেব। তারপর উঠে জামাকাপড়

পরে নিল। ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের প্রমাণ স্বরূপ পাশপোর্টটা হিপ পকেটে ভরে নিল। তারপর বাইরে বেরিয়ে এলো। যে পুলিসটি দাঁড়িয়েছিল সে অবাক চোখে তাকাল, 'তুমি ? বাইরে যাচ্ছ ? পারমিশন নিয়েছ ?'

'আমারটা আমি বুঝব ! তোমার এখানে থাকার দরকার নেই।' কথাটা বলে সে জোরে জোরে পা ফেলে গাড়িতে উঠল। ববের বাড়ির সামনে এসে সে গাড়ি থামাল। বব একা নন। তাঁর পাশে যে বর্ষীয়সী সুন্দরী দাঁড়িয়ে তাঁর নাম ডোরা। ববের একদা প্রেমিকা।

সুদেব বলল, 'হেলো বব !'

বব ঘুরে দাঁড়ালেন, 'হ্যালো ! দেব না ?'

'ইয়েস।'

ববকে আরও বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। বব বললেন, 'ইউ নো ডোরা ! ওয়ান্স আপন এ টাইম উই লভড্ ইচ আদার। অ্যান্ড নাউ শী ওয়ান্টস টু স্টে উইদ মি।'

'আই সি।'

'দেব, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক শী ইজ বিউটিফুল ?'

'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু আমার তো লিজার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত, তাই না ?'

'ও বব ! লি তোমাকে ছেড়ে গিয়েছে। বেটার লেট দ্যান নেভার।'

ডোরা এবার সুদেবের দিকে তাকাল, 'বাট হি ইজ ইন্ডিয়ান, ইজন্ট হি ?'

'ইয়েস। হি ওনস দি রেস্টুরেন্ট, প্রেম। ভেরি নাইস বয়।'

'বাট হি ইজ ইন্ডিয়ান !' ডোরা যেন আঁতকে উঠল। আর তখনই পরিবর্তন এল ববের।

'হে দেব ! ইউ শুড নট স্টে হেয়ার।'

'আই নো বব।' গাড়িটা চালাল সুদেব। রাস্তা পরিষ্কার। চারধারে যেমন কাজকর্ম চলছে তেমন চলছে। কেউ তাকে কিছু বলছে না। ক্রমশ মনে বেশ আস্থা এসে গেল তার। 'প্রেমে'র সামনে এসে সে দেখল দোকানটা তেমনই বন্ধ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল সে গাড়ি থেকে নেমে। হঠাৎ তিনটে ছেলে যেন ভগবানের মতো নেমে এলো সামনে। আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে করতে সে চেতনাশূন্য হলো।

জ্ঞান ফিরল যখন তখন সে হাসপাতালে। ডাক্তার বললেন, 'ও কে, নাউ ইউ আর আউট অফ ডেঞ্জার। লাকি বয়।'

তার মাথায় ব্যান্ডেজ। সমস্ত শরীরে ব্যথা। সে ধীরে ধীরে হাতটা নিয়ে গেল হিপপকেটে। বুকের ধড়ফড়ানি শান্ত হলো। পাশপোর্টটা ঠিকঠাক আছে। হঠাৎ খুব কান্না পেয়ে গেল তার। এই গ্রামটাকে সে নিজের মনে করত। প্রতিটি মানুষকে সে জানে, প্রতিটি ফুটপাত তার চেনা। পাশপোর্টটা পাওয়ার পর থেকেই তার মনে হত সে সবচেয়ে সভ্যদেশে আছে। ছেলেবেলা থেকে যা যা পায় নি তা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছিল সে। আর এই দেশটাই রাতারাতি অচেনা হয়ে গেল। সে কি করবে ? হাইলাকান্দিতে ফিরে

যাবে ? তার যা টাকা আছে তা নিয়ে হাইলাকান্দিতে গেলে লোকে তাকে বড়লোক বলবে। সে সিদ্ধান্ত নিল। কালই দেশে ফিরবে। আর তখনই তার মনে পড়ল সে ইন্ডিয়ায় হুট করে যেতে পারে না। ইন্ডিয়ায় ঢুকতে গেলে সে দেশের সরকারের কাছে ভিসা লাগবে। ইন্ডিয়ার চোখে সে বিদেশী। বুকের ভেতরে আর একটা কষ্ট পাক দিয়ে উঠল। কিন্তু তবু সে চেষ্টা করবে। এই-সময় নার্স আসতেই তাকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কটা বাজে ?'

'এখন রাত এগারটা।'

'আমার গাড়িটা কোথায় ?'

'হাসপাতালের কম্পাউন্ডে। কেন ?'

'না, এমনি।'

আরও আধঘন্টা পরে সে টলতে টলতে গাড়িতে উঠে বসল। মাথায় লাগছে। কিছুক্ষণ পরে সেটা কমতে সে হাসপাতালের দিকে তাকাল। সে যে বেরিয়ে এসেছে তা কেউ লক্ষ্য করে নি। চাবি বোর্ডেই ছিল। সেটা ঘোরাতেই ইঞ্জিন সাড়া দিল।

রাতের গ্রাম জনমানবহীন। খুব ধীরে ধীরে সে গাড়ি চালাচ্ছিল। আজ শুক্র কিংবা শনিবার নয় যে রাস্তায় লোক থাকবে। যেন এক মৃত্যুপুরীর মধ্যে দিয়ে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো বাইরে। আর একটু এগোলেই হাইওয়ে! গাড়িটাকে সে দাঁড় করাল টেলিফোন বুথের পাশে। তার শীত করছিল খুব। হাসপাতালের বিছানায় কেউ গরমজামা পরে শোয় না। এয়ারকন্ডিশন্ড থেকে বেরিয়ে এখন সারা শরীরে কাঁপুনি আসছে। নাম্বার টিপে সে লন্ডনের অপারেটরের সঙ্গে কথা বলল, 'গিভ মি ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসি।'

ওপাশে ফোন বাজল। এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল। এত রাত্রে এটা আশা করতে পারে নি সুদেব। 'ইন্ডিয়ান এম্বাসি'।

'দেখুন, আমি ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চাই। ওখানে আমার মা-বাবা আছেন। আসামে।'

'যান না, কে মানা করেছে। তবে প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা আমরা করতে পারব না। হেভি রাশ।'

'কিন্তু আমি ব্রিটিশ পাশপোর্ট হোল্ডার। আমার ভিসা চাই।'

'আপনি ভারত থেকে আসেন নি ?'

'না। বললাম তো আমি ভারতে যাওয়ার জন্যে ভিসা চাই।'

'স্যরি! এই মুহূর্তে আমরা ভারতে যাওয়ার জন্যে ভিসা দিচ্ছি না। আপনি কয়েকদিন পরে যোগাযোগ করুন। আমরা এখন ভারতীয়দের নিয়ে ব্যস্ত।'

টেলিফোন রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। আমি তাহলে কি ? আমি ভারতীয় নই, পাশপোর্ট থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা ব্রিটিশ বলে মনে করে না। আমি এখন কি করব! ফারুক আমেদরা ইচ্ছে করলেই ওদের দেশে ফিরে যেতে পারে, হয়তো গিয়েওছে এত দিনে! হঠাৎ একটা কান্না তার শরীরকে অচ্ছন্ন করল। তার ঝকঝকে বাড়ি, গাড়ি, রেস্টুরেন্ট, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, রঙিন টিভির পাশে

হাইলাকান্দির মধ্যবিত্ত বাড়িটা যার বাথরুমে কমোড না থাকায় অসুবিধে হয়, তাই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ একটি মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়ে তার সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। মানুষটা তার গাড়ির বনেটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। কি করবে এখন সে। টেলিফোন বুথ থেকে বের হলেই ও আক্রমণ করবে নিশ্চয়ই। মানুষটা এবার এগিয়ে আসছে। চোখ বড় করে সে তাকাতে অবাক হলো। মহিলা, বৃদ্ধা। বৃদ্ধারা কি কখনও খুনী হয়?

সে দরজাটা খুলতেই চমকে উঠল। কোনোরকমে উচ্চারণ করল, 'ইউ?'

মহিলার চোখে বিস্ময়। ব্যান্ডেজে মোড়া মুখটাকে চিনতে চেষ্টা করছিলেন তিনি। এগিয়ে এসে হাত ধরল সুদেব, 'কোত্থেকে আসছ তুমি? একি চেহারা হয়েছে তোমার?'

'আমি ফিরে আসছি। অনেকটা হেঁটে আসছি। আমি আর পারছি না। কিন্তু তুমি কি আমাকে চেন?' বৃদ্ধার গলায় প্রশান্তি।

'ও! আমি সুদেব, দেব, ওনার অফ প্রেম।'

'হায় ভগবান! তোমার চেহারা এরকম কে করল? কি হয়েছে তোমার?' বৃদ্ধা ওকে জড়িয়ে ধরলেন।

'আমাকে মেরেছে। আমার রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। দে ওয়ান্ট টু কিল মি।'

'কিন্তু কেন?'

'বিকজ, বিকজ—।' একমুহূর্ত ভাবল সুদেব, 'বিকজ আই অ্যাম ইন্ডিয়ান!'

'সো হোয়াট?'

সুদেব কাঁধ নাচাল। বৃদ্ধা বিড়বিড় করলেন, 'কি অমানুষ হয়ে যায় মানুষ!'

'তুমি, তুমি কোত্থেকে আসছ?'

'আই অ্যাম কামিং ব্যাক। আই ওয়ান্ট টু সি বব। ডু ইউ নো ও কেমন আছে?' বৃদ্ধা আকুল হলেন।

'ভালো। কিন্তু—!'

'কিন্তু কি?'

'ডোরা ওর কাছে আছে।'

'ডোরা।' হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধা মুখে হাত চাপা দিয়ে। সুদেব বলল, 'লিজা, আই কান্ট গিভ ইউ এ লিফট। ওই গ্রামে ঢুকলে আমাকে মেরে ফেলবে।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন লিজা, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'আই ডোন্ট নো।' বলেই সে দূরে গাড়ির আলো দেখতে পেল। গাড়িটা এগিয়ে আসছে। সে চঞ্চল হলো, 'আমি যাই।'

লিজা বাধা দিল, 'তুমি, তুমি ড্রাইভ করতে পারবে?'

'চেষ্টা করছি।

'দাঁড়াও, আমি তোমার হয়ে ড্রাইভ করব।'

লিজা গাড়ি চালাচ্ছে। ওরা উল্টো পথে যাচ্ছে। পাশে মাথা হেলিয়ে সুদেবের মনে হলো এর চেয়ে আরাম কিছুই নেই। লিজার একটা হাত তার হাঁটুতে। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, 'হিপিরা কেমন ?'
'মানুষের মতো।'
'গেলে যখন চলে এলে কেন ?'
'দেখা হয়ে গেল। নতুন করে দেখতে ফিরেছিলাম।'
'তাহলে গ্রামে যাচ্ছ না কেন ?'
'আমার সহ্যশক্তি কম, তাই।' নিঃশ্বাস ফেললেন লিজা, 'তুমি এখন একটু ঘুমিয়ে নাও দেব। যেতে যেতে নিশ্চয়ই একটা জায়গা খুঁজে পাব যেখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না। ঘুমিয়ে পড় দেব।'
চোখ বন্ধ করেছিল সুদেব। এবার খুলল। হিপি হয়ে যাওয়ার পর লিজার চেহারাটা বিদিকিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। চুল যেভাবে ছাঁটা তা সহ্য করা মুশকিল। কিন্তু ড্যাসবোর্ডের আলোয় ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে ওর মনে হলো হাইলাকান্দির উঠোনটায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে কোনোমতে বললো, 'লিজা, গাড়ি চালাতে তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হবে!' লিজার হাতটা স্নেহ ঝরাল, 'নো মাই বয়। লেটস ফরগেট এভরিথিং। ফরগেট ইওর উন্ড। ফরগিভ দেম। কিন্তু তোমার স্পর্শের জায়গাটা খুলে রেখো মানুষের মতো।'
শেষ কথাগুলো কানে যাওয়ার পরই একটু গুনগুনানি শুনতে পেল সুদেব। নিশুতি রাতের হাইওয়ে ধরে ছুটে যাওয়া গাড়িতে বসে সে কোনো কোনো কথা বুঝতে পারছিল না। কিন্তু সুরটা আজন্ম চেনা। দ্রুত ঘুম এনে দিল তাকে।

বিলিতি মদ দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে পায়ের শুকনো চামড়া নরম হয়ে যায়। তারপর একটু একটু করে উঠতে উঠতে সাফসুতরো—, এই পরামর্শ দিয়েছিল গদাধর। টায়ারের জুতো পরে পরে চামড়াটা মোষের ঘাড়ের মতো হয়ে গেছে। ব্যথা নেই, রস গড়ায় না কিন্তু চোখ পড়লেই বিশ্রী হয়ে যায় মনটা। তার এখন যে বয়স তাতে শরীরের খোলতাই কেউ আশা করে না। হাজামের কাছে উবু হয়ে বসতে কখনও কখনও দিন দশেকও পার হয়ে যায়। খাকি শার্ট আর রঙিন পাজামায় ঘাম জমে জমে বিদঘুটে যে গন্ধটা তৈরি হয় তার সঙ্গে পাকা কাঁচা খোঁচা দাড়ি চমৎকার মানিয়ে যায়। এইজন্যে অবশ্য মালিকের কাছে কোনো কটু মন্তব্য শুনতে হয় না জীবনের। তবে গাড়িতে উঠলে নাক কুঁচকে যায় মেমসাহেবের। অবশ্য মেমসাহেব এ গাড়িতে উঠেছেন গোনাগুনতি তিনবার। এই পাগলা গাড়িতে কেউ উঠতে চায় না যদি পেটে কিছু না পড়ে।

তিন বছর জিপটা চালাচ্ছে আকাশলাল। এর আগে সে ছিল শিলিগুড়িতে। বলরামবাবুর অ্যাম্বাসাডার চালাত। তার আগে কাটিহারে। জীবনভোর কত গাড়ি চালানো হলো। সবকটা গাড়ির চরিত্র আলাদা। মর্জি না বুঝেছ তো ফাঁসলে। সেইসব জেনেশুনে চালাত বলে আকাশলালের খ্যাতি হয়েছিল। বলরামবাবুর ওখান থেকে তাকে নিয়ে এলো এই মালিক। লোকটাকে দেখে তার ভালোও লেগেছিল। ঝকঝকে চেহারা, ফর্সা, বছর তিরিশের মধ্যে বয়স। ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা করেছে। দেখলে বেশ স্নেহ স্নেহ বোধ জাগে। বলরামবাবু বলেছিল, 'চলে যাও ডুয়ার্সে। কাজের ঝামেলা কম। তোমারও তো বয়স হচ্ছে। তিরিশ টাকা বেশী মাইনে দেবে। ছোকরার এখন খুব ভালো সময় যাচ্ছে। কোনো নেশা ভাঙ করে না, অনেক উঁচুতে উঠবে।'

কি যেন মন বুঝল বলরামবাবুর গ্যারাজ ছেড়ে চলে এলো নতুন মালিকের সঙ্গে। তখন এই মালিকের দুটো গাড়ি ছিল। ফিয়াটটা চাপত মেমসাহেব। জিপে বড্ড হাওয়া ঢোকে, হুড খোলা থাকায় আব্রু থাকত না বলে ফিয়াটটাই পছন্দ করত মেমসাহেব। ফিয়াট চালাত একটা নেপালি ছোকরা। খুব সাজগোজ ছিল তার। তার পোশাক-আশাক এবং বয়স দেখে কথাই বলতে চাইত না ছোকরাটা। সেই গাড়ি নেই, সেই ছোকরাও নেই। তখন মালিক আর মেমসাহেবকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। এখন দেখতে ইচ্ছে করে না।

তিন বছর আগে হুইলে বসত আকাশলাল। সকাল সাতটায় নাস্তা খেয়ে চটপটে পায়ে এসে জিপে উঠত। সোজা সাইটে কিংবা সদরের ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে ছুটে যেতে হত তাকে। ভোর ভোর স্নান সেরে পুজো করে নিয়ে পবিত্র মনে স্টিয়ারিং ধরে ভোরের হাওয়া রোদ মাখতে খুব আরাম লাগত

আকাশলালের। ডুয়ার্সের ঝকঝকে রাস্তায় দুপাশে গাছের সারি রেখে ছুটে যেতে কি যে আরাম লাগত। শিলিগুড়ি ছেড়ে চলে এসে বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে বলে মনে হত। এইরকম হাওয়া শরীরে লাগালে বেঁচে থাকাটা বেশ আরামদায়ক হয়। যেতে মালিক জিজ্ঞাসা করত, 'এই জিপটাকে চালাতে তোমার কেমন লাগছে আকাশলাল?'
'বহুৎ আচ্ছা মালিক, ঠিকই হ্যায়।'
'আমার বউ এই জিপটায় উঠতেই চায় না। বুঝলে? কেন উঠতে চায় না জান?'
'নেহি মালিক।'
'ও বলে জিপ হচ্ছে কাঠখোট্টা পুরুষের মতো, রসকস নেই!' কথাটা বলে হো হো করে হেসে উঠত মালিক। কথাটা আকাশলালের মন খারাপ করে দিত। ড্রাইভার হিসেবে সে যে ওই নেপালি ছেলেটার চেয়ে ঢের ভালো এটা মেম-সাহেবের জানা উচিত।
রবিবার মালিক বাড়ির বাইরে বের হত না। সেদিনটা চমৎকার কাটত আকাশ-লালের। ছিপ নিয়ে বেরিয়ে যেত ঝিলে। বিশাল ঝিল। কালো জল সেখানে স্থির হয়ে থাকে অনেক রহস্য নিয়ে। পুঁটি কাতলার বাচ্চা চটপট উঠে আসে। কিন্তু তাদের সাইজ এক বিঘতের মধ্যে। আকাশলাল মাছ মাংস মদ খায় না। শিকার করা মাছগুলো সে পৌঁছে দিত মালিকের বাড়িতে। প্রথম দিনই মালিক মাথা নেড়েছিল, 'এই মাছ কে খাবে আকাশ? ছোট মাছ বেজায় কাঁটা। আমার বউ কাঁটা বাছতে পারে না। তুমি খেয়ে নিও।'
'আমি তো মাছ খাই না মালিক।'
'আচ্ছা? তাহলে ধরো কেন?'
'ধরতে ভালো লাগে।'
'তাহলে রেখে যাও। চাকরবাকর খাবে।'
তাই করত আকাশলাল। তিন রবিবার। শেষ পর্যন্ত ছিপ নিয়ে বের হওয়া বন্ধ করল। সারাদিন কাঠের ঘরের সিঁড়িতে বসে দেখত প্রচুর মানুষ দঙ্গল বেঁধে বসে গেছে ঝিল-এর চারপাশে। মানুষ যা পারে তা ঈশ্বরও পারেন না। দেখতে দেখতে ঝিলটা ফাঁকা হয়ে গেল। বঁড়শি পড়লে ফাৎনা নড়ে না। শুধু মাঝখানে জল তোলপাড় করে একটা বিশাল মাছ শরীর মোচড়াতো। অনেকে অনেকরকম চেষ্টা করেছে। কোনো টোপই চেখে দ্যাখেনি মাছটা। হতাশ মানুষেরা রটিয়ে দিয়েছে মাছটার শরীর এত পেকে গিয়েছে যে তার শক্ত মাংস খাওয়া যাবে না। এখন দু-একজন ঝিলের পাশে বসে কি বসে না। এ দৃশ্য উদাস চোখে চেয়ে দ্যাখে আকাশলাল। দ্যাখে আর পায়ের শক্ত চামড়ায় হাত বোলায়। গদাধর বলেছিল বিলিতি মদে ভিজিয়ে রাখতে। বিলিতি মদের দাম অনেক। যারা বিলিতি পেটে ঢালে তারা পায়ের চামড়ায় কি নষ্ট হতে দেবে। কয়েক মাস আগে হলে সে নিজেই একটা বিলিতি কিনে ফেলতে পারত। তারপর তুলোয় জড়িয়ে পায়ের চামড়া ভেজাতো। কিন্তু তিনমাস আগে শেষ

টাকা পেয়েছে মালিকের কাছ থেকে। বড় ভয় লাগে জমানো টাকা খরচ করতে। আগে এমন হলে চট করে সে অন্য একটা গাড়ির স্টিয়ারিং ধরার চাকরি নিয়ে চলে যেত। গেছেও তো কতবার। কিন্তু এবার পারছে না। বয়স হয়েছে তার? সেকথা ঠিক। এমনকি শরীরের চামড়াও কুঁচকেছে। কিন্তু তাই বলে খাটবার শক্তি তো যায় নি। তবু যেতে ইচ্ছে করছে না কোথাও। অস্বস্তি না ভয়, সেটা বুঝতে পারে না আকাশলাল। ডুয়ার্সের এই জায়গাটা তার মন থেকে শেকড় নামিয়েছে হাজারটা। তাছাড়া, গত কয়েকমাস সে কবার স্টিয়ারিং ধরেছে গুনে বলতে পারে। গাড়ি না চালিয়ে না চালিয়ে চালাবার মনটায় কেমন জং ধরে গেছে। যা টাকা তার কাছে আছে তাতে আরও এক বছর এই ঘরে বসে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে মালিকের জন্যে। এইখানেই একটু গোলমাল হয়ে যায় আকাশলালের। ঈশ্বরকে মানুষ খেলায় না মানুষকে ঈশ্বর? ছয়মাস আগে হলে সে প্রতিদিন রাত্রে বোতল বোতল বিলিতি মদ পায়ে ঢালতে পারত। তখন তো পায়ের চামড়াটা শক্ত হয় নি। এখন চেষ্টা করলে মালিকের সঞ্চয় থেকে আধ বোতল দিশি সরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু দিশিতে এটা সারবে না বলে জানিয়েছে গদাধর।

বড় কন্ট্রাক্ট পাওয়ার কথা ছিল মালিকের। শিলিগুড়ির হরি সাহার কাছে গিয়ে ছিল খোশ মেজাজে। যাওয়ার সময় মালিক জিপে বসে বলেছিল কাজটা এত বড় যে তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ ওটা করতে পারলে সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকা যাবে। শিলিগুড়ির হরি সাহাও কাজটা চায় কিন্তু তার একার দ্বারা হবে না। অতএব দুজনে মিলতে চায়। পার্টনারশিপে ব্যবসাটা চালাবে শুধু এই কাজটার জন্যে। কখনও কখনও মালিকের মন ভাল থাকলে এইসব কথা বলত। ব্যাপারটা ভালো লাগে নি আকাশলালের। অন্যের ওপর বিশ্বাস কতদিন টিকে থাকে? কিন্তু কিছুই বলে নি সে। তার সাথে না মতামত জানানো।

কিন্তু সেই রাত্রে, জলপাইগুড়ি শহরের বাইপাস দিয়ে হু হু করে গাড়ি চালিয়ে ফেরার সময় একদম বেহুঁশ হয়ে থাকা মালিকের শরীরটার দিকে তাকিয়ে সে বিড়বিড় করেছিল, 'এটা ঠিক না মালিক। নিজের শরীরটা অন্যের কাছে ছেড়ে দিলে কুকুরও লাথি মারে। নিজের ব্যবসা অন্যের সঙ্গে জুড়লে তার ইচ্ছেটাও রাখতে হয়। লোকটা আপনার বন্ধু নয় মালিক। প্রথম রাত্রে এত মদ খাওয়ায় যে, সে আপনার বন্ধু হতে পারে না। কিন্তু সেসব কথা শোনার ক্ষমতা ছিল না মালিকের। বাড়ির সামনে জিপ থামিয়ে আকাশলাল দেখেছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেটা ভালোই বলে মনে হয়েছিল তার। মালিকের ওই অবস্থা অন্য চাকরবাকর দেখুক সে চাইছিল না। মালিকের শরীরটা কাঁধে তুলে নিয়ে গেট খুলে সোজা দোতলায় উঠে গিয়েছিল। কোন্ ঘরে মালিক ঘুমোয় তা সে জানে না। দরজা বন্ধ সব কটা ঘরের। তার মনে হয়েছিল যে বাড়ি মালিক যত্ন করে বানিয়েছে তার দরজা অন্য মানুষরা বন্ধ রাখে কেন? সে চাপা গলায় ডেকে ছিল, 'মেমসাব, মেমসাব, মালিক আয়া হ্যায়।'

দক্ষিণের ঘরের দরজা খুলে গেল। মেমসাহেব আলো জেলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ?'

'আমি মেমসাব। মালিকের শরীর ঠিক নেই।' তারপর মালিককে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চুপচাপ নেমে এসেছিল নিচে। সেই রাত্রে তার খুব খারাপ লেগে-ছিল। মালিকের মদ খাওয়ার জন্যে তো বটেই, আরও খারাপ লেগেছিল এই জন্যে মেমসাহেব কি করে ঘুমিয়ে ছিল? অতরাত্রে বিনা নোটিসে মালিক কখনও বাড়ি ফিরত না।

একবার আগল ভাঙলে জল ঢোকা বন্ধ করে কার সাধ্য। সন্ধ্যেবেলায় মালিকের যাওয়ার জায়গা বেড়ে যেতে লাগল। আজ শিলিগুড়ি তো কাল হাসিমারা, সামচি থেকে মালবাজার ছুটোছুটি করতে হত আকাশলালকে। আর গভীর রাত্রে বেহুঁশ একটা শরীর কাঁধে তুলে পৌঁছে দিয়ে আসত আকাশলাল। তখন ঘর অন্ধকার থাকত। তাকে ডাকতে হত না। মেমসাহেব কোনো কথা বলত না। কাজ শেষ করে সে চুপচাপ নেমে আসত। ক্রমশ মালিকের শরীরটা পাল্টে যেতে লাগল। একটা কালো ছায়া চেহারাটাকে মুড়ে ফেলল ধীরে ধীরে। শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা ঘটল। হরি সাহার কাছে গিয়েছিল মালিক। বাড়ির বাইরে জিপ নিয়ে বসেছিল আকাশলাল রোজ যেমন বসে থাকে। রাত-বাড়লে, রাস্তায় মানুষ-চলা শেষ হলে ভেতর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে এল। তারপর মালিক বেরিয়ে এলো টলতে টলতে। তার মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল। হরি সাহা পেছন পেছন ছুটে এসে চিৎকার করল, 'প্রমাণ কর আমি তোমার টাকা মেরেছি। ফের যদি এই নিয়ে কথা বল তাহলে লাশ নামিয়ে দেব। আজ রক্ত দেখিয়ে দিলাম মাত্র।'

আকাশলালের হাত নিসপিস করছিল। কিন্তু মালিক গাড়িতে উঠে সিটে শরীর এলিয়ে দিয়ে কোনোমতে বলল, 'বাড়ি চল, বাড়ি চল।'

আকাশলালের মনে হয়েছিল হাসপাতালে যাওয়া উচিত। মালিক বিড়বিড় করে নিজের মনে উচ্চারণ করেছিল, 'সব শেষ, ফতুর হয়ে গেলাম।' তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল আকাশলালের। তার বলতে ইচ্ছে করছিল, 'কিছুই শেষ হয় না মালিক। সব শেষ মানেই কিছুর শুরু। আপনি কাঁদবেন না।' তার আগেই মালিক চিৎকার করে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছ এদিকে ?'

'হসপিটাল মালিক।'

'কোন্ শুয়োরের বাচ্চা তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছে ? ঘোরাও গাড়ি।'

'মালিক আপনার বহুৎ খুন—।'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মালিক তাকে বলেছিল গাড়ি থামাতে। হসপিটালের কাছাকাছি নির্জন রাস্তায় গাড়ি থামানো মাত্র মালিক তাকে বলল, স্টিয়ারিং থেকে সরে যেতে। ভয়ে ভয়ে সে গাড়ি থেকে নেমে পেছনে উঠে বসল। তার পরেই শুরু হলো ছুটে যাওয়া। ছুটে যাওয়া না বলে উড়ে যাওয়া বললেই ভালো হত। গাড়ি একবার রাস্তার এপাশে চলে যাচ্ছে আর একবার ওপাশে। ভয়ে

চিৎকার করে উঠল আকাশলাল। মালিককে তখন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। তার চিৎকারে কোনো কাজ হচ্ছিল না। প্রাণের ভয়ে সে সরে এলো পেছনে। মাথার ওপরের রড দুহাতে ধরে পা ঝুলিয়ে রাখল বাইরে। যে মুহূর্তে অ্যাক্সিডেণ্ট হবে সেই মুহূর্তেই যাতে লাফিয়ে পড়তে পারে এমন ভঙ্গিতে তৈরি হয়ে থাকল সে। যে রাস্তা তার আসতে লাগত একঘণ্টা মালিক চলে এল প্রায় আধা সময়ে। বাড়ির সামনে জিপের ইঞ্জিন বন্ধ করে টলতে টলতে ঢুকে গেল বাড়িতে। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছিল আকাশলালের। ওই জিপটাকেও তার মনে হচ্ছিল একটা পাগলা ঘোড়ার মতো। মালিক চলে যাওয়ার পরও সে ঝুম হয়ে বসে ছিল একই ভঙ্গিতে। চেতনা সচকিত হলো মেমসাহেবের গলায় নিজের নামটি শুনে। চমকে লাফিয়ে নেমেছিল জিপ থেকে। মেমসাহেব বলেছিলেন, অনেকক্ষণ তোমাকে ডেকেছি, ঘুমুচ্ছিলে নাকি ! গাড়ি চালিয়ে এলো কে ?'

'মালিক।' আকাশলাল এত রাত্রে মেমসাহেবকে এখানে দেখবে তা কল্পনাও করে নি। কিছু বোঝার আগেই মেমসাহেব ফিরে গেলেন বাড়িতে।

দুদিন গাড়ি বের হয় নি তারপর। বেহুঁশ ছিল মালিক জ্বরে। ডাক্তার যাওয়া আসা করেছে। ডাক পড়ে নি আকাশলালের। ঝিলের ধারে কাঠের বারান্দায় বসে সে ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করেছিল। খানা পাকাতে ইচ্ছে করে নি, ছাতু খেয়েছে একদিন। তারপর ছিপ নিয়ে বসে থেকেছে জলের ধারে। ফাৎনার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বেশ সময় কেটে যায়।

মালিকের বাড়িতে দুটো ঘটনা ঘটল। নেপালী ড্রাইভারটার চাকরি গেল। গাড়িটা বিক্রি করে দিল মালিক। কানে আসে মেমসাহেব নাকি আপত্তি করেছিলেন। বিক্রি করতে হলে জিপটা ছেড়ে দেওয়াই উচিত। মালিক শোনে নি। সকাল বেলায় মাদারিহাটের কাছে একটা সাইটে তাকে নিয়ে যেত আকাশলাল। ওটাই মালিকের শেষ কাজ। রাস্তা তৈরি হচ্ছে। কনস্ট্রাকশনের কাজও চলছে। স্নান করে ফিটফাট হয়ে যখন মালিক জিপে চাপত তখন স্টিয়ারিং হাতে খুশী হত আকাশলাল। কিন্তু সাইটে গিয়েই মদের বোতল খুলত মালিক। একটা কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল কাজের জন্যে জল তুলত। সেটা ভরে উঠল মদের বোতলে। আর রাত বাড়লে যখন কোনো হুঁশ নেই তখন প্রাণ ধড়াস ধড়াস করত আকাশলালের। চিৎকার করে তাকে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিতে বলত মালিক। টলতে টলতে গাড়িতে ইঞ্জিন চালু করলেই ওটা একটা বন্য জন্তু হয়ে যেত। দুটো পা বাইবে ঝুলিয়ে মাথার ওপরের রড ধরে রাম নাম জপ করতে শুরু করে দিত আকাশলাল। হেডলাইট অন্ধকারকে ফালা ফালা করে ছুটত দুপাশে জঙ্গল রেখে। কতটা জোরে ওই জিপ ছুটতে পারে তা বোধহয় ওর নির্মাতাও জানত না। মদ খেলে মানুষটা কেন এত গতি চায় ? এবং এই করতে গিয়েই জিপটা একরাত্রে নেমে এলো পাশের মাঠে। জঙ্গল কম, বুনো লতাপাতা ভেদ করে লাফাতে লাফাতে শেষ পর্যন্ত আটকে গেল উঁচু ঢিবিতে। রাস্তা ছাড়ার সময় লাফ দিয়ে নিচে পড়েছিল আকাশলাল। সেই অবস্থায় জিপটাকেও মাতাল বলে মনে হয়েছিল তার। ওপাশে কোনো শব্দ নেই। হেডলাইটের আলোটা শুধু ঢিবির গায়ে স্থির

হয়ে আছে। গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে পিচের রাস্তা এবং মনুষ্যহীন জঙ্গল-মহল। হুড়মুড়িয়ে ছুটেছিল সে জিপটার কাছে। তারপর উদ্বেগে চিৎকার করেছিল, 'মালিক, মালিক।'
কোনো সাড়াশব্দ নেই। মালিক স্টিয়ারিং-এ মাথা হেলিয়ে পড়ে আছে। প্রথমে ধক্ করে উঠেছিল বুক। তারপর ঠোঁট নড়তে দেখে সে চিৎকার করল, 'মালিক, আপনি ঠিক আছেন?' কয়েকবার ডাকাডাকির পর মালিক হাত বাড়াল, 'ড্রিংক! হুইস্কি!'
গলায় এমন একটা সুর ছিল যে সম্মোহিত হয়ে গেল আকাশলাল। গাড়ির খোপ থেকে বোতল বের করে হাতে দিতে গিয়ে দেখল মালিকের হাত উঠছে না। শিশুকে দুধ খাওয়ানোর মতো সে মালিককে মদ খাওয়াল। সেটা পেটে যেতে মালিক বলল, 'সাবাস।' তারপর বেহুঁশ হয়ে পড়ল। আকাশলাল যেটুকু বুঝল তাতে নিশ্চিন্ত হলো মালিকের শরীর ঠিকই আছে, রক্ত বের হচ্ছে না। জিপটারও কিছু হয় নি।
পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল যার ডাকে তাকে এখানে আশা করে নি আকাশলাল। দরজায় দাঁড়িয়ে মেমসাহেব হুকুম করল, 'তাড়াতাড়ি কর, আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে।' মেমসাহেব আর দাঁড়ায় নি। তৈরি হয়ে দুদ্দাড় করে ছুটল সে। মেমসাহেব ঝি-এর হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে এলেন একটু বাদেই। সংকুচিত হয়ে স্টিয়ারিং-এ বসতেই মেমসাহেব বললেন, 'তুমি স্নান করো না? কি বিচ্ছিরি গন্ধ!'
'জী মেমসাব, রোজ করি। শুধু এটাই হপ্তাতে একবার কাচতে হয়। কোন্ স্টেশন যাব?'
'কেন, ফালাকাটায় চল। ওখান থেকে সকালে ট্রেন পাব।'
আকাশলাল কোনো কথা বলল না। হাইওয়েতে পড়ে নিবিষ্টমনে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করতে লাগল সে। পথে কোনো কথা বলে নি মেমসাহেব। আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে নি সে। এক্তিয়ারের বাইরে যাওয়ার কোনো চেষ্টা করে নি সে কোনোদিন। আজ কেন করবে?
ফালাকাটায় নেমে মেমসাহেব একশটা টাকা দিল তাকে, 'কলকাতার টিকিট কিনে নিয়ে এসো। জিজ্ঞাসা কর ট্রেন কখন আসবে?'
খবর নিয়ে ফিরে এল আকাশলাল, 'এখন কোনো ট্রেন নেই মেমসাহেব। দুপুরের আগে কলকাতার কোনো ট্রেন নেই। টিকিট কাটবো?'
'অন্য কোন স্টেশন থেকে কলকাতার ট্রেন পাওয়া যায় না?'
'জানি না মেমসাব, তবে গিয়ে দেখতে পারি।'
'তাই চল।'
এপাশে যদি ব্রডগেজ ওপাশে ন্যারো গেজ লাইন। দুটোর মধ্যে ব্যবধান তিরিশ কিলোমিটার। আধঘণ্টায় পৌঁছে গেল তারা। ন্যারো গেজের স্টেশনের অবস্থা খুব খারাপ। লোক খুঁজে পেতে সময় লাগল। আকাশলাল ফিরে এসে জানাল, 'প্যাসেঞ্জার ট্রেনের আসার কথা বেলা বারোটায়। সেটা রোজ ছয় ঘণ্টা লেট

করে।'

মেমসাহেব খবরটা শুনে খুব হতাশ হলেন। তারপর নিজের মনেই বোধহয় বললেন, 'কিন্তু আমাকে কলকাতায় ফিরে যেতেই হবে। এখানে কোনো ভদ্রমানুষ বাস করতে পারে না।'

আকাশলাল বিনীত গলায় বলল, 'আগে থেকে সিট রিজার্ভ করে তৈরি হয়ে এলে মনে হয় ঠিক হবে মেমসাব। এইসব ট্রেনে খুব ভিড় হয়, আমি দেখেছি।'

'খুব ভিড় হয়?'

'হ্যাঁ মেমসাব। মেয়েছেলের ইজ্জত ঠিক থাকে না।'

মেমসাহেব চোখ বন্ধ করলেন। তার মাথা ঈষৎ পেছন দিকে ঝুঁকল। এই ভঙ্গী দেখে আকাশলালের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। তাকে খুব দুঃখী দুঃখী লাগছে এখন। অত ফরসা মুখে কালো ছায়া দুলছে। মেমসাহেব বললেন, 'শিলিগুড়িতে গেলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

এই ভয়টাই করছিল আকাশলাল। ওখানে গিয়ে পয়সা ফেললে বাঘের দুধও মেলে। সে হাঁউমাঁউ করে বলে উঠল, 'আপনি চলে গেলে মালিক বাঁচবে না মেমসাব।'

'সে কি এখন বেঁচে আছে? এটাকে কি বেঁচে থাকা বলে? না, আমি বাপের বাড়িতেই ফিরে যাব। ওর সঙ্গে থাকার কোনো প্রবৃত্তি নেই আমার।' মেমসাহেব মাথা নাড়লেন।

আকাশলাল বলল, 'ঠিক আছে মেমসাব।'

কথাটা শোনামাত্র মেমসাহেব তার দিকে চমকে তাকালেন। তারপর দৃঢ় গলায় প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বল?'

আকাশলাল খুব সঙ্কুচিত হলো, 'কিছু না মেমসাব। আমি কি বলতে পারি।'

'তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। চল, ফিরে চল। আমি ওকে বাঁচাবার জন্যে ফিরে যাচ্ছি না। আমি নিজে বাঁচতে যাচ্ছি। আর মাথা নিচু করে থাকব না। উঠে এসো।'

ফেরার সময় মনটা প্রসন্ন হলো আকাশলালের।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাতেই মেমসাহেব নেমে গেলেন। ব্যাগটা কাঁধে করে পৌঁছে দিতে গেল সে। এবং গিয়ে জানল মালিক বাড়িতে নেই। মেমসাহেব বাড়ি ফিরেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর থাকার জায়গা আলাদা করতে হবে, মালিকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। মালিক থাকবে নিচের তলায়, ঢোকার মুখে। এবং তারপর মেমসাহেব তাঁর নির্দেশটি জানালেন। আকাশলাল যেন মেমসাহেবের অনুমতি না নিয়ে জিপ না বের করে। এই বাড়ি এবং সম্পত্তি মেমসাহেবের নামে আইনত লেখা। অতএব এখন থেকে সব কাজ তার হুকুমেই চলবে।

এত রাগ কেন বুঝতে পারে না আকাশলাল। স্বামী ব্যবসা করত, টাকা আসত। ব্যবসা চোট খেল, টাকা গেল। স্বামী মদ ধরল। এসব তো নিত্যদিন ঘটছে। তাই নিয়ে এরকম ব্যবহার করার কি মানে আছে! জিপের চাবি চলে গেল

মেমসাহেবের কাছে। আর মালিককে খুঁজতে বের হলো আকাশলাল। এই গঞ্জ এলাকায় মালিক বড় একটা কারো সঙ্গে আড্ডা মারত না। গাড়ি ছাড়া রাস্তায় হাঁটতে তাকে দ্যাখে নি সে এই ক'বছরে।. কিছুক্ষণ পথে পথে ঘুরতেই এলাকাটা শেষ হয়ে গেল। মেমসাহেবের ঝি বলেছে মালিক নাকি পায়ে হেঁটে বেরিয়েছে। ঘণ্টাখানেক বাদে গদাধরের সঙ্গে দেখা হলো তার। 'এই যে আকাশভাই, তোমার নাকি চাকরি চলে যাচ্ছে ?'

চমকে উঠল আকাশলাল, 'তুমি কি করে জানলে ?'

'আমার মালিক বলছিল। তোমার মালিকের সব চিচিং ফাঁক হয়ে গেছে। জিপটাও বিক্রি করবে।'

'জিপের মালিক মেমসাব, মালিক নয়।'

'ও সবই সমান, হাতের এপিঠ ওপিঠ। পুরুষ মানুষই হলো মেয়েদের পরিচয়। যাচ্ছ কোথায় ?'

'মালিককে খুঁজতে।'

হ্যাক হ্যাক করে হাসল গদাধর, 'তোমার মালিক মাল খাচ্ছে।'

'কোথায় ?' অবাক হলো আকাশলাল। এই গঞ্জে মালিককে সে কখনও মদ্যপান করতে দ্যাখে নি।

কিছুটা অবিশ্বাসের গলায় সে প্রশ্ন করল, 'কার বাড়িতে ?'

'বাড়ি কেন হবে !' বলে আঙুল তুলে ইশারা করে দেখাল পাঁচু শা-এর ভাটিখানাটাকে। বিশ্বাস করতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না আকাশলালের। ওই ভাটিখানায় দিশী মদ বিক্রি করে পাঁচু। তার খদ্দের হলো যত কুলি-কামিন আর ট্রাক ড্রাইভার। দুটাকায় অনেকখানি গলায় ঢালা যায়। মালিক কেন যাবে ওখানে ?

গদাধর বলল, 'যাও যাও, গেলেই দেখা পাবে। চৌমাথার সবাই গিয়ে দেখে এসেছে। দেখার মতো দৃশ্য বটে।'

এরপরে আর অবিশ্বাসের কিছু থাকে না। আকাশলাল একটু ইতস্তত করল। তারপর পা চালাল। বড় রাস্তা ছেড়ে সরু গলি নেমে গেছে নিচে। দুপাশে পরিত্যক্ত ড্রাম আর ছেঁড়া টায়ারের স্তূপ। উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে ভেতর থেকে। পাঁচুর দোকানের সামনে বিশাল চালার নিচে ছেঁড়া মাদুরে বসে কুলি-কামিনরা মদ খায়। সেখানেই দেখতে পেল মালিককে সে। পাজামা পাঞ্জাবি পরে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। মুখটা লাল, সামনে প্রায় শেষ হওয়া বোতল পড়ে আছে। তাকে দেখতে পেয়ে কাউন্টার থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'পুরো আউট। হাঁটতে পারবে না।'

আকাশলাল উবু হয়ে বসল, 'মালিক, মালিক, আমি আকাশ।'

মালিকের কাঁধ ঝাঁকাতে মাথা টলল। এই মানুষকে নিয়ে সে বাড়িতে ফিরবে কি করে। আকাশলাল ছেড়ে দিল। তারপর কিছুটা দূরে চুপচাপ বসে রইল। এই সকালে মাল খেতে মোটেই ভিড় হয় নি। দু-একজন যারা আসছে তারা বোতল কিনে ফিরে যাচ্ছে। এখন কারো মদ খাওয়ার সময় নয়। তারা মালিককে দেখে হাসছে। কিন্তু কিছু করার নেই তার।

দুপুর যখন পার হব হব তখন মালিক চোখ খুলল। ইংরেজি ভাষায় কি সব বলল বিড়বিড় করে। তারপর পড়ে থাকা বোতলটাকে টেনে নিয়ে গলায় ঢালতেই লাফিয়ে কাছে চলে এলো আকাশলাল, 'মালিক, আর খাবেন না মালিক।'

'হু আর য়ু? কে বাবা?'

'মালিক আমি আকাশলাল।'

'আকাশলাল! আমার বউকে নিয়ে ভেগেছ?'

'নেহি মালিক, এরকম কথা উচ্চারণ করবেন না। শুনলেও পাপ।'

নিঃশব্দে হাসতে লাগল মালিক। তারপর বলল, 'পাপ? পাপ মানে কি? আমার বউকে নিয়ে তুমি ভেগেছ আকাশলাল, তোমাকে আমি মাটিতে টেনে নামাব।'

'মালিক, মেমসাব বাড়িতেই আছেন।'

'বাড়িতেই আছেন মানে? সে ফিরে এসেছে? হায় কপাল!' মালিকের চোখে মুখে ভীতি ফুটে উঠল। ও কলকাতায় চলে যায় নি?'

'নেহি মালিক।'

'ভাগ হিঁয়াসে। যা শালা তোর মেমসাহেবের পা চাট। কেউ আমাকে বিরক্ত করবি না। এখানে তোকে কে আসতে বলেছে? সেই ডাইনিটা?'

'নেহি মালিক। আমি নিজেই এসেছি। এবার আপনি ঘর চলুন।'

পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে দিল মালিক, 'ঠিক হ্যায়। খানা লিয়াও, চিকেন আউর রোটি।'

'মালিক, বাড়িতে গিয়ে খাবেন, আমার সঙ্গে চলুন।' টাকাগুলো কুড়িয়ে ফেরত দিল আকাশলাল। তারপর সাহস করে মালিকের হাত ধরল।

'তোমার ধান্দাটা কি বল তো? আমার আর পয়সাকড়ি নেই, তোমাকে মাইনে দিতে পারব না। এবার কেটে পড় এখান থেকে। জিপটাকে শালা বিক্রি করে দিলে কিছুদিন চিন্তা করতে হবে না আমাকে।' মালিক এবার আকাশলালের সাহায্যে উঠল, 'জিপ কোথায়?'

'বাড়িতে। মেমসাব চাবি নিয়ে নিয়েছে।'

'শালা হারামি। এখানে কি মুখ দেখাতে এসেছ? তুমি বিয়ে করেছ?'

'না মালিক।'

'কোনো মেয়েছেলের সঙ্গে শুয়েছ?'

'না মালিক!'

'আরে ব্যাস। এ তো দেখছি বুড়ো বয়সে ভার্জিন। হুঁ হুঁ বাবা, তোমার তো কোনো জ্ঞানই হয় নি। জন্মটাই বৃথা গেল। আমাদের আগের নেপালী ড্রাইভারটা, আরে যেটা ফিয়াট চালাত, পদম না কি যেন নাম, মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ মালিক।'

'আমার বউ-এর সঙ্গে শুতো। মাইরি বলছি। ওকে ছাড়াতে চায়নি বউ, তোমাকে তাড়াতে চেয়েছিল। তুমি বুড়ো বলে কোনো আগ্রহ নেই, তার ওপর

তোমার গায়ে বোঁটকা গন্ধ। তবে তুমি ভার্জিন জানলে কি করবে জানি না।'
মালিকের এবার হেঁচকি উঠল।
'এসব কথা বলবেন না মালিক।'
'কেন বলব না ? আমি আমার বউকে সুখ দিতে পারি না, বাচ্চা দিতে পারিনি এটা তো সত্যি কথা। কারও দোষ না। ভগবান দেয় নি তাই আমি পারি না। কিন্তু কেউ যদি পারে তাহলে দেখতে দোষ কি ? এটাই বউটা বোঝে না!'
'মালিক!' শিউরে উঠল আকাশলাল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে।
হি হি করে হেসে উঠল মালিক, 'মাল্লু, মাল্লু, মাল্লু যদ্দিন থাকবে তদ্দিন সব চাপা থাকবে, ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নেচে যাও কেউ রা কাড়বে না কিন্তু যেই তুমি ফতেবাবু হয়ে গেলে অমনি ব্যাঙাচিও লাথি মারবে। ঘা গুলো দগদগিয়ে উঠবে চাঁদ।'
মালিককে নিয়ে পথে নেমেছিল আকাশলাল। লোকজন তাকিয়ে আছে হাঁ করে। মালিকের তাতে গ্রাহ্য নেই। বাড়ির কাছাকাছি এসে মালিক মাথা নাড়ল, 'না না, ওই হারামির বাড়িতে আমি যাচ্ছি না, প্রাণ থাকতেও না।'
হতভম্ব আকাশলাল জানিয়েছিল, 'ওটা মালিক আপনারই বাড়ি।'
'সেকথাই তো বলছি। ওখানে আমি যাচ্ছি না। তোমার ওখানে চল।'
'আমার ওখানে ? মালিক আপনি কি বলছেন ?'
'ঠিক বলছি আকাশলাল। তুমি আকাশ, আমার বউকে নিয়ে ভেগেছ, তোমাকে ঠিক বলব না ? আমার বউ হলো পায়রা, বকবকম পায়রা, ওড়ে তো আকাশেই।'
আকাশলাল ভেবেছিল মালিক নেশায় আছে। সে বাধ্য হয়েছিল ঝিল-এর ধারে তাকে নিয়ে আসতে। ঘরে ঢুকে মালিক সতরঞ্চির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে বলেছিল, 'আঃ কি আরাম।' তারপর মালিক ঘুমিয়ে পড়েছিল। আকাশলাল ছুটে গিয়েছিল মালিকের বাড়িতে। মাথা নিচু করে মেমসাহেবকে জানিয়েছিল মালিক এখন কোথায় আছেন। মেমসাহেব ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিলেন, 'এখন ভাটিখানায় জুটেছে! ছি! ও মদ নিয়েই থাকুক আকাশলাল। এ বাড়িতে না ঢুকলেই আমি শান্তি পাবো। ও হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম জিপটাকে বিক্রি করে দেব। কিন্তু পরে মত বদলেছি। চলুক না চলুক একটা গাড়ি থাকা দরকার। তুমি ওই ঘরটাতেই থাকো। যখন দরকার হবে ডাকব। বাকি সময়টা ইচ্ছে করলে অন্য কাজ করতে পারো।'
আকাশলাল কথাটার অর্থ বুঝতে পারে নি সঠিকভাবে। মেমসাহেব কি তাকে ঠিকে হিসেবে রাখতে চাইছেন ? নিয়মিত মাইনেপত্র দেবে না ? তাহলে তার চলবে কি করে ? সে অবশ্য গদাধরের সঙ্গে পরামর্শ করে ট্যাক্সি ড্রাইভারি করতে পারে। কিন্তু এখন আর ওসব ধান্দা করতে একটুও ইচ্ছে করে না। সে মেমসাহেবকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করবে। তার টাকাপয়সা বেশী চাই না। খাওয়া পরা আর খইনির পয়সা হলেই চলে যাবে। আকাশলাল ফিরে এলো ঝিলের ধারের ঘরে। খিদেতে পেট জ্বলছে। সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়েনি। ঘরে এসে সে দেখতে পেল মালিক নেই। আশেপাশে কেউ নেই যাকে জিজ্ঞাসা

করবে হদিশ। আবার খ‍ুঁজতে বের হবার মতো ক্ষমতা ছিল না আকাশলালের। সে ছাতু মেখে মুখে তুলল। ব্যাপারটা নিয়ে সে খুব চিন্তিত ছিল। এক মালিক ছিল, তাকে নিয়ে নিল আর একজন। সে যেন একটা খেলনা, যে যার ইচ্ছে মতো খেলাচ্ছে। এই সময় ঝিলের জলে বেশ শব্দ করে খেলা করে গেল মাছটা। তার পর সব শান্ত।

আর তখনই আকাশলাল আবিষ্কার করল দাগটা। পায়ের অনেকটা জায়গায় কালচে ছায়া পড়েছে। আঙুল দিয়ে ঘষলেও উঠছে না। বরং মনে হচ্ছে সাড়টা কম। ভালো করে ঝিলের জলে পা ধুয়ে এলো সে। দাগটা আরও স্পষ্ট হয়েছে। আকাশলালের মন খারাপ হয়ে গেল। এটা আবার কি ধরনের অসুখ!

মালিকের বাড়ি থেকে কখনো সখনো ডাক আসে। সেদিন মেমসাহেব সেজে-গুজে বসে থাকে আগে ভাগে। এখন তার প্রতি কড়া নির্দেশ গন্ধওয়ালা জামা পরে গাড়ি চালানো চলবে না। প্রথমদিন বিকেলবেলায় মেমসাহেব পাশে বসে বলেছিলেন, 'শিলিগুড়ি।' পথে কোনো কথা হয় নি শহরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন, 'হরিসাহার কাছে চল।'

চমকে উঠেছিল আকাশলাল। যে লোকটা মালিককে মেরে শাসিয়েছিল, পথে বসিয়েছে, তার কাছে যেতে চাইছে মেমসাহেব। কিন্তু নির্দেশ মান্য করাই তার কাজ। পরিচয় দেবার পর হরি সাহার কর্মচারী তাঁকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক বাদে মেমসাহেবকে জিপে পেঁছে দিয়ে গিয়েছিল হরি সাহা। হাত কচলে বলেছিল, 'আজ আমি কৃতার্থ। মন চাইলেই চলে আসবেন, আমি সব-সময় আপনার সেবায় তৈরি আছি।'

গাড়ি চললে মেমসাহেব আনন্দিত গলায় বলেছিলেন, 'সব মানুষই খারাপ নয় আকাশ, ভালো ব্যবহার করলে শয়তানও ঈশ্বর হয়ে যায়।'

না, বাড়িতে কেউ আসতো না। কিন্তু মেমসাহেবের বাইরে যাওয়া বন্ধ হল না। আজ হরি সাহা, কাল প্রীতম সিং পরশু বদরিনারায়ণ। এরা সবাই মালিকের ব্যবসার বন্ধু। মেমসাহেব যখন ফেরেন তখন তাঁর পাশে জিপে বসে গন্ধ পায় আকাশলাল। গন্ধটাকে চেনে। সেই সঙ্গে তার মনে একটা ভয় পাক খেতে থাকে। কবে মেমসাহেব স্টিয়ারিং কেড়ে নেবেন আর তাকে বসতে হবে পেছনে পা ঝুলিয়ে। সেই অবস্থায় মেমসাহেব একদিন জড়ানো গলায় বলেছিলেন, 'তুমি খুব ভালো আকাশ, খুব ভালো। কিন্তু তুমি মদ খাও না!'

'জী মেমসাব।'

'কেন খাও না?'

'ইচ্ছে হয় না মেমসাব। তাছাড়া পয়সাও নেই।'

'ওই লোকটা তো ভিক্ষে করে মদ খায়। দিশী মাল। শুনেছি ভোরবেলায় তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায় ভাটিখানায়। তুমি ওকে পয়সা দাও আকাশলাল?'

'জী মেমসাব।'

'কেন দাও?'

'মালিক চাইলে না বলতে পারি না।'

'কে তোমার মালিক ? আমি না সে ? তুমি হাত বদল হয়ে গেছ আকাশ। মনে থাকে যেন। ওকে আর পয়সা দেবে না।'

'মালিকের বড় কষ্ট মেমসাব। ঠিকমত খান না। আমি আর কি খাওয়াতে পারি। ঝিলে মাছও নেই।'

'ঝিলে একটা পাকা মাছ আছে শুনেছি। ওটা আমার চাই।'

'ঠিক আছে মেমসাব। কিন্তু মাছটা বঁড়শি খায় না।'

'নিশ্চয়ই খাবে। খাওয়াতে হবে। তোমার মালিক যদ্দিন আমাকে বাইরে যেতে দেয় নি তদ্দিন আমি তাই জানতাম। ও নিজে পারত না বলে অন্যকে লেলিয়ে মজা দেখত। কিন্তু এখম আমি জেনে গেছি যত বড় মাছ হোক ঠিক মতন বঁড়শি ফেললে খাবেই।'

দুইজন দু'প্রান্তের। দু'প্রান্তেরই বা কি করে বলা চলে। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। মাঝখানে সে। আকাশলাল অসহায় হয়ে পড়ে। মালিকের প্রতি তার কোনো দায় নেই তবু তাকে ছাড়তে পারে না। মেমসাহেব অবশ্য তাকে মাইনে দিচ্ছে এখন কিন্তু সেটা মানতে পারে না সে। এই জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার মনটা এখন অসাড় হয়ে গেছে। কি করবে সে। চব্বিশ ঘণ্টায় খুব কম সময় মালিক হুঁশে থাকে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে সব সময় পয়সা চাইলে হ্যাঁ বলে না আকাশলাল। খারাপ লাগে তবু বলে না। আজ বিকেলে মালিক ছিল আধা হুঁশে। আর সেই সময় মাছটা ঘাই মারল। সঙ্গে সঙ্গে। সোজা হয়ে বসল মালিক, 'আকাশলাল, মাছটার ওজন কত হবে মনে হয় ?'

'জানি না মালিক।'

'বিশ কেজি তো বটেই। তার মানে পঁচিশ করে হলে পাঁচশো। মাছটাকে আমার চাই। ধরে দাও আকাশ। তোমাকে একশ দেব। চারশোতে আমার দুমাস আরামসে চলে যাবে।' চোখ বন্ধ করল মালিক আবেশে।

'ও মাছ টোপ খায় না মালিক।'

'কিসের টোপ ?'

'ময়দা, ফড়িং, কাঠালের কোমা—কোনোটাই না।'

'ব্যাঙ ফেল, জ্যান্ত ব্যাঙ, যে ব্যাঙের গা থেকে গন্ধ বের হয়।'

'ব্যাঙ খাবে মাছ ?'

'হ্যাঁ বাবা, আমি বাপের কাছে শুনেছি। বঁড়শিতে গেঁথে ব্যাঙ ফেল জলে। নড়ে চড়ে বেড়াবে, মাছ বুঝতে পারবে না ওটা গিললে বড়শি আটকাবে। ও মাছ আমার চাই আকাশলাল। তোমার একশ একদম পাকা কথা।' ফুর্তি নিয়ে বেরিয়ে গেল মালিক। যাওয়ার সময় বলে গেল ছিপ সুতো বঁড়শি আছে ও বাড়িতে। মাছের বাপের সাধ্য নেই সেই সুতো ছেঁড়ে।

একশ টাকা। রোমাঞ্চিত হলো আকাশলাল। চারশো হাতে পেলে মালিক নিশ্চয়ই আর তাকে বিরক্ত করবে না কিছুদিন। আর একশো পেলে সে একটা ছোট বিলিতি কিনে ফেলবে মালিককে লুকিয়ে। পায়ে বড় শক্ত হয়ে গেছে চামড়াটা।

গরুর ঘাড়ের মতো। পুরো বোতল দিয়ে চামড়া ভিজিয়ে রাখলে আবার আগের মতো হয়ে যাবে। হাঁটতে আজকাল কষ্ট হচ্ছে বেশ।
আকাশলাল মালিকের বাড়িতে এসে ছিপ বঁড়শি সুতো প্রার্থনা করল। মেমসাহেব হাসলেন, 'মাছটাকে ধরতে পারবে তো আকাশলাল? ভালো ফ্রাই হবে। সামনের বুধবার পার্টি আছে। আমি ফ্রাই খাওয়াবো সবাইকে।'
'মালিক মাছটাকে চায় মেমসাব।'
'কে চায়? ওর চাওয়ার কোন্ অধিকার আছে? মাছ ধরবে তুমি। তুমি আমার লোক। ও চাইবে কেন? তুমি কাকে দেবে আকাশ? ওকে না আমাকে? মদির হাসলেন মেমসাহেব। বুকের ভেতর চিতা জ্বলল আকাশলালের।
'জী মেমসাব।'
'কত বড় মাছ?'
'বিশ কেজি।'
'আঃ। ছেলে না মেয়ে?'
'জানি না মেমসাব।'
কাছে এগিয়ে এলো মেমসাহেব, 'ওর নাকের ডগা দিয়ে ঝুলিয়ে আনবে মাছটা। তারপর, আমি তো আছি আকাশলাল।'
ব্যাঙ কোথায় পাওয়া যায় যার গায়ে গন্ধ আছে। যে গন্ধ মাছকে টানবে। হ্যারিকেন হাতে রাত দুপুর পর্যন্ত ব্যাঙ খুঁজে বেড়াল আকাশলাল। কত রকমের ব্যাঙ চোখে পড়ল কিন্তু তাদের গায়ে তো গন্ধ নেই। খুঁজতে খুঁজতে চলে এল ভাটিখানার পেছনে ডোবার ধারে। সেখানে পড়ে থাকা মদ ফেলে দেয় চাকর-বাকর। বোতল ধোয় জলে। গোটা চারেক ব্যাঙ পেয়ে গেল আকাশলাল। নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দেখল গন্ধ ছাড়ছে যেন। মদ মদ মিঠে গন্ধ। মদ ধোওয়া জলে বাস করে শালারা মাতাল হয়ে বসে আছে। পা চালিয়ে ঝিলের ধারের ঘরে ফিরে এলো সে। মালিক পড়ে আছে চিৎ হয়ে। জ্ঞান নেই।
সকাল সকাল তোড়জোড় শুরু করল আকাশলাল। যেখানে জল গভীর তার কাছে পাড়ে বসে সে বঁড়শি ফেলল জলে। ব্যাঙের পেটের কাছে এমন ভাবে বড়শি ঢুকিয়েছে যাতে একটুও অস্বস্তি না হয় ওটার। বঁড়শির এক বিঘৎ ওপরে সীসে বেঁধেছে। বেশ কিছুটা দূরে ব্যাঙটা জলের তলায় খেলা করছে। ফাৎনাটা তালে তালে ঘুরছে। এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল আকাশলাল। ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল মাছটার কোনো চিহ্ন নেই। এর মধ্যে মালিক ঘুরে গেছে।
'খাচ্ছে? ঠোকরাচ্ছে?'
'না মালিক।'
'খাবে, ঠিক খাবে। আমি খদ্দের ধরতে যাচ্ছি। চারশো টাকা।'
মালিক যাওয়ার ঘণ্টা খানেক বাদে মেমসাহেব এলো। সে উঠে দাঁড়াচ্ছিল, মেমসাহেব বলল, 'আহা বসো বসো। মাছটা ধারে কাছে আছে?'
'জানি না মেমসাব।'
'ধরতে পারলেই ডাকবে। আমি জ্যান্ত দেখতে চাই ওকে। খুব সুন্দর একটা

জিনিস দেব তোমাকে। সে কোথায়, তোমার আগের মালিক?'

'খদ্দের দেখতে গেলেন মাছটার জন্যে মেমসাব।'

'দেখাচ্ছি খদ্দের। আমি তোমার মালিক মনে থাকে যেন।'

তারপর আরও দুঘণ্টা কাটল। নির্জন ঝিলের ধারে হাওয়া বইছে। চোখ টনটন করছে ফাৎনার দিকে চেয়ে চেয়ে। মাছটার কোনো পাত্তাই নেই। একবার বঁড়শি তুলে দেখেছে ব্যাঙটা দিব্যি আছে। ক্রমশ মনে হতে লাগল এই টোপ খাবে না মাছটা। কিন্তু কে অপেক্ষা করবে সন্ধে পর্যন্ত। দুটো মানুষকে দুঃখ দিতে পারবে না সে। দুটো লোকই চায় মাছটা উঠুক, সে চেষ্টা করে যাবে। কিন্তু খিদেতে এক সময় অবসন্ন বোধ করল সে। অথচ ছিপ ফেলে ওঠাও যাবে না। ঘুম পাচ্ছে তার।

বুদ্ধি করে ছিপের ডগা থেকে সুতোটাকে খুলল আকাশলাল। তাতে ফাৎনাটা একটু কাঁপল মাত্র। তারপর সুতোর প্রান্তটা বাঁধল নিজের পায়ে। যেখানকার চামড়া শক্ত এবং কালো সেখানে বাঁধনটা পড়তে তার ব্যথা লাগল না। নিশ্চিন্ত। এবার টানটান শুয়ে পড়া যাক। টোপ গিললেই সে জেগে যাবে।

চিৎ হয়ে শুয়ে সে আকাশটাকে দেখতে পেল। রোদ নেই। ঘোলা হয়ে আছে। হাওয়া বইছে। বৃষ্টি হবে নাকি? আকাশলালের ক্লান্তি শিরায় শিরায়। ঘুম এলো লাফিয়ে। সমস্ত চরাচর তখন শব্দহীন। জলে ঢেউ কাঁপছে বাতাসের খেয়ালে।

হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান লাগল শরীরে। ঘুম ভাঙা-হতভম্ব-আকাশলাল বুঝতে না বুঝতে অনেকটা নেমে এলো জলের ধারে। ঘোর কাটতে উবু হয়ে শক্ত কালো পায়ের চামড়া থেকে টানসুতোর বাঁধন খুলতে গিয়ে আবার টান এলো। সরসরিয়ে তার শরীরটা নেমে যাচ্ছিল নিচে। প্রাণপণে সে কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইল। কয়েক মুঠো ঘাস নিয়ে সে আছড়ে পড়ল জলে। ব্যাপারটা এমন আকস্মিক যে একটা চিৎকারও তার গলা থেকে বের হলো না। একটানে অনেকটা জলের তলায় গিয়ে আলগা হলো সুতোটা। বাতাসের জন্যে ছটফটিয়ে ভেসে উঠল আকাশলাল। চোখ মেলে দেখল পাড় অনেক দূর! তখনই হ্যাঁচকা টান। কাঠির মতো ডুবে গেল তার শরীর। জলের মধ্যে কেউ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিতে। চোখে ঘোলা জল। হাঁ করতে তাই ঢুকে গেল পেটে। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আকাশলাল প্রাণপণে ওপরে উঠে এলো। তার চোখে অন্ধকার।

বাতাস ঢুকল বুকে। ঝিলের মাঝখানে সে। আবার টান এল। শরীরটা পেছনে পা সামনে ছুটে যাচ্ছে। এইসময় চেতনার শেষবিন্দুতে পৌঁছে সে মাছটাকে দেখতে পেল। চোয়াল শক্ত করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রাণপণে সুতো-টাকে ছাড়াতে চাইল সে মাছটার শরীর থেকে। মাছটা ভয় পেল। জলজ শ্যাওলার মধ্যে সে ঢুকে যেতেই আকাশলালের শরীরটা এলিয়ে পড়ল। ছেঁড়া কাগজের মতো ভাসতে ভাসতে শ্যাওলার মধ্যে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল।

সীসেটা আটকে গিয়েছিল দাঁতে। মাছটার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কারণ সুগন্ধী

ব্যাঙকে কপাৎ করে গিলে ফেলতেই অতবড় একটা ওজন তাকে টানতে হবে সে ভাবে নি। মরীয়া হয়ে এতক্ষণ ঝিলময় ছুটে বেড়িয়েছে সে। কিন্তু কিছুতেই ওজনটা তাকে ছেড়ে যায় নি। শেষপর্যন্ত সে কারণটা বুঝতে পারল। ওই নেতিয়ে পড়া মানুষটার সঙ্গে সে এক সুতোয় বাঁধা পড়ে আছে। বাঁচতে হলে সুতোটাকে খুলতে হবে। কারণ ইতিমধ্যে বোঝা গেছে সুতোটাকে ছেঁড়বার সাধ্য তার নেই। কিন্তু তার সবচেয়ে বেশী অস্বস্তি হচ্ছিল অন্য কারণে তার গলার কাছে ব্যাঙটা নড়ে বেড়াচ্ছে। ওটাকে বের করে দিতে পারলে খুশী হত সে। তার এমন যন্ত্রণার সময় ব্যাঙটা নড়ছে কেন? সে ওটাকে গিলতেও পারছে না শক্ত সীসের জন্যে। মাছটার হাঁফ ধরে গিয়েছিল। এই ঝিলের সম্রাট সে। চেহারায় অহংকার আছে। সে মানুষটার শরীরের কাছে এসে লেজ দিয়ে একটা আঘাত করল। নরম কাদায় মানুষটার মুখ সামান্য নড়ল মাত্র। এবার মাছটা সুতোর অন্যপ্রান্ত দেখতে পেল। মানুষের পায়ে বাঁধা আছে। টানা-টানিতে আরও টাইট হয়ে গিয়েছে। কয়েকবার আঘাত করা সত্ত্বেও সুতো ছিঁড়লো না। সে সাঁতরাতে লাগল। শ্যাওলার বাঁধন ছেড়ে বেরিয়ে আসা মানুষের শরীরটাকে তার এবার বেশী ভারি লাগল। যতক্ষণ মানুষটার প্রাণ ছিল ততক্ষণ তাকে টেনে বেড়ানো সহজ ছিল। তবু বন্ধনমুক্তির আশায় মাছটা সমস্ত ঝিলময় ছোটাছুটি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে বিশ্রামের জন্যে একসময় শান্ত হলো। তবে এই ভেবে সে স্বস্তি পেল আর যাই হোক মানুষটার ক্ষমতা নেই তাকে আক্রমণ করার। শুধু গলার কাছে ব্যাঙটা যদি না থাকত। কতো সময় কেটেছে মাছটা জানে না। এরমধ্যে প্রয়োজনে সে ওপরে উঠেছে, বাতাস নিয়েছে। মানুষটা শুয়ে আছে তেমনি, একাকী। মাছটা তার ঘ্রাণ নিয়েছে। সুতোটা খুলে গেলে সে একবার দেখবে মানুষটাকে খুবলে। ক্রমশ ওর গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। লোভনীয় খাবার বলে মনে হচ্ছে। অনেক-দিন পেট ভরাবে মানুষটা। শুধু সুতো খুলতে যা দেরি। ক্লান্ত মাছ ঘোরের মধ্যে ছিল। হঠাৎ সে টান বোধ করল। কেউ তাকে ওপর দিকে টানছে। চকিতে প্রতিরোধ করল সে। কিন্তু ওপাশের শক্তি বেশ বেশী। বিহ্বল হয়ে সে দেখল নিচে শ্যাওলার মধ্যে শরীরটা নেই। সে টান লক্ষ্য করে ওপরে উঠে দেখল মানুষটা আরও ফেঁপে ফুলে ওপরে ভাসছে। জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের শক্তি যে এতো বেশী আবিষ্কার করে মাছটা আবার ছুটতে শুরু করল। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কারণ ওই মানুষটা কিছুতেই জলের তলায় নামতে চাইছিল না। মাছটা আরও কাহিল হয়ে পড়ছিল। শরীরটা ডুবছে আর ভাসছে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল সে। তার বোধ হলো মানুষটা তার শত্রু নয়, সে মানুষটার নয়, সর্বনাশ করেছে সুতোটা। এইটে থেকে মুক্তি পেলে ওরা দুজনেই বেঁচে যেত।

লগি দিয়ে টেনে টেনে আকাশলালের বীভৎস শরীরটাকে তীরে নিয়ে আসা হলো। যারা ভিড় করে কাণ্ডটা করছিল তারা আকাশলালের চেয়ে নিঃস্ব মানুষ। উৎসাহটা তাদেরই বেশী। মালিক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। আকাশ-

লালের বাক্সপ্যাটরা ঘেঁটে তিন হাজার টাকা পাওয়া গেছে। মাছ ধরতে গিয়ে লোকটা মরে গেল। চারশো টাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে লোকটা তিন হাজার দিয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল, 'সৎকার খরচা আমার। পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি।' তারপরেই হিসেব করে নিল দু' হাজার নয়শো পঞ্চাশে তার কতদিন চলবে। ঠিক অত টাকা নেই কাছে। কারণ মৃত্যুর খবর আর অর্থপ্রাপ্তির পর সে উদার হয়েছে। দিশীর বদলে আশি টাকা দিয়ে বিলিতি কিনে এনেছে। সেইটে হাতে নিয়ে সে উৎসাহ দিচ্ছিল এবার দেহটাকে টেনে তুলতে।

এইসময় মেমসাহেব এলেন। তাকে দেখে পথ ছেড়ে দিল অর্ধনগ্ন মানুষগুলো। মেমসাহেব আকাশলালের শরীরটার দিকে তাকিয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললেন, 'আহা বেচারা। ওর সৎকারের টাকাটা আমি দেব।'

'না আমি।' চিৎকার করে উঠল মালিক।

মেমসাহেব ঠোঁট বেঁকালেন। দেহটাকে তোলা হলো। ফুলে পচন শুরু হয়েছে। এবং তখনই একজন আবিষ্কার করল ওর পায়ে সুতো বাধা। কালো পুরু চামড়ায় সেটা চেপে বসে আছে। মেমসাহেব তিনহাত পিছিয়ে গেলেন 'ইস, কি গন্ধ।'

মালিক এগিয়ে এল, 'গন্ধ বন্ধ করে দিচ্ছি' কয়েক পেগ না হয় যাক।' তারপর বোতলের মুখ খুলে কিছুটা মদ ছড়িয়ে দিল আকাশলালের শরীরে। এবং পুরু কালো চামড়ায় পড়ল কয়েক ফোঁটা।

মেমসাহেব বললেন, 'হঠাৎ দেখছি বিলিতি ?'

মালিক বলল, 'আরও অনেক কিছু দেখবে। যেমন দেখাচ্ছ।'

'দেখাবই তো!' চাপা গলায় বলল মেমসাহেব, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

আড়চোখে মেমসাহেবের পেটের দিকে দেখে নিয়ে মালিক বলল, 'তাই ?'

এইসময় হৈচৈ উঠল। কয়েকটা হাতের টানে সুতো উঠে আসছে। এর শেষতক মাছটাকে দেখা গেল। কয়েকজন নেমে গেল জলে। মাছটা কোনো প্রতিবাদ করল না। হয়তো তার সেটা করার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। আকাশলালের মৃতদেহের পাশে সেই বিশাল মাছটাকে ফেলে দিতেই সে কয়েকবার শেষ চেষ্টা করল লাফাতে। ভিড়টা ভয় পেয়ে ছিটকে গেল দূরে। কয়েকবার আছাড় খেয়ে মাছটা আকাশলালের শরীর ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ আকাশলালের পাশ থেকে সরিয়ে আনল তাকে দুজন।

মালিক নিজের মনে বলল, 'বড্ড পাকা মাছ, বিক্রি হবে না।

মেমসাহেব মাথা নাড়ল, ফ্রাই-এর মাংস হবে না।'

মালিক বলল, 'তুমি পঁচিশ দাও আমি পঁচিশ দিচ্ছি।'

মেমসাহেব ভুরু তুলল, 'কেন ?'

'সৎকারের জন্যে। কপালে পুণ্যি হয় শুনেছি।'

'আধাআধি পুণ্যি!'

মালিক চিৎকার করে বলল, 'কেটে ফেল মাছটাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে ছুরি এসে গেল। ঝপাৎ করে কোপ পড়ল পেটে। গলগল করে রক্ত এসে পড়ল মৃত শরীরের পাশের মাটিতে। একজন সন্তর্পণে বঁড়শিটাকে বাঁচাতেই বোধহয় মাছের মুখ ফাঁক করে সীসে খুলে সুতোটাকে টেনে ছুরি চালিয়ে বঁড়শি আলগা করতেই ব্যাঙটাকে দেখা গেল। মানুষেরা হেসে উঠল। কারণ ব্যাঙটা বেঁচে আছে এখনও।

সন্তর্পণে তাকে মুক্ত করে মাটিতে ফেলে দিতেই সে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ পড়ে রইল। তারপর নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে লাফ দিতেই মৃত মাছটার শরীরে গিয়ে পড়ল। প্রবল উৎসাহে দ্বিতীয় লাফটা তাকে টেনে নিয়ে এল আকাশলালের গলা শরীরে। এবং অনেক সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এখন ব্যাঙটা পরিচিত গন্ধ পেল। ভিজে ভিজে মদের জল সে চুক করে চেটে নিল জিভে। তৃতীয় লাফে সে নেমে গেল ঝিলের জলে। মেমসাহেব চাপা গলায় বললেন, 'তোমার নোংরা জামা থেকে আকাশলালের গন্ধ বের হচ্ছে।'

মালিক হাসল, 'তোমার কথায় আঁশটে গন্ধ'। মাছটার মতো।'

মেমসাহেব চকিতে সেদিকে তাকালেন। তারপর অজান্তে একটা হাত উঠে গেল পেটে। সেখানে এক দুই এবং তৃতীয় লাফ দিয়ে কেউ শান্ত হল আপাতত।



অস্তিত্ব

ছ'টার আগে আজকাল অফিস থেকে বেরুনো যাচ্ছে না। একমাস ছুটি নেওয়ার পর তো রোজ রোজ আর বাহানা চলে না এইটেই বোঝানো যাচ্ছে না আরতিকে। কিন্তু এটাও তো ঠিক, বিকেল মরবার আগে থেকেই অস্বস্তি শুরু হয়ে যায় সুনীলের। সন্ধ্যের পর আর আরতিকে একা রাখা উচিত নয়। কদিন থেকে বাড়িতে অদ্ভুত অদ্ভুত কান্ড ঘটছে। এসব কথা কাউকে বলাও যায় না। বলতে ভালোও লাগে না।

ছুটির পর জয়েন করলে অনেকেই সহানুভূতি দেখিয়েছিল। মানুষের জীবনে কখন কার কি ভাবে শোক আসে তা কেউ বলতে পারে না। সহ্য করা ছাড়া যখন কোনো উপায় নেই তখন শক্ত হও, শান্ত না হলে সব ভেঙে পড়বে। এইসব কথা শুনতে শুনতে ক্লান্তি আসে। অবশ্য শোক, পরের শোক বিশেষ করে বেশি দিন মানুষের মনে থাকে না। এইটুকুই বাঁচোয়া। তবে নতুন কারোর সঙ্গে দেখা হলেই ওই এক রেকর্ড। প্রথম দু'তিনদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পেরেছিল সুনীল। চার্জ অফিসার নিজেই বলতেন 'চলে যান মিসেস একা আছেন।' এখন আর বলেন না। যেন এখন আরতি একা থাকলেও আর কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। বুয়া মারা গেছে ছ সপ্তাহ হয়ে গেল। ওকে ভোলার পক্ষে যেন সময়টা যথেষ্ট।

অফিস থেকে বেরিয়ে সাইকেলে চাপল সুনীল। খানিক আগে সলিল বলছিল, 'আজ ক্লাবে চল সুনীল, তাস পিটিয়ে আড্ডা মেরে আবার আগের জীবনে ফিরে এস। নর্মাল হও।' হেসেছিল সুনীল, বলেছিল, 'আমি তো এখন নর্মালই, আর কটা দিন যাক তারপর ক্লাবে আসছি।'

তাসের নেশা বড্ড বেশি বলে বাড়িতে কম অশান্তি হয় নি বিয়ের পর। আসলে পনের পয়েন্ট হাতে নিয়ে চারটে নোট্রাম খেলার মধ্যে যে উত্তেজনা তা কাউকে বোঝানো যাবে না। একটাকা পয়েন্ট ব্রিজ শেষ হতে এগারটা বেজে যেত। আরতি আর বুয়া যখন গভীর ঘুমে তখন বাড়ি ফিরতো সুনীল। চোরের মতো নিজের বাড়ির দরজায় শব্দ করতে হতো আরতির ঘুম ভাঙানোর জন্যে। ওই সময়, সারা দিনরাতের ওই একটি মাত্র সময়ে, আরতির কাছে নিজেকে একটি স্কুলপালানো বালকের মতো মনে হতো সুনীলের। জোরে প্যাডেল ঘোরাতে লাগল সুনীল। আকাশে মেঘ জমছে। এই পাহাড়ী অঞ্চলে মেঘ জমা মানে অবধারিত বৃষ্টি। শীত পড়ব পড়ব সময়ে ভিজলে আর দেখতে হবে না। মার্কেটের দিক দিয়ে রাস্তাটা ভালো। আপসেই গাড়ি গড়িয়ে যায়। কিন্তু পথটা অনেকটা ঘুরে যাওয়ার। সুনীল বাঁ দিকে ফিরল। অন্তত মিনিট দশেক বাঁচানো যাবে। মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিতে সেটা কম নয়।

বলতে গেলে বুয়াই ছিল বংশের একমাত্র ছেলে। চারবছরের ফর্সা মুখটা চোখের মণিতে সেঁটে আছে। কচি হাত পা, দুরন্ত দৌড়, দুষ্টুমির নানান ফিকির এবং আধো আধো কথায় বুদ্ধির ঝিলিক। সুনীল সাইকেল থামিয়ে রুমালে চোখ মুছল। বুয়াকে নাকি তার মতো দেখতে ছিল, অবিকল। বুয়া সামনে এলেই নিজের ছেলেবেলাটাকে দেখতে পেত সে। শৈশব দু-দুবার ত্যাগ করল তাকে। আবছা অন্ধকার নেমেছে পৃথিবীতে। সুরকি বিছানো পথে, দুপাশের আমজামরুলের পাতায় পাতায় মেঘজড়ানো আলো। যা আছে কি নেই বোঝার আগেই যেটুকু পথ পাড়ি দেওয়া যায়। সুনীল সাইকেলে চাপল। এই ছোট্ট আধাপাহাড়ী শহরে সাইকেল ছাড়া কোনো গতি নেই। বাঁ দিকে কবরখানা। জনমানবশূন্য সমাধিক্ষেত্রে অন্ধকার গড়াচ্ছে। রাত বাড়লে এই পথ সবাই এড়িয়ে চলে। পাশাপাশি দুটো। খ্রীস্টান এবং মুসলমানদের। এমন সহাবস্থান বড় একটা দেখা যায় না। তারপরেই কাঁটা ঝোপের জঙ্গল। এখন আর পৃথিবীতে আলো নেই। মাটির শরীর থেকে উঠে তারা মিশে গেছে মেঘেদের গায়ে। আকাশের দিকে মুখ তুলে চমকে গেল সুনীল। মেঘেদের রঙ কখনও বুয়ার ঘুমন্ত মুখের মতো পবিত্র হতে পারে তার জানা ছিল না। সাদা কালো নীল হলুদ সবুজ বা পরিচিত কোনো রঙ নয়, এক অলৌকিক সুখী এবং গর্বিত রঙে মাখামাখি মেঘেদের শরীর। সুনীলের মনে হতো এই মেঘ নেমে এলে সে নিশ্চিন্তে ভিজতে পারে।

রাস্তা মোলায়েম নয়। অন্ধকারে সাইকেল চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল। টর্চ সঙ্গে থাকলে অন্য কথা, এখন হ্যান্ডেল ধরতে হচ্ছে শক্ত হাতে, গতি কমেছে স্বাভাবিক নিয়মে। বাঁকটা পার হতেই শ্মশান সামনে এসে গেল। আজ বিকেলে এই শহরের কেউ মারা যায় নি। কোনো চিতা জ্বলছে না। ডোমদের ঘরে হ্যারিকেন কানা ডাইনীর মতো ঘাপটি মেরে বসে। শ্মশানের ওপাশেই নদী। এখন তেজ নেই, ভরবর্ষায় মাঝে মাঝে শ্মশানে ছোবল মারে। পাতলা আঁধারের চাদর পরে চত্বরটা নিঝুম হয়ে আছে। ডানদিকে তাকালে দূরে তাদের কোয়ার্টার্স-এর আলো চোখে ভাসে। মাঝারি প্যাডেলে বড় জোর তিনমিনিট।

এতক্ষণে বৃষ্টি ঝরার কথা, কিন্তু ঝরে নি। মেঘগুলো সব জেল্লা হারিয়ে ছাতার মতো ঝুলছে। বাড়িতে আরতি একা। গতকালও কান্নাকাটি চলেছে, আজ বেরোবার সময় হাজার বার তাড়াতাড়ি ফেরার বায়না ধরেছে। কিন্তু সুনীল সাইকেল থেকে নেমে এলো। গত একমাস সে এইদিকে আসেনি। শেষ এসেছিল এমনি সন্ধ্যেবেলায়। বুকের ভেতর একটা নরম স্পর্শ অন্ধের মতো হাতড়াচ্ছিল। সাইকেলটা কাঁঠালগাছের গায়ে হেলিয়ে রেখে সে শ্মশানে পা বাড়াল। তাকে দেখেই বোধহয় অন্ধকার থেকে একজন সামনে এসে দাঁড়াল। সুনীল চিনতে পারল, সেই বুড়ো ডোমটা। খুব ভদ্র ব্যবহার করেছিল লোকটা তখন। হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই, বাবু?'

কি চায় সুনীল। থতমত হয়ে গেল সে। লোকটা বোধহয় বুঝতে পারল

বাড এসেছিল তারপর ফাঁকা। আপনাকে দেখে ভাবলাম—।’
সুনীল মাথা নাড়ল, ‘না, আজ আমার কেউ মারা যায় নি।’
বুড়ো বলল, ‘তাহলে অন্ধকারে এখানে ঘুরবেন না বাবু। সাপ আছে!’
‘আমি একবার ওইদিকে যাব।’ হাত বাড়িয়ে কোণের জায়গাটা দেখাল সুনীল।
‘ওখানে কি আছে?’
সুনীল জবাব না দিয়ে হাঁটতে লাগল। এতক্ষণে অন্ধকার তার চোখ সইয়ে নিয়েছে। জায়গাটাকে চিনতে চেষ্টা করছিল সে। একটা স্বর্ণচাঁপার গাছ ছিল। ওই তো, ওইটে। সুনীল গাছটার পাশে এসে দাঁড়াল। এবার বাঁ দিকে খানিকটা গেলেই—। মাটি এখানে শক্ত। সুনীল হাঁটতে পারছিল না। ধীরে ধীরে সে পা মুড়ে বসল। এইখানে, ঠিক এইখানে বুয়া শুয়ে আছে। পাঁচফুট গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। বুয়ার শরীরটাকে উপুড় করে সেই গর্তে টান টান রাখা হয়েছিল। অতটা মাটির নিচে যাতে শেয়াল না পৌঁছাতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারপর আবার মাটিচাপা। দুটো পাশবালিশ পিঠের ওপর পড়লে যে বুয়া হাঁসফাঁস করতো সে এখন পাঁচ ফুট মাটির চাপ সইছে। বৃষ্টির আগে মাটির শরীর থেকে মোলায়েম তাপ ঠিকরোয়। বুয়ার শরীর যেখানে, সেখানে হাত রাখতেই সুনীল যেন সেটা টের পেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি লাগল। চেষ্টা করেও সে নিজেকে সংবরণ করতে পারছিল না।
‘বাবু।’ অদ্ভুত গলার ডাকটা শুনতে পেল সুনীল।
‘আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি বাবু। আপনার বাচ্চার একটা জিনিস আমার কাছে আছে।’
সুনীল মুখ তুলে বুড়োর দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতেই বুড়ো বলল, ‘আপনি চিন্তা করবেন না বাবু। আমি রোজ নজর করি। শেয়াল-কুকুর এখানকার মাটি খুঁড়তে সাহস পায় নি। বাচ্চা ভালো আছে এখানে।’
‘ভালো আছে?’
‘হ্যাঁ বাবু। ভগবান যাকে ভালবাসে তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যায়, দুধের দাঁত পড়বার আগেই। সারাজীবন যারা অকাম কুকাম করে তাদের শরীরেই চিতার আগুন ফোস্কা ফেলে, গলিয়ে পুড়িয়ে পবিত্র করে। শিশুরা নিষ্পাপ, তাই তাদের চিতায় ওঠানোর বিধান নেই, মাটির তলায় শুইয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়াই নিয়ম। একমাস তো হলো, এখন আর আপনার বাচ্চা আপনার নেই, সে এখন ভগবানের। মাটির সঙ্গে মিশে মাটি হতে চলেছে। তা সে ভালো থাকবে না তো আপনি আমি ভালো থাকব?’ বুড়োর মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু কন্ঠস্বর সন্ন্যাসীর মতো শোনাচ্ছিল। যে কথাটা একমাস বুকের মধ্যে আঁচড়েছে সেটাই সাহস করে বলে ফেলল সুনীল, ‘আচ্ছা, এই জায়গার মাটি খুব শিগগির খোঁড়া হবে না তো? যদি আবার কোনো বাচ্চাটাচ্চা আসে!’
বুড়ো মাথা নাড়ল। ‘না বাবু, এক বছর এই জমি ছোঁব না। যদি ভগবান

মাটি কারো নয়। আর দাঁড়াবেন না, বাড়ি যান। বৃষ্টি পড়ল বলে।

একমাস আগে নিজের কলজে সে যেন এখানে রেখে গিয়েছিল। এখন শুধু পাঁজর বয়ে বেড়ানো। সুনীল ধীরে ধীরে সাইকেলটার কাছে ফিরে গেল। বুড়ো হারিয়েছিল মাঝপথে, এবার দ্রুত পায়ে কাছে আসল। অন্ধকারেই একটা হাত বাড়িয়ে বললো, 'এটা নিয়ে যান বাবু। দেখতে তো সোনার মতো তাই সেদিন খুব লোভ হয়েছিল। পরে দেখলাম পেতলের। বিক্রি করলে কিছুই পাওয়া যাবে না। তার জিনিস আপনি রাখুন।' বিস্মিত সুনীল জিনিসটাকে ধরল। সুতোয় বাঁধা একটা মাদুলি। বুয়ার কবজির ওপর বাঁধা ছিল। ওকে যখন বুড়ো মাটিতে শোয়ায় তখন নিশ্চয়ই খুলে নিয়েছিল। একটুও রাখতে পারল না সে। অন্যায় কাজটা করার জন্যে এখন সে বুড়োর কাছে কৃতজ্ঞ হলো। পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে বুড়োর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে সাইকেলে উঠল। তারপর বড় রাস্তায় এসে বাঁ পায়ে ব্যালেন্স রেখে মাদুলিটা নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিল। সংগে সংগে বুয়ার শরীরের গন্ধ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল যেন।

বাড়ির সামনে এসে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল সুনীল। পাশাপাশি প্রতিটি বাড়িতে আলো জ্বলছে, শুধু আরতি আলো জ্বালায় নি। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। এই সন্ধ্যেবেলায় কেউ ঘর অন্ধকার করে বসে থাকে না। মাথার ঠিক মাঝখানে শীতল জলের ফোঁটা পড়তেই সুনীল তড়িঘড়ি বারান্দায় উঠে এলো। চমৎকার টাইমিং, যেন তার বারান্দায় ওঠা পর্যন্ত বৃষ্টি অপেক্ষা করছিল। সংগে সংগে শীতল হাওয়া গায়ে কাঁটা তুলল সুনীলের। সে একটু জোরেই বেলের বোতাম টিপল। কেবলমে কোম্পানির কোয়ার্টার্সগুলোয় সবরকম আধুনিক সুবিধে আছে শুধু জায়গাটাই যা কম। স্বামী স্ত্রী এবং একটি বাচ্চার জন্যে মেপে মেপে তৈরি। ওপর তলার কথা অবশ্য আলাদা কিন্তু তাদের কাছে যেন আত্মীয়বন্ধু এসে থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে বিরক্ত হলেও আরতি বলত, 'এই ভালো! বড় কোয়ার্টার্স পেলে আমাকেই তো ঝাঁট দেওয়া ঘর মোছা করতে হবে।' সেটাও ঠিক। এখানে কাজের লোক পাওয়া ঈশ্বর পাওয়ার সমান।

আরতি এখনও দরজা খুলছে না। সুনীল আবার বোতামে চাপ দিল। শব্দটা নিজের কানেই কর্কশ শোনাল এবার। বিরক্ত এবং উদ্বিগ্ন সুনীল পাশের জানলাটার গ্রিলে শব্দ করার পর দরজাটা খুলল। অন্ধকার ঘরে আরতি দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছেনা। দাঁড়াবার ভঙ্গিটিও স্বাভাবিক নয়। সুনীলের সমস্ত বিরক্তি উধাও, একটু সন্ত্রস্ত গলায় সে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে?'

আরতি তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'ও, তুমি! এত তাড়াতাড়ি এলে!'

সুনীল অভিমানটাকে আহত করতে চাইল না, 'না. মানে, ছটার আগে অফিস থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না। তাও তো সর্টকাট পথে এলাম। নইলে বৃষ্টিতে ভিজতে হতো। রাগ করো না, আমি বুঝতে পারছি!'

''রাগ করবো কেন ? তুমি তো আগে অনেক রাত্রে ফিরতে, সেই বুয়া ঘুমিয়ে পড়ার পর। এখন তেমন ফিরতে পারো না ? তুমি তো তাস খেলতে যেতেও পার। আমি রাগ করে বলছি না, বিশ্বাস কর।' সামান্য সরে আরতি যেভাবে কথাগুলো বলল তাতে সুনীলের মনে হলো সে একটু আগে ভুল বুঝেছিল। আজ সকালের আরতি আর এই আরতি ঠিক এক মানুষ নয়। ব্যাপারটা নিয়ে এখনই জলঘোলা করা উচিত হবে না। সে সাইকেলটা ঘরে ঢুকিয়ে আলো জ্বালতে যেতেই আরতির মুখ থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ বের হলো। সুনীল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হলো ?' আরতির গলায় মিনতি, "এখন আলো না জ্বাললেই নয় ?''

'আলো জ্বালবো না ? কেন ?' বলতে বলতে সুইচ টিপে দিতেই ঘরটা ঝলকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করল আরতি। এবং তখন সুনীল তাকে স্পষ্ট দেখল। আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছে। চুল খোলা। সমস্ত শরীরে একটা রুক্ষ ভাব। বোঝা যায় সে অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর আরতি কিছুই করে নি। ব্যাপারটা সুনীলের কাছে খুব রহস্যময় মনে হচ্ছিল। সে ডান হাতটা আরতির কাঁধে আলতো করে রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে সোনা ?'

আরতি মাথা নাড়ল, কিছু না। কিন্তু তার চোখ মুখ অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। দরজাটা বন্ধ করে সুনীল দুহাতে ওকে টেনে নিল কাছে, 'তুমি আজ স্নান, খাওয়া করো নি ?' আরতি প্রথমে জবাব দিল না। সুনীল পীড়াপীড়ি করতে মাথা নাড়ল। এতক্ষণে ওর মুখ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। আরতি বলল, 'কিছু করতে ভালো লাগছিল না। চুপচাপ শুয়েছিলাম। তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি চা করছি।'

বাইরে এখন প্রবল বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি হলে এখানে জল জমে না কিন্তু চট করে তাপ নেমে যায়। সুনীল চাদর জড়িয়ে খবরের কাগজটা টেবিল থেকে তুলল। এখানে কাগজ আসে দুপুরে। আজ এটায় একদম হাত দেয়নি আরতি। অথচ ওর আচরণ তো ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। আরতি এখন কিচেনে। গ্যাস জ্বলার শব্দ আসছে। আজ ওর আচরণ এমন হলো কেন ? এই ঘরে একটা আলনা আছে। বুয়ার ব্যবহৃত জামাপ্যান্ট ওখানে থাকত। বউদি এসে সেসব সরিয়ে একটা স্যুটকেসে ভরে রেখে গিয়েছে। আজ সেগুলোকে আবার আলনায় দেখতে পেল সুনীল। নিপাট ভাঁজ করা নয়। এলোমেলো হাতে রেখে দেওয়া, বুয়া থাকলে যেমনটি থাকত। সুনীলের কপালে ভাঁজ পড়ল। সে কাঁচের আলমারিটার দিকে তাকাল। বুয়ার খেলনাগুলো ওখানে সাজানো ছিল। এখন তার অনেকগুলোই সেখানে নেই। চোখ বোলাতে বোলাতে খাটের ওপর কয়েকটাকে আবিষ্কার করল সে। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। যেন বুয়া এতক্ষণ এই ঘরে ছিল, খেলতে খেলতে ওঘরে গিয়েছে।

সুনীল শক্ত হলো। এইভাবে বুয়ার স্মৃতিগুলোকে টেনে আনল কেন আরতি ? এই একমাস সে অনেক বুঝিয়েছে। মনে হয়েছিল ও বেশ শান্ত হয়ে গিয়েছে। কষ্টটাকে গিলতে পারছে। নিঃশব্দে কিচেনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে

পড়ল। গ্যাস জ্বলছে। কেটলির মুখ থেকে সোঁ সোঁ ধোঁয়া বের হচ্ছে। আরাত বসে আছে পাথরের মতো, হাঁটুতে চিবুক রেখে। সুনীলের প্রথমবারের ডাক যেন তার কানেই গেল না। দ্বিতীয়বারে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে বসল। এবং তখনই আরতির মুখে প্রচণ্ড বিরক্তি ফুটে এলো। সেই অবস্থায় চাপা গলায় সে যেন ধমকে উঠল, 'এখানে কেন?' এখানে কি দরকার?'

'কি করছ তুমি? গ্যাস শেষ হয়ে যাচ্ছে তো।' সুনীল কি বলবে বুঝতে পারছিল না। আরতি জবাব না দিয়ে উঠে নব ঘুরিয়ে গ্যাস নিভিয়ে মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'ঘরে গিয়ে বসো, চা দিচ্ছি।' এই আরতির সঙ্গে একটু আগের আরতির কোনো মিল নেই। কথা না বাড়িয়ে বাইরের ঘরে চলে এলো সুনীল। আজ নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে নইলে আরতির আচরণ এমন হতো না। বুয়া মারা যাওয়ার পর তিনদিন আরতি প্রায়ই অচেতন হয়ে থাকত। তারপর কান্নাকাটি, না খাওয়া, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পালা চলেছিল। দাদা-বউদি চলে যাওয়ার আগে সে সুস্থ হয়ে উঠছিল। কান্না থেমেছিল, কাজকর্ম শুরু করেছিল কিন্তু ওই সময়ে যে স্বাভাবিকতা আশা করা যায় তাই করছিল সে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিংবা তারও চেয়ে বেশি একটা অবলম্বন হয়ে সুনীল তার আস্থা ফিরিয়ে আনছিল। গত চার পাঁচদিনে ব্যাপারটা অন্যদিকে বাঁক নিতে শুরু করল। সুনীল যখন বাড়িতে থাকে তখন নাকি কিছুই হয় না। সুনীল বেরিয়ে গেলেই অকারণে বাথরুমে মগ পড়ে যাওয়ার আওয়াজ হয়। পাশের ঘরে বুয়ার বল অকারণে ড্রপ খায়। ভেজা তোয়ালেটা, যা একটু আগে রেখে আসা হয়েছিল চৌবাচ্চার পাশে সে চলে আসে বালতির মধ্যে। এবং গতকাল নাকি কিচেনের আলোটা অকারণে জ্বলে উঠেছিল। কাল রাত্রেও সুনীল আরতিকে বুঝিয়েছে এসবই মনের ভ্রান্তি। একা থাকার কারণে শোক থেকে শূন্যতাবোধে এমন ভেবে নেওয়া ছাড়া কিছু নয়। কাল রাত্রেও আরতির ব্যবহারে অসঙ্গতি ছিল না।

খবরের কাগজটা খুলতে যেতেই দরজায় শব্দ হলো। এই বৃষ্টিতে কোনো মানুষের আসার কথা নয়। সুনীল দরজা খুলে অবাক হলো। অবনী দাঁড়িয়ে আছে বর্ষাতি গায়ে। অবনী আর সে একই অফিসে কাজ করে তবে বিল্ডিং অন্য। একসময় ছেলেটিকে তার ভালো লাগত। বিয়ে থা করেনি সংসারের চাপে, এখানে একা থাকে। কিন্তু মুখার্জীর স্ত্রীর সঙ্গে ওর মাখামাখি নিয়ে গল্প চালু হওয়ার পর থেকেই সুনীল ওকে এড়িয়ে চলছিল। অবশ্য এখন অবনীর কাছে কৃতজ্ঞ সে, বুয়ার মারা যাওয়ার আগে পরে প্রচুর করেছে অবনী। সুনীল বলল, 'কি ব্যাপার? এই বৃষ্টির মধ্যে! ভেতরে এসো।'

'কখন এলেন?' অবনী বর্ষাতি খুলে দরজার পাশে রাখল।

'একটু আগে। তা কি মনে করে?' সরাসরি না বলে সুনীল বোঝাতে চাইল এইসময় ওর আসাটা সে পছন্দ করছে না। কিন্তু ব্যাপারটা গায়েই মাখল না অবনী, সকালে মন ভালো ছিল না বলে অফিসে গেলাম না। সারাদিন বাড়িতে বসে এত বিরক্ত হলাম যে চলে এলাম। বউদি কোথায়? জম্পেশ করে চা বলুন

তো।'
'আরতি আজ ভালো নেই। মানে এখনও রিঅ্যাকশন কাটেনি। বুঝতেই পারছ।'
'স্বাভাবিক। তবে আপনার উচিত হেল্প করা। সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে পারেন, কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। বাড়িতে বসে থাকলে তো মন ভালো হবে না। ও হ্যাঁ, বুয়ার ব্যাপারটা আমি কোলকাতায় এক ডাক্তার বন্ধুকে লিখছিলাম। সে বলেছে যতই হোক চিকিৎসায় একটা ভুল নিশ্চয়ই হয়েছিল। ছেলেটা স্বাভাবিক ছিল, ভোরবেলায় টয়লেটে গিয়ে আর উঠতে পারল না, হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল এবং শেষে ব্রেন-অ্যাটাকড হলো—ওর কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। এরকম কেস এর আগে ঘটে নি।' সুনীলের দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল অবনী। ইচ্ছে না থাকলেও সিগারেটটা ধরাল সুনীল। বুয়ার ব্যাপারটা নিয়ে অবনী এখনও ভাবছে দেখে তার মন ভালো হলো। মিসেস মুখার্জীর সঙ্গে প্রেম করা নিশ্চয়ই অন্যায় তাই বলে মানুষটার সব কাজ বেঠিক হবে কেন? সুনীল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আর ওসব কথা ভেবে কি লাভ। আমাদের কপালে যা ছিল তাই হলো।'
'বউদি কি খুব কান্নাকাটি করছে? রি-অ্যাকশন কাটে নি বললেন।'
'না ঠিক কান্নাকাটি নয়। ব্যাপারটা তোমাকে বোঝানো যাবে না অবনী।'
'সুনীলদা, যদি অপরাধ না নেন তাহলে একটা কথা বলি।'
'বল।'
'ঠিক এইসময় কথাটা শোভনীয় নয় হয়তো, কিন্তু বউদির জন্যেই, মানে, ওর আর একটি সন্তান দরকার।'
'পাগল।' এছাড়া কিছুই বলতে পারল না সুনীল। বুয়া চলে যাওয়ার পর এই ব্যাপারটাই মাথায় আসে নি। পাশাপাশি শুলেও শরীর কিংবা মনে যৌন-চিন্তা বারেকের জন্যে উঁকি দেয় নি। সবকিছুর ওপর মৃত বুয়া যেন পাথর চাপিয়ে গেছে। এইসময় একথা বলা মানে নিজেকে একটি লম্পট কামুক ছাড়া কল্পনা করা যায় না। আর এই চিন্তাটাই অবনীর মাথায় এল। অবনী উঠে দাঁড়াল, 'বউদি কোথায়?'
'কিচেনে।' সুনীল ঠিক কি বলা উচিত ঠাওর করতে পারছিল না। বুয়ার মারা যাওয়ার পর এই ছেলেটার কাছে বাড়ির অন্দরমহল বলে কিছু ছিল না। আজ কি করে সে অপছন্দের কথা বলবে। অবনী ততক্ষণে চলে গেছে ভেতরে। চিৎকার করে সে ডাকল, 'বউদি, বৃষ্টি মাথায় করে চা খেতে এলাম।'
সুনীল উঠল না। অবনী যা উপকার করেছে তা তো ভোলার নয়। হাস-পাতালে ছোটাছুটি থেকে শুরু করে বুয়ার শরীরটা শ্মশানে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সবসময় পাশে পাশে ছিল। প্রবাসে কজন এমন করে। ভেতরে কি কথা হচ্ছে তা সে এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে না। এই মুহূর্তে আরতির মেজাজও নেই খোশ গল্প করার। খবরের কাগজে চোখ রাখল সুনীল। কিন্তু এতক্ষণ তো অবনীর ফিরে আসা উচিত। বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে না। তার মানে এখনই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে আর ঠাণ্ডাটা বাড়বে। এইসময় হাসির

আওয়াজ কানে এল। অবনী একা নয়, আরতির গলাও যেন তাতে যোগ দিয়েছে। এই প্রথম, বুয়া যাওয়ার পরে এই প্রথম আরতির গলায় হাসি বাজল। কি এমন কথা যা আরতিকে হাসাতে পারল! সুনীলের খুব ইচ্ছে করছিল ওদের সঙ্গ নিতে। কিন্তু তখনই অবনী ফিরে এলো, 'বউদি ইজ অলরাইট। আপনি মিছিমিছি ভাবছিলেন।' অবনীর পেছন পেছন এলো আরতি, হাতে চায়ের দুটো কাপ আর বিস্কুট প্লেটের কোণে। সুনীল দেখল ওর মুখে সেই বিরক্তির মেঘটা আর লেগে নেই। সকালবেলার আরতি কিংবা তার চেয়েও উজ্জ্বল এক রমণী তার সামনে দাঁড়িয়ে।

সুনীল কাপটা নেওয়ামাত্র আরতি স্বাভাবিক গলায় বলল, 'অবনী ঠাকুরপো বলছিল, বৃষ্টি থেমেছে, একটু বেড়িয়ে আসার জন্যে।'

'তুমি যাও না, সারাদিন খাটাখাটনি করেছ, ঠান্ডা হাওয়া ভালো লাগবে।'

'তুমি যাবে?' সুনীল স্পষ্ট চোখে তাকাল।

'আমার খুব মাথা ধরেছে। আমি একটু একা থাকি লক্ষ্মীটি। তুমি যাও। রাত হলে আমি কিছু বলব না। যাও না।'

আরতির কথা শেষ হওয়ামাত্র অবনী চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবাস। আপনি কি ভাগ্য-বান দাদা, সবাই বলে দেরি হলে বউ খিচখিচ করে। আর আপনার বেলায় ঢালাও লাইসেন্স পাচ্ছেন। মুখার্জীদাকে বলতে হবে।'

'আমার এখন কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, অতএব স্বাধীনতা পেয়ে কোনো লাভ হলো না।'

'উহুঁ, তা শুনছি না। চেহারাটা কি হয়েছে দেখেছ। তোমার বাড়িতে বসে থাকা চলবে না। নিয়ে যান তো ওকে অবনী ঠাকুরপো। যাও না, ক্লাবে গিয়ে তাস খেলে এসো। পুরুষমানুষ সবসময় মুখের সামনে বসে থাকলে ভালো লাগে না। ওঠো।'

ব্যাপারটা ক্রমশ জেদাজেদির পর্যায়ে চলে গেল। অবনী চুপচাপ মজা দেখছিল। এই আরতিকে চেনে না সুনীল। আজ পর্যন্ত কখনই সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরলে আর বেরুতে দেয় নি যে সে আজ জোর করছে ক্লাবে যাওয়ার জন্যে। শেষ পর্যন্ত উঠল সুনীল। যদিও বৃষ্টি হবে না তবু ছাতাটা সঙ্গে নিল। ছাতা আর টর্চ। দরজা বন্ধ করল আরতি। সেইসময় তার মুখ বেশ সুখী দেখাচ্ছিল।

''শী ইজ অল রাইট সুনীলদা। আপনার চিন্তা করার কিছু নেই।' ঠান্ডা হাওয়ায় ঘোলাটে আকাশের নিচে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অবনী বলল। দুপাশে কোয়ার্টার্সের জানলা দরজা এখন হয়তো বৃষ্টির কারণেই বন্ধ। সুনীল মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ক্লাবে যাচ্ছ?'

'না। আমি এই মোড় থেকে বাঁ দিকে বাঁক নেব।'

'ওদিকে কোথায় যাবে?'

'নায়ারদের বাড়িতে। মিস্টার নায়ার জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে দেশে গিয়েছেন। মিসেস নায়ার একা আছেন, দেখে আসি কোনো প্রয়োজন আছে কিনা। কখনও

কোনো দরকার হলে দ্বিধা করবেন না সুনীলদা।' অবনী বাঁ দিকে চলে গেলে কিছুটা এগিয়ে থামল সুনীল। এদিকটা এখনই নির্জন হয়ে পড়েছে। অবনী ছোকরার ধান্দা কি? নায়ারদের ছেলেমেয়ে নেই। মিসেস নায়ারকে দেখে সবারই চোখ টাটায়, আরতিরও। বড্ড বেশি উদ্ধত শরীর। সেই মহিলা একা আছেন রাত্রে সেখানে যাওয়ার কি দরকার? মনে মনে একটু ঈর্ষা অনুভব করল যেন সুনীল। কিচেনে গিয়ে অবনী আরতির সঙ্গে কি কথা বলেছিল যাতে হাসি এল? আর তারপরেই আরতি ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাকে বাড়ি থেকে বের করতে। ব্যাপারটা ভাবতেই খারাপ লাগছিল কিন্তু এড়িয়ে যেতেও পারছিল না সে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুনীল আবার বাড়ির পথ ধরল। মাঝ রাস্তায় তার শরীর খারাপ করতেই পারে। ল্যাট্রিনে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। যে কোনো একটা কৈফিয়ৎ দিতে পারে সে নিজের বাড়িতে ফিরে আসার জন্যে।

এখনও আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক। অসহায় ভঙ্গিতে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল সুনীল। সবকটা জানলা দরজা বন্ধ। ভেতরে একটুও আলো জ্বলছে না। ঠিক অফিস থেকে ফেরার পর যেমনটি ছিল। এইটে বড় অস্বাভাবিক। এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই আরতি ঘুমিয়ে পড়তে পারে না। যে সন্দেহটা একটু আগে মনে ফণা তুলেছিল তা হাসিল করার মতো পায় নি কেউ। তাহলে? বারান্দায় উঠে দরজা খুলতে বলার ইচ্ছেটা সামলালো সে। তারপর নিঃশব্দে বাড়ির পেছন দিকে চলে এলো। এদিক দিয়ে জমাদার আসা যাওয়া করে। ভেতরে ঢোকা যায় না, দরজা বন্ধ থাকলে তবে শোওয়ার ঘরের কাছে চলে আসা যায়।

প্রায় ভূতের মতো নিজের শোওয়ার ঘরের জানলার পাশে চলে এলো সুনীল। জানলাটা খোলা। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ভেতরটার কিছু দেখা যাচ্ছে না। সুনীল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক সেইসময় আরতির গলা শুনতে পেল সে। আদুরে নরম এবং নিচু গলায় আরতি বলল, 'কি দুষ্টুমি হচ্ছে? আমি কিন্তু খুব রাগ করব বলে দিলাম।'

শক্ত হয়ে গেল সুনীল। তার মাথার ভেতর যেন অনেকগুলো দুরমুশ ওঠানামা শুরু করল। এ কার সঙ্গে কথা বলছে আরতি। অবনী? সে কখন ফিরে এলো? আরতি চাপা গলায় বলল, 'কি এখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে?' সচকিত হলো সুনীল। প্রশ্নটা কি তাকেই? সে এখানে চোরের মতো এসে দাঁড়িয়েছে তা জেনেছে কি আরতি? জেনেই ডাকছে? এই কণ্ঠস্বর কতকাল শোনেনি সুনীল। এমন আদুরে, ভালবাসার গলা। ধরা দেওয়া যাক, লুকো-চুরি খেলার ইচ্ছে ছিল তাই এইপথে এসেছে এমন কৈফিয়ৎ দেওয়া যাবে। আর তখনই আরতি বলল, 'না সোনা, বাড়িতে এখন কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি। সে গেছে ক্লাবে। ফিরতে অনেক রাত। আমি জানি তো, ও অফিস থেকে এসে আলো জ্বালতে তুমি রাগ করেছ। আমার কি দোষ বল। আচ্ছা, আচ্ছা, ও যাতে খুব কম থাকে এই বাড়িতে আমি তার চেষ্টা করব।'

প্রচণ্ড একটা ক্রোধ শরীরে পাক খেয়ে গেল। মাত্র মাসখানেক আগে একমাত্র

সন্তান চলে গিয়েছে অথচ আরতি এর মধ্যেই এমন দ্বিচারিণী হয়ে পড়বে কল্পনাও করা যায় না। বিয়ের পর এতকাল সে সন্দেহই করে নি। নিশ্চয়ই অবনী। সে ছাড়া কে আর এখানে পরের বউ-এর সঙ্গে প্রেম করবে। কিচেনে হাসির কারণটা ধরা গেল। আজ অফিসে যায় নি ছোকরা। হয়তো সুনীল যখন বাড়ি ফিরেছিল তখন ও এই বাড়িতেই ছিল। পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে ভালোমানুষ সেজে আবার সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। আর তাই নিয়ে কিচেনে হাসাহাসি করছে ওরা। এখনই টর্চ জ্বাললে ধরা পড়ে যাবে দুজনে। কিন্তু যদি টর্চের আওতায় না থাকে অবনী। যদি দরজা খোলার আগেই পালিয়ে যায়। আর তখনই আরতির গলায় একটা অদ্ভুত আওয়াজ বের হলো। খুব আবেগে, প্রাণের মানুষকে জড়িয়ে ধরলে মেয়েদের গলায় এমন শব্দ বাজে। সেই সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা শুরু হলো, 'আমার সোনা, সোনামণি, আমার লক্ষ্মীটি, আমাকে ছেড়ে যেও না, আমি মরে যাব—।'

সুনীল আর দাঁড়াতে পারল না। দৌড়ে পেছনের দরজা অতিক্রম করার আগে শেকলটা তুলে দিল। সামনের দরজায় ধাক্কা দিলে এ পথে আর পালাতে পারবে না কেউ। তারপর সামনে গিয়ে একটানা বেল বাজাতে লাগল। তাতেও শান্ত না হওয়ায় ব্যস্ত হাতে কড়া নাড়তে লাগল সুনীল। ভেতরে কোনো শব্দ নেই। যেন হঠাৎ আক্রমণে সব থমকে গিয়েছে। সুনীল চিৎকার করল, 'দরজা খোল।'

ওপাশের কোয়ার্টার্সের জানলা খুলে গেল, 'কি হয়েছে সুনীলবাবু?' গেঞ্জি গায়ে হারাধনবাবু উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন ছুঁড়লেন।

সাক্ষী পাওয়া গেল, সাক্ষী। সুনীল বলল, 'কি ব্যাপার বুঝছি না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'এত জোরে শব্দ করছেন যে ঘুম ভাঙবে না? আপনি এই ফিরলেন?'

সুনীল উত্তর না দিয়ে আবার বেল টিপলো। এবারও কোনো আওয়াজ নেই। হারাধনবাবু চলে এলেন বাড়ি থেকে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। ঠান্ডাতেও গায়ে ঘাম জমল সুনীলের। ওরা ভয় পেয়ে বের হচ্ছে না। এত মানুষের সামনে যদি আরতির সঙ্গে কোনো পুরুষ বেরিয়ে আসে তাহলে সারা শহরে ঢি ঢি পড়ে যাবে। নিজের হাতে কোনো শাস্তি সে দিতে পারবে না। খুব অবিবেচকের মতো কাজ হয়ে গিয়েছে। এখন তার চেয়ে জনতার উৎসাহ বেশি। সমানে দরজা জানলা পেটানো চলছে। অথচ ভেতর থেকে কোনো সাড়া নেই। এতক্ষণ সুনীলের মনে উদ্বেগ জন্মেছে, তার ইচ্ছে করছিল আরতিকে সাহায্য করতে। এই কৌতূহলী মানুষগুলোর চোখের সামনে থেকে ওদের আড়ালে নিয়ে যেত। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কিছুই করার নেই। আশেপাশের সব কোয়ার্টার্স থেকে মানুষ নেমে এসে ভিড়টাকে বাড়িয়েছে। এত রাত্রে একটা নতুন মজা পেয়ে গেছে সবাই।

হারাধনবাবু সুনীলের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'আপনার জমাদার আসার দরজাটা কি ভেতর থেকে বন্ধ?'

ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল সুনীল। হারাধনবাবু বললেন, 'কেসটা বেশ ভালো মনে

হচ্ছে না। ঝগড়াঝাঁটি করেন নি তো ?'
'না না।' সুনীল প্রতিবাদ করল।
'ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে সুইসাইডের চান্স। থানায় খবর দেব ?'
হারাধনবাবুর কথা শুনে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। আরতি সুইসাইড করেছে ? আরতি নেই ? বুয়ার পরে আরতি চলে গেলে সে কি করবে ? এবং এই মুহূর্তে সুনীল আবিষ্কার করল বুয়া যদি কলজে তো আরতি তার পাঁজর। ধরা পড়বার লজ্জায় যদি আরতি আত্মহত্যা করে তাহলে সে কি নিয়ে থাকবে ? সুনীল বসে পড়ল। এবং তখনই কানে অবনীর গলা বাজল, 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে ? আরে সুনীলদা, আপনি এখানে বসে আছেন কেন ?'
সুনীলের বুক ধক্ করে উঠল। অবনী এখানে এলো কোথা থেকে ? তার তো ওই বন্ধ ঘরের ভেতরে থাকার কথা। কেউ একজন ঘটনাটা জানাল। অবনী সুনীলের কাঁধ ধরে বলল, 'আপনি তো ক্লাবে গিয়েছিলেন। এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কি করে ?'
প্রশ্নটা আচমকা সুনীলকে উত্তপ্ত করল, 'আমার বাড়িতে আমি কখন আসব সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে ?'
হকচকিয়ে গেল অবনী, 'না না তা বলছি না। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে লাগছে। আপনি ক্লাবে গেলেন, বউদি বেশ ভালোই ছিলেন বেরুবার সময় এর মধ্যে কি হলো তাই ধরতে পারছি না। আপনি এসে বউদির সঙ্গে কথা বলেছেন ?'
মাথা নাড়ল সুনীল। অবনী কি সন্দেহ করছে ? তার ক্লাবে যাওয়ার বদলে বাড়ি ফিরে আসার পেছনে জোরালো যুক্তি নেই। কিন্তু একথা ঠিক অবনী তার আগে ফিরে আসে নি আরতির কাছে, খামোকা সে সন্দেহ করেছিল। কিন্তু অত ভালবাসার কথা আরতি যে কাউকে বলছিল তা তো সে নিজের কানেই শুনেছে। তাহলে কি তার অজান্তে এমন কেউ আছে যে এই বাড়িতে আসা যাওয়া করে। সুনীলের হঠাৎ মনে হলো অবনী খুব আপন মানুষ। সে কাতর গলায় অবনীকে বলল, 'পেটটা ভালো লাগছিল না বলে চলে এলাম। কি গেরো বল দেখি। আমি তো কিছুই ভাবতে পারছি না।'
অবনী বলল, 'আমি দেখছি সুনীলদা আপনি কিছু চিন্তা করবেন না।'
কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে অবনী পেছনদিকে চলে গেল। প্রায় মিনিট পাঁচেক বাদে চিৎকার শোনা গেল, খুলেছে খুলেছে। সুনীল ছুটে গেল পেছনে। অবনী কোনোরকমে জমাদারের দরজাটা ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু তার পেছন পেছন সবাই ভেতরে ঢুকতে চাইছে। প্রত্যেকেই একটা নাটক দেখতে চায়। অবনী চীৎকার করল, 'কেউ এগোবেন না। সবাই বাইরে থাকুন। সুনীলদা কোথায় ? এই যে সুনীলদা আপনি আসুন। যার বাড়ি তাকে আসতে দিন।' বুক ঢিপ ঢিপ, পায়ে সাড় নেই। সুনীল কোনোমতে দরজায় চলে এলো। হারাধনবাবু তার সঙ্গে সেঁটে আছেন। ওরা তিনজন ভেতরে ঢুকল। এটা ল্যাট্রিন। তারপর টয়লেট। তারপরে ডাইনিং স্পেস। হাতড়ে হাতড়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল অবনী। তারপর চাপা গলায় ডাকল, 'বউদি!' কোনো

সাড়া এলো না। হারাধনবাবু বললেন, 'এসব ক্ষেত্রে বাথরুম আর শোওয়ার ঘর হলো ডেঞ্জারাস জায়গা।'

শোওয়ার ঘরে খাটের উপর আরতি পাশ ফিরে শুয়ে আছে। তার চোখ স্থির, হাতের মুঠো বন্ধ। খাটময় বুয়ার খেলনা ছড়ানো। অবনী চাপা গলায় ডাকল, বউদি। আরতির শরীর একটুও নড়ল না। খপ করে আরতির কব্জি ধরে পালস্ পেতে চাইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'অলরাইট, সুনীলদা স্মেলিং সল্ট আছে?' সুনীল বিস্ফারিত চোখে এতক্ষণ আরতিকে দেখছিল, অলরাইট কথাটা কানে যাওয়ামাত্র হৃৎপিণ্ড শান্ত হলো। কি অসহায় বাচ্চা মেয়ের মতো লাগছে আরতিকে। সে মাথা নাড়ল, 'না নেই। ব্লটিং পেপারে হয় শুনেছি।' অবনী বলল, 'তাই দিন।'

বই-এর আলমারীর ওপর থেকে ব্লটিং পেপার এনে দিতে অবনী ধরিয়েই নিভিয়ে ফেলল। তারপর ধোঁয়াটা আরতির নাকের কাছে পেঁছে দিল। মিনিট দুয়েক চেষ্টার পর আরতির শরীর কাঁপল, ধীরে ধীরে চোখের পাতা খুলল। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছিল সে কিছুই দেখছে না। সুনীল কিছু বলার আগেই অবনী ডাকল, 'বউদি, কি হয়েছিল আপনার?'

'কে?' আরতির ঠোঁটের ফাঁক থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বের হলো।

'আমি অবনী। আপনার কি হয়েছিল?'

আরতি জবাব দিল না। একটা বড় নিঃশ্বাস তার শরীর থেকে বের হলো। এবং সেই সঙ্গে চোখের কোল বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। হারাধনবাবু বললেন, সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিল। দাঁড়ান, আমার বাড়ি থেকে এক গ্লাস গরম দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। ওইদিক দিয়েই সদর দরজা পাওয়া যাবে। সুনীল তাকাল। ঘরে কেউ নেই। পাশের ঘরে যদি কেউ থাকে তাহলে হারাধনবাবু দেখতে পাবেন। কিন্তু তিনি সশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। বাইরের ভিড়টা ঘরে ঢুকছিল। অবনী তাদের আটকাল। সুনীল আরতির পাশে বসল, 'কি হয়েছে আরতি।'

আরতি ঠোঁট কামড়ে কান্না থামাচ্ছিল যদিও তার সমস্ত শরীরে কাঁপুনি। সুনীল আরতির কাঁধে হাত রাখল। শরীর গরম এবং কম্পন টের পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু সেই অবস্থায় সে ধীরে ধরে উঠে বসল। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে আরতি বলল, 'এত তাড়াতাড়ি এলে?'

'তাড়াতাড়ি?' ঢোক গিলল সুনীল, 'কতক্ষণ ধরে চিৎকার করছি, দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি তোমার হুঁশ নেই। পেছনের দরজা ভেঙে ঢুকেছি। কি হয়েছিল তোমার? ভয় পেয়েছিলে।'

'ভয়।' আরতি মাথা নাড়ল।

'তাহলে? কেউ এসেছিল?'

এবার নীরবে হ্যাঁ বলল আরতি। সুনীল চোখ ছোট করল, 'কে?'

'বুয়া।' অত্যন্ত শান্ত গলায় জবাব দিল আরতি।

ওদিকে তখনই হারাধনবাবু ফিরে এসেছেন দুধ নিয়ে। বললেন, 'গরম দুধটুকু খেয়ে নিলে দেহে বল আসবে।' সুনীল গ্লাসটা নিল, তারপর আরতির দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'খেয়ে নাও।'

আরতি মাথা নাড়ল, 'দরকার নেই, আমি ঠিক আছি। তোমরা আমাকে একলা থাকতে দাও।' শেষের দিকে তার গলার স্বর এমন চড়ায় উঠল যে ঘরের সবাই অবাক হয়ে তাকাল। অবনী বলল, 'চলুন সবাই, বৌদি ভা'লো আছেন। রাত হয়েছে, এবার ওদের বিশ্রাম করতে দিন।' অনেকেরই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। নাটকটা জমছিল না বলে আশাভঙ্গ হয়েছিল অনেকের। কিন্তু অবনী তাদের প্রায় জোর করেই বের করে সুনীলকে ডাকল, 'দাদা আমি যাচ্ছি। রাত্রে যদি দরকার পড়ে তাহলে খবর দিতে দ্বিধা করবেন না।' অবনী চলে গেলে দরজাটা বন্ধ করল সুনীল।

এবং তখনই লোডশেডিং হয়ে গেল।

তাদের কোম্পানির নিজস্ব বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে। সরকারি সাপ্লাই বন্ধ হলেও কোনো অসুবিধে হয় না। বড় ধরনের ব্রেকডাউন তাদের না হলে লোডশেডিং হবার কথা নয়। এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। জানলা তো বন্ধই ছিল। সুনীলের মনে পড়ল একটু আগে জমাদারের দরজাটা ভাঙ্গার পর ল্যাট্রিনের দরজাটা এপাশ থেকে বন্ধ করা হয় নি। কিন্তু পা ফেলতে গিয়ে সে আড়ষ্ট হলো। এতক্ষণ সে মিছিমিছি আরতিকে সন্দেহ করেছিল। অথচ বিয়ের পর থেকে কখনই আরতি সম্পর্কে এমন চিন্তা মাথায় আসে নি। আসলে অবনীর সঙ্গে ওর ওই হাসিটাই! নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল তার। আরতিকে সে ভালবাসে। যে কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে যতটা ভালবাসে তার এক ফোঁটা কম নয়। কিন্তু তাই বলে সে সন্দেহ করে বসল। আরতি যদি খবরটা জানতে পারে তাহলে মুখোমুখি হওয়া মুস্কিল হয়ে যাবে। এবং তখনই সুনীলের মনে পড়ল বুয়ার কথা। বুয়া এসেছিল? তখন আরতি বুয়ার সঙ্গে কথা বলেছিল? তার মনে পড়ল আরতি কখনই বুয়াকে তুই বলত না। কিন্তু বুয়া আসবে কি করে। ভূতপ্রেতে কোনোদিন আস্থা নেই তার। মাটির নিচে যে শিশু শুয়ে আছে সে ভূত হয়ে আরতির আদর খেতে আসবে? এর আগে আরতি অনেকবার বুয়ার কাল্পনিক অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে এবং, হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সুনীল। কিন্তু আজ তো সে স্পষ্ট আরতিকে কথা বলতে শুনল। অদৃশ্য কারো সঙ্গে কেউ কথা বলে নাকি। দরজায় ধাক্কা দেওয়ামাত্র আরতি অজ্ঞান হয়ে গেল কেন? 'তাছাড়া একটু আগে সে যে বিরক্তি নিয়ে একা থাকতে চেয়েছে সেটাও বোধের বাইরে। বুয়া আসবে, যদি তার আসার ক্ষমতা থাকে, তাই আরতি তাকে জোর করে ক্লাবে পাঠাচ্ছিল?

সুনীল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করল। ভেতরের ঘরে কোনো শব্দ নেই।

ভূতগ্রস্ত আচরণ করছে না তো। বুয়ার ভূত কি আরতিকে ধরেছে? সে নিজে ওসব বিশ্বাস না করলেও। এইসময় ওপাশ থেকে একটা হাসির শব্দ ভেসে এল। আর শরীরে কাঁটা ফুটল যেন। সুনীলের গলা শুকিয়ে গেল। আরতি হাসছে। কি যেন বিড়বিড় করছে। কান পাতল সে। আরতি কথা বলছে, 'কোথায় গেলে? এই তো এলে আবার চলে গেলে? এত লোক দেখে রাগ হয়েছে বাবুর। এই তো, খেলনাগুলোতে কেউ হাত দেয় নি। কিচেনে কি করা হচ্ছে? গ্যাসের কাছে যেও না।'

আর পারল না সুনীল। আরতির কণ্ঠস্বর এতকালের পরিচিত, সম্পর্কটাকে যেন চট করে মুছে দিয়েছে। নিজেকে ভীষণ একা মনে হচ্ছিল তার। সে চেয়ার ছেড়ে উঠল। তারপর পায়ে পায়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওপাশের জানালাটা এখনও খোলা। আকাশ ছোঁয়ানো অদ্ভুত একটা আলো ঢুকছে ঘরে। যা আছে কিনা বোঝা যায় না। আরতি দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে। তার খোলা চুলের শরীরটা অন্ধকারে একটা আদল নিয়েছে মাত্র। মুখ চোখ বোঝা যাচ্ছে না। একটা হাত সামনে বাড়ানো। তাকে ডাকতে গিয়ে থমকে গেল সে। এ আরতিকে সে চেনে না।

ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে আরতি। অথচ কাউকেই ঘরে দেখতে পাচ্ছিল না সে। সুনীল স্পষ্ট বুঝতে পারল কেউ নেই ধারে কাছে। তবে কি আরতির মাথা খারাপ হয়ে গেল? সে আর পারল না। ধীরে ধীরে এগিয়ে আরতিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। আচমকা ঝাঁকুনিটা সামলে আরতি হেসে উঠল, 'এসেছ। এতদিনে আমাকে জড়িয়ে ধরলে সোনা! আঃ।'

কথা বলতে গিয়ে আবার থমকালো। আরতি তাকে জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু এইরকম আলিঙ্গন সে কখনও ওর কাছে পায় নি। যেভাবে বুয়াকে জড়িয়ে ধরত সেইভাবে কখনই তাকে নয়। আর এই আলিঙ্গন এবং আদর বুয়াকেই। আরতির চোখ বন্ধ। অন্ধকারে মুখটা অদ্ভুত উজ্জ্বল। এবং বুয়ার সঙ্গে তার শারীরিক পার্থক্যটাও ওর কাছে ধরা পড়ছে না।

মুহূর্তেই সুনীল স্বামী থেকে রূপান্তরিত হলো মৃত শিশুপুত্রে। তার শরীর বিবশ হয়ে পড়ল। এমন ভালবাসা সে কখনও পায় নি। তাকে জড়িয়ে ধরে এত শান্তি আরতি বোধহয় কখনও আবিষ্কার করে নি। নিজেকে অন্য ভূমিকায় আর কিছুতেই মানাতে পারছিল না সুনীল। কথা না বলে ধীরে ধীরে আরতিকে বিছানায় বসিয়ে নিজে বসতেই দপ করে আলো জ্বলে উঠল। আরতির চোখ তখনও বন্ধ মুখে হাসি। একটা হাত সুনীলের কোমরে জড়ানো। সুনীল বুঝতে পারছিল না কি করবে? যদি ঘোর কেটে যায়, চোখ মেলে যদি বুয়ার বদলে সুনীলকে দেখতে পায় তাহলে কি আরতি অজ্ঞান হয়ে যাবে? এই অবস্থায় মানুষ তো হার্ট অ্যাটাকে মারাও যায় শক পেয়ে। অথচ এইভাবে অনন্তকাল বসেও থাকা যায় না। এবং তখনই তার মনে পড়লো মাদুলিটার

আরতির গালে। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ হলো। তার মুখে হাত রাখল আরতি। এবং সেইসময় চোখ খুলে গেল। গাঢ় গলায় আরতি কিছু বলার আগেই সুনীল বললো, 'তোমায় একটা খবর দেব আরতি। বুয়া এখানে আসতে চায় না। ও মোটেই ভালো নেই।'

'কেন?' চিৎকার করে উঠল আরতি।

'আমি শ্মশানে গিয়েছিলাম। তুমি ওকে বারংবার ডাকছ। অথচ ও একটা সুন্দর আশ্রয় চাইছে। সেই আশ্রয়ে ও এক বছরের মধ্যে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। তুমি ডাকলে ও আসতে পারবে না।'

'মিথ্যে কথা। তুমি কেন এলে? কোত্থেকে এলে? তমি এলে বলেই তো বুয়া চলে গেল!'

'মোটেই না। তোমার মতো আমিও বুয়াকে ভালবাসি।'

হঠাৎ তার দিকে অপলক তাকাল আরতি। তারপর একটু করে হাসি ফুটল। সুনীল জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হলো, হাসছ যে?'

'এই জানো, তোমাকে বুয়ার মতো দেখতে। অবিকল।'

মেরুদণ্ডে বরফ স্পর্শ করলো সুনীলের। বুয়াকে সবাই বলত বাবার মতো দেখতে। সুনীলের মুখ বসানো। কিন্তু কেউ তাকে বলে নি ছেলের মতো দেখতে। এখন এই মুহূর্তে সচেতন আরতি তার মুখের দিকে পরম স্নেহে তাকিয়ে আছে। এই আরতি স্বাভাবিক।

হাতের মুঠোয় চাপা মাদুলিটা গরম হয়ে উঠছিল। সুনীল ঝটপট উঠে জানলার কাছে চলে গেল। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে মাদুলিটাকে ছুঁড়ে দিল অন্ধকারে।



সুড়ঙ্গ দিয়ে ওপরে উঠে এলো ওরা। ট্রাম থেকে নেমে হাওড়া স্টেশনের ভেতরে ঢোকার রাস্তাটা জানত বনি। ওপাশ থেকে হুড়মুড়িয়ে লোক নামছে। নীপার বুকের ভেতরে এখন দমকলের ঘণ্টা। বাস থেকে নামার পরই এটা শুরু হয়ে গেছে। বনি বলল, 'তুই ওইরকম মুখ করেছিস কেন ? যে দেখবে সেই বুঝবে।' নীপা চেষ্টা করল অন্যরকম মুখ করতে। কিন্তু কীভাবে করতে হয় বুঝতে পারছিল না। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল আশেপাশের যেকোনোও মানুষ হঠাৎ বলে উঠবেন, 'এই নীপা, তুই এখানে ?'

হাঁটতে হাঁটতে বনি বলল, 'আমাদের ইউনিফর্মগুলো ছাড়তে হবে। কোথায় ছাড়ি বল তো ?' নীপা ওর দিকে তাকাল 'কেন ?'

'বাঃ! স্কুলের ইউনিফর্ম দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে আমরা চলে এসেছি।' তারপর থেমে গিয়ে চারপাশে তাকাল, 'আরও ওপরে। আমি আর বাড়িতে যাব না, কক্ষনো না। রেজাল্ট দেখলে মা আমাকে ঠিক মেরে ফেলবে।' নীপা কিছু বলল না। গতকালই মিস বলে দিয়েছিল কারা কারা প্রমোশন পায় নি।

আজ রেজাল্ট কার্ড হাতে পেয়েও সেটাই জেনেছে। ফিজিক্স আর অঙ্কে ফেল। বাবা এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। বাবার সামনে ওই কার্ড নিয়ে দাঁড়ানো যায় না। মা হয়তো বকবে, হয়তো কাঁদবেও কিন্তু বাবা—! বনি বলল, এসে গেছি। ওই যে বড় ঘড়ি, ওর নিচে দাঁড়িয়ে থাকবে ওরা।'

দুজনের হাতেই কাজ করা চটের ঝোলানো ব্যাগ। ওতেই বই নিয়ে স্কুলে যায় ওরা। আজ তার তলায় লুকিয়ে আনা হয়েছে দুটো স্কার্ট, একটা তোয়ালে, টুথপেস্ট, ব্রাশ, হলদে চিরুনি আর কয়েকটা রুমাল। ওপরে খাতাপত্তর।'

গতকাল রেজাল্ট কী হয়েছে জানার পরই এই সিদ্ধান্ত। একটু একটু করে জমানো একশ সত্তরটা টাকা সঙ্গে এনেছে নীপা। এতদিন সেটাকে অনেক টাকা বলে মনে হতো তার। বনি বড় ঘড়ির তলায় দাঁড়িয়ে বলল, 'স্বপনটা চিরকাল লেট লতিফ। সেই সরস্বতী পুজোর সময় মনে আছে ? আমাদের পনের মিনিট দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।' স্বপন হলো বনির বয়ফ্রেন্ড। যাদবপুরে পড়ে। সরস্বতী পুজোর সময় প্রোগ্রাম করেছিল বনি। সেইসময় অতীনের সঙ্গে আলাপ। সারাদিন চারজন টৈ টৈ করে শহরটা ঘুরেছিল। যেসব জায়গায় বাবার যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেইখানে গিয়ে বসেছিল। এই যেমন ভিক্টোরিয়ায়। আর সেইখানে গিয়েই অতীন তাকে বলেছিল, 'আই লাভ ইউ নীপা। আই অ্যাম ডায়িং ফর ইউ।'

স্বপন বনিকে নিয়ে বসেছিল দূরের একটা গাছের তলায়। অতীন তার পাশে। প্রথম আলাপ, সঙ্গে সঙ্গে নাকের ডগায় ঘাম জমেছিল। মুখে রক্ত। কোনো

রকমে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন ?'
'ইড আর সামথিং। তুমি কী তা নিজেই জানো না।'
'যাঃ। তুমি আমাকে চেনই না, কখনও দ্যাখোনি।'
'শুনেছি। স্বপন আমাকে বনির কাছে শুনে সব বলেছে। তাছাড়া কাউকে চিনতে অনেক সময়, এক মুহূর্তই যথেষ্ট। তুমি আমাকে প্রমিজ কর আর কাউকে ভালবাসবে না ?' ওর হাত ধরেছিল অতীন। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিল নীপা। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঠোঁট কামড়েছিল, 'ভেবে দেখি।' কিন্তু চোখের সামনে তখন বাবার মুখ! দুবছর আগেও বাবা তাকে জড়িয়ে ধরে বলত, 'মা গো, একবার বল, আর কাউকে ভালবাসি না তোমাকে ছাড়া।'
সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে এই অভ্যেস। বাবার গায়ের গন্ধ খুব ভালো লাগত তখন। ইদানীং বাবা সেইভাবে আর জড়িয়ে ধরে না। তার শরীর যখন পাল্টে গেল, সেই গোপন ব্যাপারটা মা যখন আরও গোপনে বুঝিয়ে দিল তখন থেকেই বাবা যেন কেমন দূরে দূরে। তবু কখনও তার কাঁধ জড়িয়ে আদর করার চেষ্টা করলে সে নিজেই বিরক্ত হয়েছে, 'আঃ, বিরক্ত করো না।' বাবা তার দিকে প্রথম প্রথম অবাক হয়ে তাকাত। সে যে বিরক্ত হয়, হতে পারে তা যেন বিশ্বাস করত না, এখন করে।
বনি বলল, 'এই, লেডিস ওয়েটিং রুমে ঢুকে জামা পাল্টে আসবি ?' নীপা কী বলবে বুঝতে পারছিল না। বাঁ দিকের একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুজন লোক তাদের দেখছে। সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল তার। বনিকে তো মোটেই নার্ভাস মনে হচ্ছে না। ক্লাসের সবাই বলে বনির মধ্যে কেমন ছেলে-ছেলে ভাব আছে। বনি ঘড়ি দেখল, 'কী ব্যাপার ? ওরা তো আসছে না। তুই এখানে দাঁড়া, আমি ফোন করে আসি। ওই যে ওই কোণে ফোনের বুথ আছে।'
দ্রুত মাথা নাড়ল নীপা, 'না, আমি একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'
বনি হাসল, 'তুই একটা কেবুলি। চল।'
বনি যে স্টেশনটা ভালো চেনে তা বোঝা যাচ্ছে। ও এমনভাবে হাঁটছে যেন বাড়ির লোকেরা সঙ্গে আছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই হইচই বেড়েছে।
বাবা বকছে মাকে, মা প্রতিবাদ করছে।
প্রতিবছর রেজাল্ট বের হবার দিন মা-বাবা একসঙ্গে তাকে নিয়ে স্কুলে আসে, আজও এসেছিল। রাস্তার ওপাশে গার্জেনদের ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল। ওরা সবাই চলে গেল অথচ নীপা আসছে না দেখে নিশ্চয়ই হেডমিসট্রেসের কাছে খোঁজ নিয়েছে। আর তখনই জানতে পেরেছে রেজাল্টের কথা। বনির সঙ্গে যে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবে ও তা কেউ ভাবতে পারেনি। এখন কী করবে ? নিশ্চয়ই বুয়ামামার বাড়িতে খোঁজ নেবে অথবা রীতামাসীর ওখানে। পাড়ায় ওর কোনো বন্ধু নেই। মা কারও সঙ্গে মিশতে দেয় না। পাঁচফুট দুই ইঞ্চির মেয়ে সুন্দরী বলে মায়ের অস্বস্তির শেষ নেই। এবার ক্লাস নাইন হলেও মা চাইতো সবাই যেন তার দিকে চোখ বন্ধ করে থাকুক। তারপর বিকাশজেঠুর

কাছে নিশ্চয়ই ছুটে যাবে বাবা। বিকাশজেঠু লালবাজারের বড় অফিসার। সেটা কখন যাবে ?

বুথের সামনে বেশ ভিড়। বনির পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল নীপা। সুযোগ আসা মাত্র বনি ভেতরে ঢুকে বলল, 'ব্যাগটা ধর।' নীপাও বুথের ভেতরে পা রেখে স্বস্তি পেল। যেন এখন তিনদিকের মানুষ তার ওপর নজর রাখতে পারছে না। মিনিট দুয়েকে অন্তত দশবার নাম্বার ঘোরাল বনি। প্রতিবারেই রিলে করার মতো বলে যাচ্ছে এনগেজড। এখন আরও দুজন অপেক্ষা করছে টেলিফোন করবে বলে। তার একজন বেশ ছিমছাম চেহারা, মুখের ভঙ্গিটা অনেকটা জ্যাকি স্রফের মতো, হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'লাইন পাওয়া যাচ্ছে না ?' বনি আরও জোরে রিসিভার আঁকড়ে নাম্বার ঘোরাতে শুরু ক'ল। কিন্তু তাতেও ফল পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটা বলল, 'অত জোরে ঘোরালে স্টেশনের টেলিফোন কথা বলবে না। হয় আমারটা আমাকে করতে দাও নইলে তোমাদের সাহায্য করতে পারি।'

'কী সাহায্য করবেন ?' বনি খিঁচিয়ে উঠল।

'রাগ করছ কেন ? এটা পাবলিক টেলিফোন। দাও, আমি লাইন ধরে দিচ্ছি।' হাসিটা এমন যে বনিও রিসিভার হস্তান্তর করল। অতএব নীপা নেমে দাঁড়াল। লোকটা স্বচ্ছন্দে তুমি বলছে' বনিকে না হয় বড় দেখায় না কিন্তু—! রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'নাম্বারটা ?' বনি ওকে একটা আধুলি আর নাম্বার দিল। শুনে নিয়ে নাম্বার ঘোরাল লোকটা। কিন্তু এবারেও কিছু হলো না। বনি মন্তব্য করল, 'পারলেন না তো !' লোকটা জবাব না দিয়ে আবার চেষ্টা করল। এবার ওর ঠোঁটে হাসি ফুটল। নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল নাম্বারটা ঠিক কি না। তারপর রিসিভারটা বনিকে দিয়ে বলল, 'কথা বল।'

'থ্যাংকু।' বনি স্মার্ট হলো, 'হ্যালো, স্বপন আছে ? নেই। কোথায় গেছে ? কাল মালদায় গিয়েছে মায়ের সঙ্গে। কবে আসবে ? ও। ঠিক আছে না, আমার নাম বলতে হবে না।' বনির মুখে এখন মেঘ, যেন কেঁদে ফেলবে ও।

কোনোওরকমে রিসিভারটা নামিয়ে সে বেরিয়ে এসে বলল, 'স্বপন নেই, মালদায় গিয়েছে।'

'এখন আমরা কী করব ?'

'সেকি ? ওরা আসবে না ?' নীপা হতভম্ব।

'কাওয়ার্ড। ব্যাকবোন নেই।' বনির চোখে এবার জল। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলে নিল সে, 'আমাকে বিট্রে করেছে। আমি কী করব এখন, আমি আত্মহত্যা করব। বেঁচে থাকার কোনোও মানে হয় না নীপা।'

কান্না পাচ্ছিল নীপারও। দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু তার একবারও অতীনের জন্যে মন খারাপ করছিল না। অতীন আসবে না ভেবে কষ্টের বদলে কেমন একটা স্বস্তি হচ্ছিল। এবং তার বদলে ভয় করছিল নীপা আত্মহত্যা করতে পারে। ওই তো ওপাশে ট্রেন, তার তলায় পড়ে গেলেই হলো।

সে নীপার হাত ধরল, 'বনি, চল বাড়িতেই ফিরে যাই।'
'না।' মাথা নাড়ল বনি। তারপর ছোট্ট রুমালে চোখ মুছল, 'আমি চিঠি লিখে এসেছি। নিজের জীবন নিজে ঠিক করে নিলাম। আমার খোঁজ করো না। এরপর আমি বাড়িতে ফিরতে পারব না। অসম্ভব। আমি আত্মহত্যা করব।'
'এই বনি, প্লিজ, তুই আত্মহত্যা করলে আমি কোথায় যাব ?'
'তুই জানিস না নীপা, স্বপন আমাকে বউ বলত। বলত, কখনও আমাকে ছেড়ে যাবে না। আর আজ এখানে আসতে বলে মাকে নিয়ে মালদায় চলে গেল। মা ঠিকই বলে, পুরুষজাতটাই বেইমান।' দ্বিতীয়বার চোখ উপচে জল এল।
'তোমরা এইভাবে কান্নাকাটি করলে পুলিশ নির্ঘাৎ ধরে নিয়ে যাবে।' একদম পেছনে দাঁড়িয়ে লোকটা কথা বলতেই ওরা চমকে ফিরে তাকাল। লোকটা মিষ্টি করে হাসল, "টেলিফোনে বন্ধুকে পাওনি তাই কাঁদতে হবে ?"
বনি কথাটা শেষ হওয়ামাত্র নীপাকে বলল, "চল।" আর ঠিক সেইসময় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন, "কী ব্যাপার ? কাঁদছ কেন খুকী ?"
সঙ্গে সঙ্গে নীপা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।
লোকটার চেহারা বিকাশজেঠুর মতো, নির্ঘাৎ পুলিশ। বনিও মাথা নামাল। আর সেইসময় পেছনের লোকটা বলে উঠল, "ওই যা হয়, রেজাল্ট বেরিয়েছে, কান্নাকাটি তাই।"
"পাশ করে নি ?"
"হ্যাঁ। দাদা খুব রাগী তাই ভয় পাচ্ছে।"
"আপনার কে হয় এরা।"
"একজন ভাইঝি আর ও পাশের বাড়িতে থাকে।"
"বাড়ি নিয়ে যান।"
লোকটি বলল "চল। এখন কান্নাকাটি করে কী হবে ? পড়াশুনা না করার সময় মনে ছিল না ? চল, ট্রেনের দেরি নেই।"
কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ওরা কিছুটা দূর হেঁটে এলে লোকটা বলল, "আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি ! রেলওয়ে পুলিশের বড়কর্তা। আমি না থাকলে তোমাদের এতক্ষণে চালান দিয়ে দিত। পুলিশের খাতায় একবার নাম উঠলে— ! কোথায় যাবে তোমরা ?"

নীপা বনির দিকে তাকালো। বনির মুখে এখন কান্না নেই। সে বড় ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। সেখানে কেউ নেই। তারপর বনি বলল 'আমরা একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।'
লোকটা বলল, "শোন, পাগলামি করো না। তোমরা স্কুল-য়ুনিফর্মে ঘুরলে পুলিশ আবার ধরবে। কারও আসার কথা ছিলো নিশ্চয়ই ?"
প্রশ্নটা নীপার দিকে তাকিয়ে। সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললো। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'খিদে পায়নি ? চল, ওই রেস্টুরেন্টে বসে স্থির করি কি করা যায়। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। লোকটা আগে আগে হাঁটছিল। কিছু না

ভেবেই ওরা অনুসরণ করলো। বনি ফিসফিস করে বললো, লোকটাকে কী রকম মনে হচ্ছে রে ?'
"জ্যাকি স্রফের মতন।"
"ভাগ্। পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স হবে না ? স্বপনদের থেকে অনেক বড়। খারাপ লোক মনে হয় ?"
"কী জানি। আমার ভয় করছে। চল, বাড়ি ফিরে যাই।"
"তুই যা। আমি বাড়ি যাবো না।" বনি জেদী গলায় বলল।
ফিসফ্রাই খুব ফেবারিট বনির। নীপার আবার ফিস ফিংগার ভালো লাগে। লোকটার নাম জেনেছে ওরা। সুন্দর সেন। বনি বলল, "আপনাকে প্রফেসর বলে মনেই হয় না। নীপা বলছিল আপনাকে জ্যাকি স্রফের মতো দেখতে।"
"সে আবার কে!" সুন্দর এমন মিষ্টি হাসলো যে বনি চোখ বড় করলো, "ওমা, আপনি হিন্দি সিনেমা দ্যাখেন না ?"
"তোমরা খুব দ্যাখো বুঝি ?"
"রবিবারে আর চিত্রহারে।"
"কিন্তু তা তো হলো, তোমরা এখন কী করবে ? কোনো আত্মীয়ের বাড়ি নেই ?"
নীপা বললো, "আমার এক পিসী থাকেন আসানসোলে।"
"সেখানেও তো খবর যাবে। আসলে মালদা থেকে স্বপন না ফেরা পর্যন্ত তোমাদের একটা কোথাও থাকতে হবে।" সুন্দরকে চিন্তিত মনে হলো।
এই আধঘণ্টায় ওরা সুন্দরকে পছন্দ করে ফেলেছিল। খুব স্নেহপ্রবণ, মিষ্ট ব্যবহার এবং সবসময় ওদের সাহায্য করতে চাইছে। কথা বলছে যখন তখন মনে হচ্ছে সমানে সমানে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে। বাবা মায়ের মতো তুচ্ছ করছে না। সুন্দর বলল, 'এক কাজ করতে পার! আমাদের গ্রামের বাড়িতে চল। সেখানে বউদিরা আছেন। তাদের সঙ্গে কয়েকদিন থাকো। এর মধ্যে আমি স্বপনকে নিয়ে ওখানে হাজির করছি। ভেবে দ্যাখ।'
"ওরা কিছু বলবেন না ?"
"কে, বউদিরা ? না না। ওঁরা আমাকে জানেন। একদম নিরাপদ তোমরা সেখানে।"

বাসে যে এত ভিড় হয় কে জানতো। হাওড়া থেকে ট্রেনে একটা জায়গায় নেমে বাসে উঠেছিলো ওরা। গ্রামের মানুষগুলো বারংবার ওদের দিকে তাকাচ্ছিল। এ ধরনের বাসে ওরা আগে ওঠে নি। জানলা দিয়ে ধানের ক্ষেত, পুকুর, তালগাছ দেখতে কি ভালোই না লাগছিল। বাসটা যেখানে নামিয়ে দিয়ে গেল সেখানে একটা বিরাট বট গাছ। তার তলায় কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। বিকেল হয়ে এসেছিল। সুন্দর বলল, "তোমাদের হাঁটতে কষ্ট হবে এবার। চল, শর্টকাট করি, গাড়ির পথ ধরলে বেশি হাঁটতে হবে।"
খুব মজা লাগছিল ওদের। মাথার ওপরে নীলআকাশটা কী নীল। দুপাশে পাকা ধানের ঢেউ। ওরা আলের ওপর দিয়ে হাঁটছিল। সুন্দর হঠাৎ খোলা

গলায় গান ধরল, 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়—।' সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরকে আরও ভালো লাগলো নীপার। নিজের অজান্তেই সে গলা মেলাল। এই মুহূর্তে তার বুকে কোনও ভয় জমে ছিল না। মাঠের প্রান্তে একটি দোতলা বাড়ি। পেছনে পুকুর। অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। আশেপাশে কোনো বাড়ি নেই। ওরা ভেতরে ঢোকমাত্র কয়েকটি মহিলা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। সুন্দর বলল, "এই হলো আমার তিন বউদি। বউদি, এ হলো বনি আর ওর নাম নীপা। খুব ভালো মেয়ে ওরা। এখানে কদিন থাকবে কিন্তু কেউ যেন না জানে ওরা এখানে আছে।"

"কেন গো কী ব্যাপার ?" ছোটজন প্রশ্ন করল।

বড়জন বকে উঠল, "আর এখন পায়ে ধুলো আর প্রশ্ন তুললি তুই। এসো তোমরা।"

বড়বউদি ওদের ওপরের ঘরে নিয়ে গেলেন।

'আমাদের এখানে অনেকগুলো ঘর। তোমাদের থাকতে মোটেই অসুবিধে হবে না।' আঁচলে বাঁধা একটা চাবির তোড়া থেকে খুঁজে ওপাশের বন্ধ ঘরের তালা খুললেন তিনি। চমৎকার সাজানো ঘর। এরকম ফাঁকা মাঠের মধ্যে এমন ঘর ভাবা যায় না। বউদি বললেন, "এখানেই তোমরা থাকবে, কেমন! এদিকের জানলায় দাঁড়ালে কেউ তোমাদের দেখতে পাবে না। ওপাশে জলা। বড় রাস্তা বাড়ির এ'পাশে। সেদিকে না গেলেই হলো। ও হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু ভাই সাহেবী বাথরুম নেই। পুকুরে স্নান করি ভোরবেলায়। তবে তোমাদের জন্যে হাত মুখ ধোওয়ার জল দিচ্ছি। নিচে কলপায়খানা আছে। তা কী ব্যাপার ? বাপমায়ের সঙ্গে ঝগড়া ?" এবার মুখ নিচু করল নীপা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মা বাবা পাগল হয়ে গিয়েছে।

মুড়ির সঙ্গে নারকোল খেতে খেতে বনি বলল, "দারুণ, না ?"

নীপা মাথা নাড়ল। তার মুড়ি খেতে ভালোই লাগে না। চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। কিন্তু এক প্লেট ফিশ ফিংগার সেই সকালে খাওয়ার পর এটা অমৃত লাগছে। ওদের সামনে ছোট দুই বউদি বসে আছে হাঁটু মুড়ে। ছোটবউদি বলল, তোমাকে কী মিষ্টি দেখতে! ঠিক সিনেমার নায়িকার মতো। তা প্রেমিকরা এলো না কেন ভাই ?'

বনি কিছু বলল না। মুখ নামাল। নীপা প্রতিবাদ করল, 'ওর বয়ফ্রেন্ড !"

বনি প্রতিবাদ করল, "এই অতীন তোকে বলেছে আই লাভ ইউ। আমি শুনেছি।"

"আমি তো বলিনি।"

"শুধুই কথাই বলেছে আর কিছু করে নি ? বল না ভাই, আমাদের স্বামীরা তো শহরে থাকে, হপ্তার বার। পাঁচ দিন একা একা থাকি। চুমু টুমু খায় নি ওরা ?' ছোট হেসে গড়িয়ে পড়ল। মেজ ওকে চড় মারল আলতো করে, 'কী মুখ রে বাবা। খেলে তোকে বলবে কেন ?' ছোট বলল, আমাদের সুন্দরবাবু তো মেয়েদের থেকে হাজার মাইল দূরে থাকেন। সেই ছেলে তোমাদের নিয়ে

এলো। পছন্দ আছে।"
এখানে ইলেকট্রিক নেই। হ্যারিকেন জ্বলছে। ওরা দুজন জানলার পাশে বসে মাঠ দেখছিল। সেখানে অজস্র জোনাকি। বউদিরা নিচে রান্না করতে গিয়েছে। ওদের দেখার পর আর একটুও ভয় করছিল না। সুন্দর সেই যে গিয়েছে আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না তার। নীপা ফিসফিস করে বলল, "এদের টয়লেট ভীষণ নোংরা।"
"গ্রামের দিকে এইরকম হয়।"
"তুই কখনও পুকুরে স্নান করেছিস ?"
"না। মা সবসময় ঠান্ডা-গরম জলে স্নান করতে বলে।"
"আমাকেও।"
"তোর মন কেমন করছে ?"
"হুঁ।" নীপা বলল, 'এক্সাইটেড হলে মায়ের বুক ব্যথা করে, হাঁফ ধরে। বাবার জন্যে কষ্ট হচ্ছে। জানিস, বাবা না, আমি ঘুমিয়ে পড়লে আমার কপালে একবার হাম খেত।'
"হাম।" হেসে ফেলল বনি, "হাম তো বাচ্চাদের খায়। তুই কি বাচ্চা ?" কথাটা খারাপ লাগল নীপার। হঠাৎ তার মনে হলো বাবাকে কোনদিনও, সে দেখতে পাবে না। টপটপ করে জল পড়তে লাগল গাল বেয়ে। বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করতে লাগল।
হ্যারিকেনটা পেছনে থাকায় বনি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বনি বলল, "স্বপন এলে আমি খুব বকব।"
"তারপর কি করবি ?"
"কোথাও চলে যাব ওর সঙ্গে।"
"আমি কী করব ?"
"আঃ স্বপন একা আসবে নাকি ? অতীনকে নিয়ে আসবে।"
"আমি অতীনের সঙ্গে যাব কেন ?"
"বাঃ। তোকে ও ভালবাসে না ?"
"আমি তো ভালবাসি না।" নীপা মাথা নাড়ল, "এমনি ভালো লাগে।"
"তাহলে তুই এলি কেন ?"
"একা একা বড় হব বলে। মা-বাবার সাহায্য ছাড়া বড় হয়ে ফিরে যাব। মা প্রায়ই বলে আমার ভবিষ্যৎ নাকি ঝরঝরে। সেটা যে মিথ্যে তা প্রমাণ করব।"
"কী করে ?"
"জানি না।" কেঁদে ফেলল নীপা।
"কাঁদিস না।" নীপার পিঠে হাত রাখল বনি, "স্বপন অতীন এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"
এত ঝাল রান্না কখনও খায় নি নীপা। আর কী সব তরকারি। বাড়িতে হলে ছুঁয়েও দেখত না সে। হাঁটু মুড়ে খেতে বসে কষ্টও হয়েছিল। রান্না কিন্তু ভালো। মা রোজ একই মেনু করে। মাছ অথবা মাংস। ঝাল সত্ত্বেও মাছের

প্রিপারেশন দারুণ লেগেছিল। আর পায়েসটা? উঃ, ফ্যানটাস্টিক। কিন্তু রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না। বনিরও। এই প্রথম বাড়ির বাইরে রাত কাটাচ্ছে ওরা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ কিন্তু বাইরে শেয়াল ডাকছে। কয়েকবার মনে মনে কেঁদেছে সে। একবার মনে হলো বনিও কাঁদছে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল মালদা থেকে আসতে কতক্ষণ সময় লাগে? নীপা জানে না, জবাবও দিতে পারে নি। ভোর হতেই দরজায় শব্দ। ওরা দুজনেই একসঙ্গে চিৎকার করে কে বলল। ছোট-বউদির গলা ভেসে এল, "চলে এসো, স্নান করতে হবে।"
বাড়ির পেছনেই পুকুর। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। ওরা তোয়ালে নিয়ে ছোট বউ-দির সঙ্গে সেখানে এলো। আশেপাশে কেউ নেই। এখনও আলো ফোটে নি। ছোটবউদি বলল, "তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে নাও। তোমাদের দেখলেই লোকে বুঝবে শহরের মেয়ে।" খুব ভয় লাগছিল জলে নামতে। কিন্তু জল ততো ঠাণ্ডা নয় কিন্তু কেমন ঘোলাটে। পায়ের তলায় কাদামাটি। নীপার মনে হলো কয়েক পা গেলেই ডুবে যাবে। সে গায়ে জল ছিটিয়ে স্নানের চেষ্টা করতেই ছোটবউদি তার কাঁধ ধরে জলে চেপে ধরে ছেড়ে দিল। রাগ এবং ভয়টা কেটে যেতে খুব মজা লাগল তার। বনি এখন বারংবার ডুব দিচ্ছে। ছোটবউদি এবার তাগাদা দিচ্ছে ফেরার। নীপা বলল, "আমাকে সাঁতার শিখিয়ে দিতে হবে।" ছোটবউদি বলল, "শেখাতে হবে না, ঠিকই শিখে নেবে।" গলার স্বরটা যেন কেমন! সারাদিন ঘরে বসে থাকা আর লুডো খেলা। আর দারুণ দারুণ খাবার। কচু দিয়ে মাছের প্রিপারেশন দারুণ। দুধপুলিটা অসাধারণ। ছোটবউদি আজ দুজনকেই শাড়ি পরিয়ে দিল। সন্ধ্যের পরেই বড়বউদি ছুটে এলো, "খবরদার কথা বলবে না তোমরা!"
চোখ মুখ দেখে চমকে উঠল ওরা, 'কেন?'
"পুলিশ এসেছে গ্রামে। বাড়ি বাড়ি খুঁজে দেখছে।" বড়বউদি ওদের হাত ধরে টানতে টানতে রাস্তার দিকের একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে অনেক জিনিসপত্র ঠাসা। দুই বউদিকেও সেখানে থাকতে বলল। তাকে হ্যারিকেনের আলোয় খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। দরজা বন্ধ করে বড়বউদি চলে গেলে নীপা জানলার কাছে গেল! বাইরে অন্ধকার। এদিকটা ওরা দ্যাখে নি। বাড়ির গায়ে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। তাতে ত্রিপল ঢাকা। মেজবউদি ওর হাত ধরে টানল, "মরার ইচ্ছে হয়েছে, না? চলে এসো এদিকে। একটা কথা বলেছ কি কেটে ফেলব।" নীপা বিস্ফারিত চোখে দেখল মেজবউদির হাতে বড় ছুরি। ওর মাথা ঘুরতে লাগলো। বনি অনেকটা শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, "ওরা এই গ্রামে এলো কি করে?"
"তোমরা যখন বাস থেকে নেমেছিলে তখন একজন স্কুল মাস্টার দেখেছে। কাগজে খবর পড়ে সে ব্যাটা জানিয়েছে। পুলিশ চলে গেলে তোমরা নেমে একটা ট্রাকে উঠে পড়বে। তার ত্রিপলের তলায় চুপটি করে শুয়ে থাকবে। সুন্দর তোমাদের নিয়ে তোমাদের প্রেমিকের কাছে যাবে।"
নিচে খুব হইচই হচ্ছে। ওরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আওয়াজটা ওপরে উঠে

এল। বড়বৌদির গলা ভেসে এল, "হাজারবার বলছি কেউ নেই তবু বিশ্বাস করছেন না। দেখলেন তো সব ঘর।"
পুরুষ-কণ্ঠ শোনা গেল, "ওই ঘরে কে আছে?"
"আমার জায়েরা। অল্পবয়সী। বাইরের পুরুষের সামনে বের হবে না।"
"তবু একবার দেখব। ওপরয়ালার হুকুম।"
টর্চের আলো পড়ল ঘরে। দুই বউদি ওদের আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। আলো নিভে যেতে বড়বউদি বলল, "হলো তো! আপনাদের জন্যে মা-বোনের ইজ্জত থাকবে না। চলুন নিচে।"

দ্বিতীয় একটি গলা কথা বলল, "আপনাদের বাড়ির বউরা কি বব ছাঁট চুল রাখে? স্যার দেওয়ালে দুটো বব ছাঁটের ছায়া দেখলাম। আপনি ভেতরে ঢুকুন।"

খাটের ওপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল নীপা। পাশের ঘরে বাবা। লাল-বাজার থেকে নিয়ে আসার পথে এবং এখানে আনার পরে বাবা একটাও কথা বলে নি। এঘরে এখন ভিড়। পাশের বাড়ির মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "শুনলাম ট্রাক রেডি ছিল, রাত্রেই পাচার করে দিত লক্ষ্ণৌ। খুব বেঁচে গেছে। যাই বল দীপ্তি, তোমরা মেয়ে মানুষ করতে পার নি। সবাই চলে গেলে বাবা ঘরে ঢুকল, "নীপু! বলতো, আমি তোকে কী দিতে পারিনি?" পেছন থেকে মা চিৎকার করে উঠল, "কথ বল না ওর সঙ্গে। ও রাক্ষুসী, মরে গেলি না কেন, কেন এই—! আমাদের মুখ পুড়িয়ে কেন এলি!"
বাবা বললে, "এতদিন মেয়ের জন্য অজ্ঞান হচ্ছিলে আর এখন মরে যেতে বলছ। এভাবে কথা বল না। ওকে খেতে দাও। তুমি আবার দয়া করে খাব না বল না। আমি সহ্য করতে পারছি না।"
ইচ্ছে ছিল না। কিছুই ভালো লাগছিল না। সুন্দর লোকটা অধ্যাপক নয়, মেয়ে ধরে চালান দেয়—কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তিন বউদি আর সুন্দরকে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে এনেছে পুলিশ। ওরা যে মিষ্টি গল্প করত— সেসব?
খাওয়ার টেবিলের সামনে মা। ওপাশে বাবা চুপচাপ বসে। সেই এক মেনু। মাছের ঝোলটা মুখে দিয়ে সরিয়ে রাখল সে। সঙ্গে সঙ্গে মা বলে উঠল, 'কী, মুখে উঠছে না? সেখানে কি রাজভোগ খেতে?' মাথা নাড়ল নীপা, 'ওরা ফ্যানটাস্টিক রান্না করত। বাড়িতে কখনও এমন রান্না খাইনি!' সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল মা, "কী, কী? প্রশংসা হচ্ছে? যারা তোমাকে জন্মের মতন বিক্রি করে দিত তাদের প্রশংসা করছ। কালসাপ, কালসাপ!"
নীপা বাবার দিকে তাকাল। এঁটো হাতে টেবিলে রাখা বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরল সে, আমি ওখানে খুব ভালো ছিলাম বাবা। ওরা খুব ভালো খাওয়াতো, পুকুরে স্নান করতে দিত। পুকুরে ডুব দিতে আমার ভীষণ ভালো লাগত। কেমন হলুদ হলুদ পৃথিবীটা, কেমন হলুদ হলুদ।'

খোলস

অবনীশ একজন কৃতী মানুষ। তার বয়স প'য়তাল্লিশ। স্বাস্থ্য চমৎকার। মাথার চুল পড়ে নি কিংবা পাকে নি। রোজ দাড়ি কামালেও মুখে বেশ নরম ভাব আছে। অবনীশ যে চাকরি করে তাতে কোনো ঝামেলা নেই, মাইনেটাও ভালো। অবনীশের স্ত্রীর নাম অর্চনা। এই বৈশাখে সে চল্লিশে পা দেবে। ছিপছিপে মাজা শরীর, অর্চনাকে দেখলে কখনই প'য়ত্রিশের বেশি মনে হয় না। অর্চনা শিক্ষিকা, ওর স্কুল সকালে। অবনীশের সন্তান একটি, মেয়ে। মধুশ্রী ক্লাস নাইনে পড়ে। এর মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে পড়াশুনায় ও ভালো করবে। কোনো ঝুটঝামেলা নেই, দক্ষিণের ফ্ল্যাট বাড়িতে ওদের অনেককাল হয়ে গেল।
যদিও অবনীশকে এইসব দেখে সুখী বলা যায় তাহলেও ওর একটা গোপন দুঃখ আছে। দুঃখটা নিজেকে নিয়ে, কিংবা বলা যায় নিজের শরীর নিয়ে। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলে আর এক মুহূর্ত দেরি হয় না। কি করে যে ঘুম আসে, তার চোখ জুড়িয়ে যায়, চেতনা লোপ পায় তা কিছুতেই টের পায় না অবনীশ। পৃথিবীর চারভাগের একভাগ মানুষ যেখানে সামান্য ঘুমের জন্যে ছটফট করে তখন অর্চনার ভাষায় তার সুইচ টিপলেই ঘুম। কিন্তু তারপরেই কাণ্ডটা ঘটে যায়। তার মুখ হাঁ হয়ে যায় এবং নাক এবং মুখ থেকে যে সব শব্দ বেরিয়ে আসে তা মারাত্মক। অর্চনা একে শুধু নাকডাকা বলতে রাজী নয়। বিলেত আমেরিকা হলে এর সামান্য শব্দ করলে বিবাহ-বিচ্ছেদ পাওয়া যেত।

অবনীশের ঘরে তিনটে ছবি আছে। মুখের তিন পাশ থেকে তোলা। তাতে দেখা যায় অবনীশের ঠোঁট দুটো খোলা, নাক বিস্ফারিত এবং চট করে দেখলে খুব বীভৎস একটা মুখকে নজর করা যায়। যেন একটা মুখের ভেতর থেকে আর একটা মুখ বেরিয়ে আসছে। দিনের বেলায় অবনীশ নিজে ছবিটাকে খুঁটিয়ে দেখেছে। একটা সুন্দর মানুষের মুখের ভেতর থেকে যেন আর একটি দাঁতালো হিংস্র মুখ উঠে আসছে। অর্চনা বলেছিল, 'ঘুমোলে তোমার মুখ এরকম হয়ে যায়।' মধুশ্রী চিমটি কেটেছিল, 'জেকিল অ্যান্ড হাইড।' বলে টেপরেকর্ডারের বোতাম টিপেছিল। প্রথমবার যখন শব্দটা ওই যন্ত্রে শুনেছিল তখন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে নি। ওটা কি তার নাক কিংবা মুখ থেকে বেরিয়েছে? প্রথমে বিষণ্ণ গরুর ডাকের মতো শোনাল। তারপর মেঘ-গর্জন কিংবা চিড়িয়াখানায় থাকা বাঘের গজরানি। একটানা। কিন্তু ছবি তিনটের দিকে তাকিয়ে টেপ চালাতে চালাতে অবনীশ একটা কান্নার সুর শুনতে পেল একদিন। সে কি কখনও নাক ডাকতে ডাকতে কেঁদেছে? জেগে থাকতে সে কখনও এরকম পরিশীলিত এবং বীভৎস শব্দ বের করতে পারত না।

অভ্যেসে এসবই একটা সুরে বাঁধা হয়ে গিয়েছে।
টেপ কিংবা ছবি তোলা হয়েছে সম্প্রতি। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি মানুষের সত্যিকারের চেহারাটা দেখা যায়। অবনীশের হাতে ছবি আসার পর থেকেই কয়েকটি মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। অথচ পঁয়তাল্লিশের মধ্যে চুয়াল্লিশ বছর অবনীশের নাক ডাকে নি। তার সাক্ষী অর্চনা। বিয়ের পর এতগুলো বছর সে ভদ্রলোকের মতো ঘুমিয়েছে। এক বছর হলো সে একা শুচ্ছে দরজা বন্ধ করে। কিন্তু তাতেও নাকি পাশের ঘরে অর্চনাদের কাছে আওয়াজ পেঁছাচ্ছে। অথচ এসব কিছুই টের পায় না অবনীশ। অতজোরে শরীর কাঁপিয়ে শব্দ করলে তো পরিশ্রান্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তাও হয় না সে। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে মনেই পড়ে না গতরাতে সে নাক ডেকেছিল। অর্চনা বিরক্ত, মধুশ্রী তো কানে তুলো দিয়ে শোয় পাশের ঘরে। ওরা না ঘুমিয়ে পড়লে আজকাল বিছানায় যায় না অবনীশ। পাশাপাশি ঘর, কিন্তু উপায় নেই। শব্দ বড় মারাত্মক।
বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়েছে মাস আটেক থেকে। অথচ আগে বছরে অন্তত দু'বার বের হতো ওরা। বেড়াবার নেশা অর্চনার খুব। শান্তিনিকেতন ট্যুরিস্ট লজে সেবার লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে গেল। ওরা দুটো ঘর নিয়েছিল। একটায় মেয়ে নিয়ে অর্চনা অন্যটায় অবনীশ। মাঝরাত্রে দরজায় শব্দ হতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। প্রথমে মনে হয়েছিল স্বপ্ন দেখছে। তারপরে চেতনা স্পষ্ট হতে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলেছিল। লজের ম্যানেজার বাগচি ওর খুব পরিচিত। এর আগেও সে অনেকবার এখানে উঠেছে। দরজা খুলে দেখল বাগচি এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটু তফাতে অর্চনা এবং মধুশ্রী। বাগচি বলল, 'দাদা, আপনার নাক ডাকার জন্যে এঁরা ঘুমাতে পারছে না। আমার কাছে কমপ্লেন করেছেন। আমি এসেও শুনলাম। আসলে এঁদের যে অন্য ঘরে শিফট করব তারও উপায় নেই। সব ঘর ভর্তি।'
তখনও ঘুমের ঘোর যায় নি। কিন্তু লজ্জা আসতে বিলম্ব করে নি। মাস চারেক অর্চনার মুখে অভিযোগ শুনে শুনে সে ধাতস্থ ছিল। কোনোরকমে বলেছিল, 'দুঃখিত।'
এক ভদ্রলোক বললেন, 'দূর মশাই, আপনার দুঃখ প্রকাশে আমাদের কিছু এসে যায় না। বাইরে বেড়াতে এসে যদি না ঘুমোতে পারি তাহলে কেন আসা। ঢের নাক ডাকা শুনেছি এ যেন জেনারেটারের বাবা। হয় নাক ডাকা থামান নয় ঘর ছেড়ে দিন। স্পষ্ট কথা।'
বাগচি উপায় বাতলালো, 'কালকে এয়ারকন্ডিশন্ড রুম খালি হবে। ইচ্ছে করলে ওখানে চলে যেতে পারেন। কেউ ডিস্টার্বড হবে না।'
অবনীশ অর্চনার দিকে অসহায় চোখে তাকিয়েছিল। তার চোখে আগুন। আর মধুশ্রী তীরের মতো ছিটকে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে। নিশ্চয়ই কান্না চাপতে পারে নি।
সে রাত্রে খুব কষ্ট করে জেগেছিল অবনীশ। রাত জাগা তার ধাতে সয় না।

শীতাতাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে নি, সকালের ট্রেন ধরে ফিরে এসেছিল ওরা কলকাতায়। বাড়িতে ঢুকে প্রথম কথা বলেছিল অর্চনা, 'আর যদি তোমার সঙ্গে কখনও বাইরে যাই, ছি ছি, কি লজ্জা।'

অবনীশ অসহায় গলায় বলেছিল, 'আমি কি করব বলতে পার? আমি কি ইচ্ছে করে নাক ডাকি? আগে কখনও ডাকতাম?'

'অবিশ্বাস! অবিশ্বাসীদের শাস্তি হবে না? হায় ভগবান!'

বিয়ের পর এই প্রথম অর্চনা ভগবানকে ডেকে বিলাপ করল। ও যে ইঙ্গিতটা করল তা নিয়ে অনেক ভেবেছে সে। মিরাকালে সে কখনও বিশ্বাস করে না। ঈশ্বর কিংবা একটি অদৃশ্য শক্তি আছে এটুকুই সে জানে। কিন্তু মানুষের ভক্তি এবং দুর্বলতা নিয়ে যারা জ্ঞান দেয় তাদের দুচোখে দেখতে পারে না। কিন্তু অর্চনা অঙ্ক করে দেখানোর মতো প্রমাণ করতে চেয়েছে ঠিক সেই ঘটনার পর থেকেই তার শরীর থেকে এইসব শব্দ বের হচ্ছে।

এক বছর আগে ওরা উত্তর বাংলায় বেড়াতে গিয়েছিল। খুব জমেছিল সেবার। ঘুরতে ঘুরতে একটা ফরেস্ট বাংলোয় শেষ দু'দিনের জন্যে উঠেছিল ওরা। সঙ্গে একটা ভাড়া করা গাড়ি থাকায় ডুয়ার্সটাকে চষে বেড়াতে সুবিধে হয়েছিল। ফরেস্ট বাংলোয় বৃষ্টি নেমেছিল। সারাদিন বারান্দায় বসে জঙ্গল দেখা। অবনীশের মনে হয়েছিল এর চেয়ে স্বর্গসুখ আর কোথায় পাওয়া যাবে? চৌকিদারের সঙ্গে আলাপ করে অর্চনা জেনেছিল মাইল চারেক দূরে ঠিক জঙ্গলের মুখে একটা জাগ্রত শিবমন্দির আছে। সেই শিবের নাকি অন্ত নেই। মাটি খুঁড়েও তার শেষ পাওয়া যায় নি। যেন পাতাল থেকে ওই শিবলিঙ্গটি সরাসরি পৃথিবীর বুকে উঠে এসেছে। কয়েক শ' বছর আগে কেউ স্বপ্নে আদেশ পেয়ে দেবতাকে আবিষ্কার করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। এসব শোনার পর অর্চনা জেদ ধরল সে মন্দির দেখতে যাবেই। অবনীশের নড়াচড়া করতে ইচ্ছে করছিল না। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি ঝরছে জঙ্গলের ওপর। সামান্য ঠান্ডা হাওয়া বইছে। বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে সেদিকে তাকিয়ে সিগারেট খাওয়ার চেয়ে আরাম আর কিসে পাওয়া যাবে? কিন্তু দুপুরের পর বৃষ্টিটা বিশ্বাসঘাতকতা করল। যদিও আকাশ মেঘে ঢাকা কিন্তু কেমন একটা হলদে আলো জঙ্গলের গায়ে কেউ মাখিয়ে দিল। আর তখন থেকেই বায়না ধরল অর্চনা, বেরিয়ে পড়া যাক।

কয়েক শ' বছরের পুরনো মন্দির, শুধু এটুকু দেখার জন্যে শেষ পর্যন্ত অবনীশ বেরিয়েছিল। বড় রাস্তায় পৌঁছবার আগেই জঙ্গলের মধ্যে চমৎকার পরিস্কার জায়গায় মন্দিরটা দাঁড়িয়ে। চারপাশে নানান রকমের ফলের গাছ। এদিকে নারকোল বড় একটা চোখে পড়ে না কিন্তু এই মন্দিরের চত্বরে নারকোল গাছ যেন ছেয়ে আছে। ড্রাইভার বলেছিল, 'খুব জাগ্রত দেবতা স্যার। শিবরাত্রির সময় দশ-বারো হাজার লোক এখানে আসে।' কিন্তু সেই দুপুরে কোথাও মানুষ নেই। কাছাকাছি জনবসতি আছে বলেও মনে হয় না। শুধু পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই, একটাও মানুষ চোখে পড়ছে না।

গেটের কাছে ওরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। মধুশ্রী বলেছিল, 'ফ্যান্টাস্টিক, যেন

হন্টেড হাউসে ঢুকছি।' অর্চনা ধমকে উঠেছিল, 'আঃ, মন্দির সম্পর্কে ওসব বলতে নেই।' অবনীশ ফোড়ন কেটেছিল, 'হুঁ, দেবতার বাড়ি বলেই মনে হচ্ছে।' সত্যিই মন্দিরটার বিশেষত্ব আছে। যতটা না মাটির ওপরে তার চেয়ে বেশি যেন মাটির নিচ থেকে গেঁথে তোলা। সিঁড়িগুলো পাথরের, পাক খেয়ে নিচে চলে গিয়েছে। বাইরে জুতো খুলে ওরা নিচে নামল। বড় বড় পাথর সুন্দর করে সাজিয়ে সিঁড়ি তৈরি। পায়ের তলায় সেগুলো ঠাণ্ডা হিম। যত নিচে নামছে তত একটা স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ নাকে আসছে। আবছা অন্ধকার সামনে। তারপর সিঁড়িটা শেষ হতেই আলো চোখে এল। এ আলোর ছায়া বেশি মেশানো। ঠিক মাথার ওপরে মন্দিরের চুড়োয় যে কাঁচের আড়াল, আলো আসছে সেটা চুঁইয়ে। নিচে বিশাল চাতাল। চাতালের ঠিক মাঝখানে খানিকটা গর্তের মধ্যে শিবলিঙ্গ। পাথরের ফাঁক গলে জল এসে পড়ছে লিঙ্গের মাথায়। পরিবেশ বড় চমৎকার। ফুল আর বেলপাতায় গর্তটি প্রায় ঢাকা। অর্চনা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। অবনীশ ইতস্তত করছিল। এইসময় খড়মের শব্দ হলো। বন্ধ ঘরে সেই শব্দ চতুর্গুণ হয়েছে। মুখ ফিরিয়ে অবনীশ দেখল এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীগোছের মানুষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। লোকটির চেহারায় এমন একটা সৌম্যভাব আছে যে মুগ্ধ হয়ে তাকাতে হয়। চোখাচোখি হতে বৃদ্ধ হাসলেন। ওর পাকা লম্বা দাড়িটিকে যেন সেই হাসি আরও মোহন করে তুলল। বৃদ্ধ বললেন, 'শুভ হোক। আমি এই মন্দিরের সেবক।'

অর্চনার ভক্তি বেশি। সে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল কিন্তু পুরোহিত এক পা পিছিয়ে গেলেন, ছি ছি মা। দেবতার সামনে কোনো মানুষকে প্রণাম করতে নেই। তোমার শুভ হোক।' অর্চনা লজ্জিত মুখে অবনীশের দিকে তাকাল, ভাবটা এমন, দেখেছ, কি সুন্দর মানুষ।

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি অনেক দূর থেকে এসেছ?'

অর্চনা বলল, 'না। আমরা পাশের ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছি, সেখান থেকেই এলাম।'

'ও। কিন্তু এখন তো পুজো হয়ে গেছে। তা তোমরা যখন এলে তখন ভোগ গ্রহণ করো। এসো।'

অবনীশ আপত্তি করল, 'দেখুন, আমরা লাঞ্চ খেয়ে এসেছি এখন আর কিছু খেতে পারব না।'

পুরোহিত হাসলেন, 'এ তো খাওয়া নয়, এ গ্রহণ। কোনো অসুবিধে হবে না।'

অবনীশ বলল, 'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমরা প্রণামী দিয়ে যাচ্ছি।'

বৃদ্ধ পুরোহিত মাথা নাড়লেন, 'চমৎকার! এসো। আমরা বাইরে গিয়ে বসি।'

ওরা ওপরে উঠে এলো। মেঘ আরো নিচে নেমে এসেছে। পুরোহিতের পেছনে হেঁটে ওরা মন্দিরের ওপাশে যেতেই একটি ছোট্ট ঘর দেখতে পেল। ঘরটির সামনে মাটিতে কাঠ পুঁতে বেঞ্চি করা হয়েছে। বৃদ্ধ ওদের সেখানে বসতে বলে নিজে ঘরের দাওয়ায় আসন পেতে বসলেন। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেন এখানে এলে?'

অবনীশ অস্বস্তিতে পড়ল, 'অনেকদিনের পুরনো মন্দির বলে আগ্রহ হয়েছিল। তাছাড়া এদের উৎসাহ হয়েছিল, তাই—।'
'ঈশ্বর তোমাকে আকর্ষণ করেন না ?'
'তিনি আছেন কিনা তাই জানি না।'
'সেকি ! তিনি না থাকলে আমরা কোথা থেকে এলাম।'
'দেখুন, আমি কোনো কল্পিত দেবতার কথা বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি একটি অদৃশ্য শক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। সেটা কি তা জানি না। তবে ঠাকুর দেবতার চেয়ে মানুষের উপকার করলে বোধহয় বেশি পুণ্য হয়।'
'তার মানে একটা কিছু তোমার হওয়া দরকার। তাই না ? তখন প্রণামী দিতে চাইলে কারণ সেটা দিয়ে তুমি আত্মপ্রসাদ পেতে। আমার বয়স এখন পঁচানব্বই বিশ্বাস করো এসব প্রশ্নের উত্তর আমিই জানি না। সারাদিন দেবতা নিয়ে পড়ে আছি অথচ জানি না তিনি কি রকম দেখতে।
'দেবতাকে মানুষ তৈরি করেছে অতএব মানুষই দেবতা।'
'ঠিক বলেছ। তবে কিনা কোন্ মানুষ দেবতা কোন্ মানুষ নয় সেটা জানতে হবে, বিচার করতে হবে। ঠাকুরের সেই গল্পটা পড়েছ ? শিষ্যকে গুরু বলে গেল, ঈশ্বর ঈশ্বর করছিস সব জীবেই ঈশ্বর আছে। জীবে প্রেম দে ঈশ্বরকে পাবি। তাই শুনে শিষ্য লেগে গেল জীবে প্রেম দিতে। একদিন একটা পাগলা হাতি আসছিল পথে, শিষ্য এগিয়ে গেল সামনে। বলল, ওর মধ্যে ঈশ্বর আছে আমি ওকে প্রেম দেব।' পুরোহিত হাসতেই অবনীশ জানাল, 'আমি গল্পটা পড়েছি।'
'তাহলে বুঝতে হবে নির্বাচন করে নিতে। তাই না ?'
'নিশ্চয়ই !'
'সেক্ষেত্রে প্রথমেই না বলতে নেই। যাচাই করে নিতে হবে যে যেমন পারে। আমি ভোগ দিতে চাইলাম তুমি বললে খাব না পেটে খাবার আছে। কিন্তু চার ঘণ্টা বাদে তো তুমি বলতে পারবে না খিদে নেই। তা সেই সময়টার জন্যে ভোগ নিয়ে যেতে পারতে। আবার ভোগ বলতে যা খেতে হবে সেটা তো এখনও চেয়ে দ্যাখোনি, তোমার রুচিতে মিলবে কিনা তাও তুমি জানো না। তাহলে সেটা বাতিল কর কি করে ?'
অবনীশ বলল, 'আমি কিছু ভেবে বলিনি। তাছাড়া ধর্মস্থানে এলে প্রণামী দেওয়া নিয়ম। আপনি ব্যাপারটাকে অনাবশ্যক জটিল করে তুলেছেন।'
বৃদ্ধের মুখ ম্লান হলো, 'আমি দুঃখিত। আসলে কি জানো, বয়স হয়েছে, সব সময়ে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যাই।'
অবনীশ হাসল, 'সে তো হবেই। আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। আপনি একটু আগে সত্যি কথা বলেছেন, আমরা আমাদের কর্মফলের জন্যে দায়ী।'
বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'তাই কি ? সব কর্মফলের জন্যে কি সেই মানুষ দায়ী হয় ?'
'হয় না ? আমার কর্মের জন্যে অন্য কেউ দায়ী হবে ?'

'হতেও পারে। যার জন্যে তোমাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে তার জন্যে তুমি দায়ী নাও হতে পার। এই যে, আবার জল নামছে। তোমরা এখানে কতদিন আছ?' বৃদ্ধ এবার অর্চনার দিকে তাকালেন।
অর্চনা বলল, 'কাল সকালেই চলে যাব।'
বৃদ্ধ বললেন, 'শুভ হোক। তোমরা আর দেরি করো না, খুব জল আসছে।'
ওরা উঠে দাঁড়াতেই বৃদ্ধ বললেন, 'খালি হাতে মন্দির থেকে ফিরে যাবে এটা আমার একটুও ভালো লাগছে না। কিছু একটা দিতে ইচ্ছে করছে যে, না, না, প্রণামী দিতে হবে না।'
আর ঠিক তখনই মাথার ওপরে শব্দ হতেই অবনীশ মুখ উঁচু করল। তৎক্ষণাৎ সে চোখের সামনে কিছু নেমে আসতে দেখে মুখ সরিয়ে নিতে গিয়েও পারল না। বস্তুটি তার মুখে সামান্য আঘাত করে মাটিতে পড়ে জল ছিটোল। দু'-হাতে নাক চেপে ধরেছে অবনীশ। সন্ন্যাসী ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। অর্চনা উদ্বিগ্ন। দেখা গেল শেষ মুহূর্তে সরিয়ে নেওয়ায় আঘাত খুবই সামান্য। একটু ছড়ে যাওয়া ছাড়া কোনো দাগ নেই, দুই ভুরুর মাঝখানে একটু টনটন করছে। অবনীশ হেসে বলল, 'খুব জোর বেঁচে গেছি।'
বৃদ্ধ হাসলেন, কিন্তু আমি 'পেয়ে গেলাম। তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করছিল অথচ ঘরে কিছুই ছিল না। আমাকে তোমার ভালো লেগেছে বললে আর খালি হাতে ফিরে যাবে, তা কি হয়?' মাটি থেকে নারকোলটা কুড়িয়ে তিনি অবনীশের হাতে তুলে দিলেন, 'ভেঙে খেয়ো। জল সুমিষ্ট, শাঁস সুস্বাদু।' তারপর আচম্বিতে মন্দিরের দিকে চলে গেলেন বৃদ্ধ পুরোহিত।
অর্চনা যখন অনুভব করলো আঘাতটা ক্ষতি করবে না তখন বলল, 'বেশ হয়েছে, নাস্তিকেদের এরকমই হওয়া দরকার। তোমার জন্যে আমাদের ভোগ খাওয়া হলো না।'
অবনীশ অনেক কিছু বলতে পারত। কিন্তু সে শুধুই হাসল।
ওরা ফিরেছিল দার্জিলিং মেলে। সন্ধেবেলায় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপেছিল। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া যায় নি, অনেক কষ্টে তিনটে থ্রিটিয়ার পেয়েছিল ওরা। গল্প করে খাওয়া সারতেই কামরায় ঘুম। ওরা শুয়ে পড়েছিল। তার পরেরটা অর্চনার মুখে শোনা। গাড়ি তখন ছুটছে। চাকার শব্দে কান তৈরি। হঠাৎ ওর মনে হলো আর একটা শব্দ হচ্ছে। ঠিক চাকার শব্দের সঙ্গে মিশে রয়েছে সেটা। একটা বীভৎস গোঙানি চলছে সমানে। গাড়ির দুলুনি সত্ত্বেও অর্চনার ঘুম আসছিল না। এইসময় মালদা স্টেশনে গাড়ি থামতেই মনে হলো একটা আদ্যিকালের জন্তু যেন কামরায় ঢুকে পড়ে গোঙানি শুরু করেছে। মালদায় হৈ-চৈ করতে করতে উঠেছিল কতগুলো খোলোয়াড় ছেলে। শব্দ শুনে তাদের একজন চিৎকার করে উঠল, 'টাইগার টাইগার। সুন্দরবন থেকে পথ ভুল করে এসেছেন কোন্ দাদা?' আর একজন বললো, 'এই রকম নাক ডাকলে তো ঘুম হবে না।'
অন্য গলা বলল, 'আমার মাইরি মালের নেশা কেটে যাচ্ছে, দাদার একটা ছবি

তুলে রাখ।'

ততক্ষণে অর্চনার খেয়াল হয়েছে। শব্দটা আসছে মাথার ওপর থেকে। সে নিচে, মানে মধুশ্রী, ওপরে অবনীশ। ধড়মড় করে উঠে পড়ল অর্চনা। আধা অন্ধকারে অবনীশের মুখটা বিস্ফারিত, শব্দটা উঠছে ওর মুখ থেকে। প্রচণ্ড ঠেলা দিতেই হকচকিয়ে উঠল। তারপর অত্যন্ত বিরক্ত গলায় বলল, 'কি হলো? ঘুম ভাঙালে কেন?'

অবনীশের মুখটা এখন স্বাভাবিক। কিন্তু অর্চনা কথা বলতে পারছিল না। এইসময় পাশের বাঙ্কের লোকটি বলল, কাৎ হয়ে শোন, চিৎ হলে বেশি নাক ডাকে।'

সেই শুরু। বাড়িতে ফিরে অর্চনা ঘর পাল্টালো। ওরকম বীভৎস শব্দের সঙ্গে সে রাত কাটাতে পারবে না। শুধু শব্দ নয়, সেই মুহূর্তে মুখের দিকে তাকালে নাকি শিউরে উঠতে হয়। অবনীশ এই নিয়ে অনেক চিন্তা করেছে। কি কি কারণে নাক ডাকে? যার নাক ডাকে সে সেটা টের পায় না কেন? কি উপায়ে এই নাক ডাকা বন্ধ করা যায়? পাশ ফিরে শুয়ে, উপুড় হয়ে শুয়ে কিংবা হাঁ করে জিভ বের করে শুয়ে সে দেখেছে কিন্তু কিছুতেই কাজ হয় নি। ওর এক ই. এন. টি স্পেশালিস্ট বন্ধু সমস্যা শুনে হেসেই উড়িয়ে দিল, 'দূর' এদেশে এটা কোনো সমস্যা নাকি? তোমার নাকের ভেতরে এমন একটা গ্রোথ হয়েছে যা স্বাভাবিক নিঃশ্বাসকে বাধা দিচ্ছে বলে শব্দটা বাড়ছে। সেটা অপারেশন করে বাদ দিলে আবার স্বাভাবিক নিঃশ্বাস পড়বে।'

অবনীশ ঠিক করেছিল অপারেশন করাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক বন্ধু জানালো, 'তুমি ক্ষেপেছ? অপারেশন করালেই নাক ডাকা থামবে? তাহলে য়ুরোপ আমেরিকায় এত ডিভোর্স হতো না। সেখানে তো চিকিৎসাশাস্ত্র অনেক উন্নত।'

কথাটা ঠিক। মনে লেগেছিল অবনীশের। কিন্তু ছবিটা? ওই যে নেকড়ের মতো বীভৎস মুখ ফুটে উঠেছে সেটা কি তার? অপারেশন করে নাক ডাকা যদিও বন্ধ করা যায় কিন্তু ওই মুখটাকে কি করে সরানো যাবে?'

দিনের বেলায় অর্চনা অন্যরকম। খুব স্বাভাবিক কথাবার্তা। রাত্রে শোওয়ার পরই যেন তটস্থ থাকে। এক দিনের বেলায় অর্চনা বলল, 'শিবমন্দিরের পুরোহিতকে অপমান করেছিলে বলেই তোমার এই অবস্থা। একমাত্র তিনিই পারেন একটা বিহিত করতে।'

কথাটা অবনীশ পছন্দ করল। কারণ সে কাউকে অপমান করে নি। কিন্তু পুরোহিতের একটা কথা তার মনে পড়ল। সব কর্মফলের জন্যে কি সেই মানুষ দায়ী হয়? এই যে নাক ডাকছে, মুখ বীভৎস হয়ে উঠছে এর জন্যে সে দায়ী? না তো। তাহলে সন্ন্যাসীর সেই কথাটাই সত্যি।

অফিস থেকে একটা দল ডেপুটেশন যাচ্ছে বাইরে। খুব খুঁটিয়ে নির্বাচন করা হয়েছে। অবনীশ সেই দলে আছে। চেয়ারম্যান নাকি বলেছেন যে উদ্দেশে যাওয়া তা যদি সফল হয় তাহলে প্রমোশন অনিবার্য। অবনীশের সম্ভাবনা

সব চেয়ে বেশি। কিন্তু যাওয়ার দিন গুটিয়ে গেল অবনীশ। ট্রেনে যেতে হবে। ফার্স্ট ক্লাসে যার সঙ্গে রাত কাটাতে হবে সে কি রিপোর্ট দেবে? যে হোটেলে থাকবে সেখানে যদি একা ঘর না পাওয়া যায় তাহলে হয়ে গেল। চেয়ারম্যানের কাছে সহকর্মীরা লাগাবেই যাতে তাকে ডিঙিয়ে ওরা প্রমোশন পায়। অবনীশ অসুস্থ বলে দরখাস্ত করল রেহাই-এর জন্যে। দরকার নেই প্রমোশনের, সি সি রোল একবার খারাপ হলে চিরটাকাল নষ্ট হবে।

কিন্তু অবনীশ বুঝতে পারছিল সে ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছে। তার কোনো অসুখ ছিল না, অসাফল্য ধারে কাছে ছায়া ফেলে নি কখনও। কিন্তু নিজের শরীর তার অজান্তে শত্রু করে তুলছে আশেপাশের মানুষকে। অথচ এর জন্যে সে কিছুতেই দায়ী নয়। এখন সারাদিন তার মাথায় একটাই চিন্তা পাক খায়। ঘুমুলে মুখ বীভৎস হয়ে যায় কেন?

রাত্রে প্রচন্ড চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল অবনীশের। চোখ মেলে দেখল বাড়ির পোষা কালো বেড়ালটা পিঠ বেঁকিয়ে লেজ ফুলিয়ে হিংস্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর জানলায় অর্চনা আর মধুশ্রীর মুখ। দরজা বন্ধ থাকায় ওরা ঘরে ঢুকতে পারে নি। ব্যাপারটা জানা গেল। আজকে অতিরিক্ত শব্দ করছিল অবনীশের নাক। পাশের ঘরে থেকেও অর্চনা ঘুমুতে পারছিল না। হঠাৎ তার মনে হলো আর একটা শব্দ মিলেছে ওই সঙ্গে। তাড়াতাড়ি উঠে এসে জানলা দিয়ে উঁকি মারতে দেখতে পেল কালো হুলোটা অবনীশের মুখের সামনে খাটের ওপর দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছে। নাক থেকে বের হওয়া শব্দটাকে প্রতিপক্ষ ভেবে সে শরীর ফোলাচ্ছে। ঠিক দুটো হুলো যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করে সেই রকম মনে হচ্ছিল। বেড়ালটার গোঙানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অবনীশ নাকি গর্জন করছিল। আর সেই মুহূর্তে অবনীশের মুখ অবিকল হিংস্র বেড়ালের মতো হয়ে গিয়েছিল।

বেড়ালটা যেন এতক্ষণ সম্মোহিত ছিল, অবনীশ উঠে বসতে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে খাট থেকে নেমে গেল।

পরদিন সকালে অর্চনা বলল, 'এভাবে থাকা যায় না। তুমি ডাক্তার দেখাও।' অবনীশের মনে পড়ল বিলেত আমেরিকার কথা। থাকা যায় না বলতে অর্চনা কি বোঝাচ্ছে? কিন্তু মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তার পেটে বাতাস হয়ে গেল, শরীর দুর্বল লাগে, মাথায় শুধু একটাই চিন্তা পাক খায়। ঘুমুলে তার মুখ বীভৎস হয়ে যায় কেন? আর এই সব ভাবতে ভাবতে অবনীশ রাতটা না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল। সকালে বাথরুমে ঢুকে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে চায়ের টেবিলে বসে সে দেখল অর্চনা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে যে ঘুমায় নি এটা অর্চনার জানার কথা নয়। কারণ ঘরের আলো নেভানো ছিল। সে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেখছ?'

'কিছু না!' অর্চনা ভাঙল না। কিন্তু অবনীশের বুঝতে অসুবিধে হয় নি যেহেতু কাল রাত্রে কোনো শব্দ অর্চনার কানে যায় নি তাই সে অবাক হয়েছে।

সারাটা দিন শরীর ম্যাজম্যাজ করল অবনীশের। অফিসে ছুটির দরখাস্ত

করায় তার কিছুই করার নেই। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হাই উঠছিল। রাত্রে বিছানায় গিয়ে সে সতর্ক থাকল। ঘুমে চোখ জুড়িয়ে এলেও সে ঘুমাচ্ছিল না। পায়চারি করে, জানলায় দাঁড়িয়ে একসময় রাতটা কাটিয়ে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

পাঁচ দিনের মাথায় অর্চনা বলল, 'আলাদা ঘর করে মুশকিল হয়েছে।'

'কেন ?'

'এখন তোমার ঘরে ফিরে যেতে লজ্জা করছে ?'

'হঠাৎ ফিরবে কেন ?'

'তুমি একদম ভালো হয়ে গিয়েছ। জানো, প্রথম রাত্রে যখন তোমার নাক ডাকার শব্দ পেলাম না আমি ঘুমতে পারিনি।'

'কেন ?'

'বাঃ, অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে।'

'তাহলে আলাদা শোওয়াই ভালো। আমারও একা শোওয়া অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। তুমি পাশে এলেই নাক ডেকে উঠবে।'

অর্চনার মুখ ভারী হলো। কিন্তু অবনীশের কিছুই করার নেই। সাতদিন হলো সে রাত্রে ঘুমাচ্ছে না। প্রথম প্রথম যত কষ্ট হতো এখন আর তা হয় না। এখন চুপচাপ শুয়ে থাকলেও ঘুম আসে না চোখে। সারারাত দিব্যি বই পড়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। সকালে স্নান করলেই শরীর ফিট। এখন আর নাক ডাকছে না, মুখ বিকৃত হচ্ছে না। দিনরাত খুব সহজেই জেগে থাকা যায়। ক্লান্তি বোধ করলে সামান্য শুয়ে পড়লে সেটা দূর হয়। এতকালের অভ্যস্ত জীবনের বাইরে বেরিয়ে এসে এখন আর কষ্ট হয় না। বরং তার ওজন বেড়েছে এক কেজি। এরকম উদ্বেগহীন জীবন আর কখনও কাটায় নি সে।

কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে আর একটি বিপত্তি ঘটল। অবনীশের ভুঁড়ি বেড়ে যাচ্ছে। মুখে মাংস হচ্ছে। হু হু করে ওজন বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সে খাওয়া কমাল। সকালে দুটো রুটি আর রাত্রে দুটো। সারা দিনে চা আর সিগারেট। প্রথম দু-তিনদিন খুব কষ্ট হলো। সারাদিন খিদে পায়। শেষপর্যন্ত তাও সয়ে এল। একদিন সময় ছিল না বলে দিনের বরাদ্দ রুটি খায়নি অবনীশ। বিকেলে আবিষ্কার করল তাতে কিছু অসুবিধে হচ্ছে না। অবনীশ শেষ পর্যন্ত সারাদিন একটি রুটিতে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য তাতে বেশ চলে যাচ্ছে। ওজন আর বাড়ছে না, কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

জীবনের অভ্যস্ত চেহারাটাকে পাল্টে দিয়ে অবনীশ একদিন চলে এল উত্তর বাংলায়। শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি ভাড়া করে হাজির হলো সেই শিবমন্দিরে। সেদিন ও মেঘের দুপুর। চারপাশে জনমানব নেই। পাখি ডাকছে নির্জনে। গাড়ি থেকে নেমে সে মন্দিরে নেমে এলো। পুজো শেষ করে পুরোহিত তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। অবনীশ অবাক হলো। সেই চেহারা নেই। সেই সৌম্য শান্ত চেহারাটি হারিয়ে গেছে। সাদা দাড়ি আর আকৃতি দেখলে বোঝা যায় সেই মানুষ।

অবনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'আমায় চিনতে পারছেন ?'
'একটু সত্র দিন। এত লোক আসে রোজ। সবাইকে মনে রাখা সম্ভব নয়।'
'আপনি খুব মোটা হয়ে গিয়েছেন।' অবনীশ জরিপ করছিল।
'আপনি কে ?'
'আমি ? আপনার পুজো হয়ে গিয়েছে ?'
'হ্যাঁ। আপনি পুজো দেবেন ?'
'না।' অবনীশ কথাটা বলে চমকে উঠল। লোকটি চোখ বন্ধ করতেই তাকে কেমন বীভৎস দেখাল। ওর মনে পড়ে গেল তার তিনটে ছবির কথা। অবিকল।
'প্রণামী নেবেন ?'
'দিন।' হাত পাতল সন্ন্যাসী।
'আপনি সারাদিন কি করেন ?'
'কি আর করব। খাই আর ঘুমোই। আর জেগে থাকলে পুজো করি।'
অবনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষ কি তার কর্মফলের জন্যে দায়ী ?'
লোকটি হাসল, 'হ্যাঁ। যার বোঝা তাকেই তো বইতে হবে।'
অবনীশ জিজ্ঞাসা করল আবার, 'মানুষ কি নিজেকে সংশোধন করতে পারে না ? অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না ? আপনি কি বলেন ?'
পুরোহিত বলল, 'কি জানি !'
অবনীশ আর কথা বলল না। মন্দির থেকে বেরিয়ে সে নারকোল গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। জায়গাটা একটুও পাল্টায় নি। কিন্তু লোকটা বদলে গেল কি করে ?
সন্ন্যাসী পেছনে এসে দাঁড়াতেই সে বলল, 'আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'
'কি প্রস্তাব ? আমি এখন বিশ্রাম করব।'
'আপনি আমার বাড়িতে চলে যান, আমি এখানে থাকি।'
'কেন ?'
'এখানে বেশ আরাম।'
'আরাম ? রোজ খাবার জোটে না।'
'আমি খাই না।'
'মাঝে মাঝে জন্তু-জানোয়ারের হামলায় ঘুম চোটে যায়।'
'আমি ঘুমুই না।'
'জোয়ান মানুষ। স্ত্রী কিংবা মেয়েছেলে—'
'ওসব একবছরের বেশি ছেড়ে দিয়েছি।'
লোকটি এবার ক্ষিপ্ত হলো, 'তোমার ধান্দাটা কী ? তুমি কি সন্ন্যাসী ?'
অবনীশ মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'কি জানি, হয়তো। তবে আমার আর নেকড়ের মুখ নেই।' তারপর সে চুপচাপ হেঁটে এসে গাড়িতে উঠল।

আশ্চর্য প্রদীপ

নি নি রোদ্দুরে ছেলেটা হাঁটছিল। শামবাটির খাল পেরিয়ে রাস্তাটা দুদিকে চিরে গেছে। লাল ধুলো এখন উড়ছে না, এইসময় বাতাস বড় দুর্বল থাকে। তেলে গন্ধ ওঠা গামছাটা মাথা থেকে খুলে ও শরীরের ঘাম মুছল। এটা ও কখনোই করতে চায় না কারণ শরীরের ঘাম কাপড়ে মুছলে সেটা কালো হবেই কারণ ঘামে শরীরের রঙ থাকে। বাবুদের বেলায় ঠিক উল্টোটা হয়। ওর এক একসময় ইচ্ছে করে এই গামছায় কোনো বাবু তার গায়ের ঘাম মুছুক, এটা খানিক ফরসা হোক। কিন্তু যা গন্ধ, বাবুরা নেবে কেন ? মা বলে বাবুদের গায়ে নাকি ফুলের সুবাস থাকে বোতলে বিক্রি হয়।

এক হাতে টিনের ক্যানটা নিয়ে অন্য হাতে কপাল ঘষতে ঘষতে সে মোড়টায় এসে দাঁড়াল। কোন্ দিকে ওরা ? আজ সকালে মাকে বাপ বলেছিল যে ট্যুরিস্ট লজে স্যুটিং পার্টি এসেছে, জোর পান বিক্রি হচ্ছে। তারা নাকি এদিকটায় মাঠ ঘাটে স্যুটিং করে বেড়াচ্ছে। এর আগে একবার পৌষালির সামনে স্যুটিং দেখেছিল সে মায়ের সঙ্গে। ফরসা ফরসা বাবুরা মেয়েদের সঙ্গে কেমন কেমন কথা বলছিল আর সে সব কথা ক্যামেরা দিয়ে লোকজন ছবি করে নিচ্ছিল। মা বলে সেগুলোন নাকি সিনেমা হলে বই হয়ে আসবে। মার সিনেমা দেখার বড় শখ, বাপ পয়সা দিতে চায় না। বলে মেয়েছেলের হাতে পয়সা দিলেই সংসারে সব্বোনাশ হয়। মা বলে তার বাকীটা কি থাকল—কোনরকমে দুবেলা ভাত গেলা ছাড়া এ সংসারে আর নতুন কিছু হলো না। বাপ বলে, তাই পায় কজন ! এই যে আমি ঘরে বসে ফুর্তি করি তা কি নিজের পয়সায় ? তালতোড়ের গগনখুড়ো দেয় বলেই তো খাই ! খেয়ে ঘরে থাকি ! মা বলে, ছেলে পাশ দিয়ে দুই কেলাসে উঠল—তার বইটই কেনো অন্তত। বাপ বলে, কত বড় মানুষ কিনতে'পারছে না আমি তো ছার। ছাপা নেই বই—ছাপা হয় যেখানে সেখানে হরতাল। তা তোমার ছেলে একা নাকি—দুনিয়া শুদ্ধ পড়াশুনা হবে না এখন।

তাই ও বালাই নেই। পড়তে ভালোও লাগে না তার। তার চেয়ে শামবাটির পুকুরে মাছ ধরা ভালো কিংবা ডিয়ার পার্কে ঘুরে বেড়ান। এখন তাই মোড়ে দাঁড়িয়ে গোড়ালি উঁচু করে ও দুপাশে তাকাল। স্যুটিং পার্টি গেল কোথায় ! তারা মানেই তো ভিড় আর একটা গাড়ি। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না তো। বাপটা সত্যি বলল তো ? ডানদিকের প্রান্তিকের রাস্তাটা ধরলেই হয়, রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানটায় জমি বেশ উঁচু আশেপাশের অনেকটা তল্লাট দেখা যায়। চোখ আড়াল করে সূর্যটা দেখল ও। তিনটের পর গগনখুড়ো আর ভাঁটিতে থাকে না। তখন যাওয়া মানে শূন্য হাতে ফিরে আসা। ক্যান খালি মানে বাপ বাখারি ভাঙবে তার পিঠে—আর কি কি হবে ভাবতে গিয়ে

শিউরে উঠে ও সোজা বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরলো। মদ না খেলে বাপটা মাইরী দুঃশাসন হয়ে যায়। যাত্রায় দেখেছে সে, বোলপুরের গণেশ মুদি খুব ভালো দুঃশাসন সাজে, ইয়া বড় গোঁফ। বাপটার অবশ্য গোঁফ নেই, এই যা।

গোয়ালপাড়ার পথটা ধরে এগিয়ে চলল সে। খালি গা, দড়ি দিয়ে হাফ প্যান্ট বাঁধা, হাতে টিনের ক্যান। লাল ধুলো পথ ছেড়ে হাঁটু অবধি রাঙিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মধ্যে ইঁটখোলায় লরি যায় এ পথ দিয়ে। তখন বাতাস দেখে পালাও, পালাও। লাল মেঘ হাত পা নেড়ে তেড়ে আসে যেন। ডানদিকে ধেনো জমির ফাটল দিয়ে গরম নিঃশ্বাস উঠছে। মা লক্ষ্মী পাতালে বন্দী হয়ে কাঁদছেন এখন। শুখনো মাটি শুধু ফাটছে আর ফাটছে। ভুলেও কেউ জমি মাড়ায় না এখন, একটা দেশলাই কম করে জেলে দাও আর সঙ্গে সঙ্গে খরগোসের মতো আগুনটা চারধারে শুকনো ঘাস বেয়ে দৌড় মারবে। বাঁ দিকে বাবলাগাছ আর বাঁজা তালের সরু ছায়া। ছেলেটা রোদে পুড়তে পুড়তে হাঁটছিল। পুজোর সময় বাপের মেজাজ ছিল রুক্ষ। শালা ভাটিখানা ভেসে গিয়েছিল জলে। কোপাইটার কি গর্জন তখন। ওরা সব শামবাটির মুখটায় দাঁড়িয়ে হাঁ হয়ে দেখেছিল। এই গোয়ালপাড়া, তালতোড়, প্রান্তিক ওই সর্পলেহনা—সব জলের তলায়। হুস হুস করে জল উঠছে—এইসব ধুলোগুলোন তখন কোথায় হাওয়া। জলের কথায় সে রাস্তার ধারে সরে এলো। তারপর এক হাত প্যান্ট সরিয়ে জলত্যাগ শুরু করল। যাঃ বাবা, এখন মাটির খাই দ্যাখ, হাঘরের মতো সব শুষে নিচ্ছে—একটুও কাদা হতে দিচ্ছে না। শেষ হয়ে গেলে সেখানটায় একটা ভেজা দাগ রয়ে গেল। সে থুতু ফেলে ঘুরে দাঁড়াতেই দূরে ধুলোর ঝড় দেখতে পেল।

পথ থেকে নেমে দাঁড়াতে হ্যাট হ্যাট করে গরুর গাড়িটা সামনে এসে পড়ল। খালি গাড়ি যাচ্ছে বোলপুরে। গাড়োয়ানকে মুখে চেনে, চেঁচিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, স্যুটিং পার্টি কোথায়! গাড়োয়ান রা কাড়ল না, হাতের লাঠি মাঠের দিকে উঁচিয়ে ধরল। ছেলেটা সেদিক লক্ষ্য করে দেখল বুনো গাছ আর তালতোড় গ্রামের ঘরবাড়ির চাল ধানক্ষেত শেষ হলে উঁকি মারছে। তাহলে কি স্যুটিংটা তালতোড়ে হচ্ছে? দ্রুত পা চালাল সে গোয়ালপাড়ার পথে।

জলে এই গ্রাম ভেসে গিয়েছিল। যেসব দেওয়াল সামান্য পলকা আর বয়সে পুরোন সেগুলো ধুয়ে গিয়েছে। ঘর উঠেছে নতুন। এখন শুধু গাছের ডাল দেখলে বোঝা যায় জল কিরকম ছিল। শুখনো চালের খড়গুলো গাছের ডালে লটকে দোল খাচ্ছে। ছেলেটা গ্রামে ঢুকল। একটা লাথি মার ব্যাস সব শরীর লাল—এইসান ধুলো। সামনের চায়ের দোকান এখন বন্ধ। বাঁ দিকে একটা দাওয়ায় বসে হরি হাজাম গাল কামাচ্ছে একজনের। বাড়িঘরের মধ্য দিয়ে ও ডান পাশে ঘুরল। এক দাওয়ায় তালপাতার ওপর বুঁদে, তেলেভাজা আর শুকনো লেডিকেনি বিকোচ্ছে একটা বুড়ো। ছেলেটা বাঁ পকেটে হাত দিল, পাঁচটা পয়সা মায়ের কাছ থেকে এনেছে সে। এখন খাবে কি খাবে না দোটানায় পড়ল সে। তিনটে মোটকা মাছি এসে বুঁদেগুলো চেটে খেল একবার। বুড়ো হাত নাড়তেই লেডিকেনিতে বসল। ইস্, যদি মাছি হওয়া যেত—ছেলেটা

জ্বলজ্বল করে সেদিকে চাইতেই বুড়ো খনখনিয়ে বলে উঠল, 'ট্যাঁকে দশটা পয়সা আছে ?' ঘাড় নাড়ল সে, না। 'যা ভাগ্, মাল নেগে যা।' বুড়ো ভাগিয়ে দিল ঘাড় নেড়ে। দশ পয়সা আনতে হবে—তা সেটা পেলে এখানে আসবে কেন ? বোলপুর বাজারে কত কি পাওয়া যায়। একবার মুখ ভেংচে সে হাঁটা দিল।
গ্রামের যেখানে প্রায় শেষ সেখানেই ভাটিখানা। একটা ড্রামের তলায় গনগনে উনুন জ্বলছে সবসময়। দূর থেকেই গন্ধে মালুম হয়। প্রথম প্রথম বমি আসত ওর, এখন সহ্য হয়ে গিয়েছে, মার হয় নি। ওই একটা জায়গায় বাবা হার মানে। মদ খেলে বাপ ঘরে ঢুকতে পায় না। দাওয়ায় খাটিয়া পেতে চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকে। মা বলে মদের গন্ধ নাকি পেটের নাড়ি ছিঁড়ে ফেলে। ওর অতটা মনে হয় না তবে ঝাঁঝ লাগে বড়। উনুনের পাশেই চালাঘর। চালচুলো নেই লোকগুলো ভাঁড় নিয়ে মুখোমুখি বসে গিলছে তার তলায়। ওপাশের সিমেন্টের দাওয়া, তাতে ভদ্রলোক বসে। একপাশে তেলেভাজা বিক্রি হচ্ছে জোর। ওকে দেখে দাওয়া থেকে চিৎকারটা ভেসে এল, 'এই যে রামচন্দ্র, বড্ড দেরি করে ফেললে আজ।' গগনখুড়ো ডাকছেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ঠা ঠা করে হেসে উঠল, 'যা করেছেন। দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। সত্য সত্য সত্য।' তার গলা শুনে ছেলেটা বুঝল এর নেশা হয়েছে। গগনখুড়োকে আজ অবধি নেশা করতে দ্যাখে নি সে। চুপচাপ বসে থাকেন আর লোকে টাকা চাইলে কাগজে সই নিয়ে দুই টাকা দিয়ে দেন। ওকে দেখলেই তিনি রামচন্দ্র বলে ডাকবেন। তার নাম মোটেই রাম নয়। কিন্তু ডাকটা শুনতে খারাপ লাগে না ওর।
দাও হে জগু, চার ভাঁড় ঢেলে দাও রামচন্দ্রের কমন্ডুলুতে। গগনখুড়ো বলতেই জগুশুঁড়ী ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। মদোমাতালদের পাশ কাটিয়ে সে তার কাছে এগিয়ে যেতে একটা মাতাল চালাঘরে পা ছড়িয়ে বসে বলে উঠল, 'এ কিরে বাবা, দুধের ছেলেও মাল খায়। কলিকালে কি যে হলো।
জগুশুঁড়ি ধমক দিল, 'এ্যাই চোপ !
চার ভাঁড় দিয়ে ক্যানের মুখটা বন্ধ করে দিতেই গগনখুড়ো ওকে ডাকল। ক্যানটা এখন ভারী হয়েছে বেশ। ও পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াতে গগনখুড়ো তার সরু কাটি কাটি আঙুল দিয়ে ওর গালটা টিপে দিল। রোজই দেয়—বিশ্রী লাগে তখন। টিপে টিপে গগনখুড়ো বলল, 'দশরথকে বলবি, আজকের মালটা ভালো ছিল না। আমার সঙ্গে ফোরটুয়েন্টি করলে কি আর লাভ হবে ! আমি তো আর মালে জল দিই না, কি বল জগু ? তোর হলো জলের নেশা আমার শুখনো নেশা। শহর থেকে আমদানি হয় বলেই তোকে খাতির করি। বলবি কিন্তু—আমি কাল দেখা করব।' ও ঘাড় নেড়ে আস্তে আস্তে চলে আসছিল। এমন সময় কে যেন বলে উঠল, 'ও খুড়ো হিরোইনকে কেমন দেখলে ? স্যুটিং হচ্ছে শুনলাম তোমার গাঁয়ে ! 'হিরোইন !' গগনখুড়ো নাক ঝাড়লেন, 'একটা পাঁচিদাসীকে জুটিয়ে এনেছে—ও আবার হিরোইন নাকি ! বুক পিঠ সব এক। হ্যাঁ সে ছিল কাননবালা—লীলা দেশাই, রাতে ঘুম আসত না।'
তাড়াতাড়ি পা চালাল সে। তালতোড়ে স্যুটিং হচ্ছে তাহলে। এখন কোন্ পথে

যায় সে ঃ সেই শামবাটি হয়ে ঘুরে যেতে অনেকটা পথ। তার চেয়ে ডানদিকে কোপাই পেরিয়ে মাঠ ভেঙে ইঁটখোলার পাশ দিয়ে গেলে সময় বেশী লাগবে না। ও আর দেরি করল না।

কোপাই তখন শুকিয়ে মনে গুটিয়ে গিয়েছে। খানিকটা চড়া ফেলে একপাশে হাঁটুর তলায় জল নিয়ে কুলকুল করে বইছে। কে চিনবে পুজোর সময়কার নদীটাকে। জলে নামল সে। আঃ, বেশ ঠান্ডা—শরীর বেশ জুড়োয়। মজা করতে ও ক্যানের তলাটা জলের ওপর রাখতেই সেটাকে স্রোত সামান্য টানল। চট করে তুলে ধরল সে। বাপের মুখটা মনে পড়ল।

ভালো করে পা হাত ধুয়ে এপারে উঠল ছেলেটা। আল ধরে হাঁটা ঠিক নয় এখন। তেনারা সব গরম সহ্য করতে না পেরে আলের পাশে ঘাসের নিচে শরীর লুকোন। একটু শব্দ পেলেই অশ্বের মতো ছোবল ছুঁড়বেন রাগে। রাগটা যার ওপরই হোক ছোবল পেলেই শুয়ে পড়তে হবে। বরং শুকনো মাঠ দেখে হাঁটা ভালো। একটা মরা গাছের ডাল ভেঙে নিল সে। তারপর একহাতে ক্যান ধরে ডালটাকে মাটিতে হাঁকড়াতে হাঁকড়াতে চলল সে তালতোড়ের দিকে।

অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙে সে উঁচু ডাঙাটায় উঠে এলো। ওই তো তালতোড় গ্রাম। সামনে একগাদা বাবলা গাছের জঙ্গল সেটা পেরোলেই হলো। এই বিকেলের রোদ্দুরে কেউ বের হয় নি মাঠে। স্যুটিং পার্টির বাবুদের রোদ, লাগে না? অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল সে হঠাৎ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে চমকে গেল পা দুটো। সামনেই একটা বাবলা গাছের তলায় তিনি। তিনি নয়, ঠাওর করে বুঝল তেনারা। দুটিতে জড়িয়ে জড়িয়ে এক হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। কি শব্দ, বাস। যেন রাগে এ ওকে খায়। কিন্তু খাচ্ছে না তো! চট করে তার মনে পড়ল সাপে যখন লীলা করে তখন এরকমটাই হয়। সে দৃশ্য নাকি পৃথিবী আর ভগবান দেখে। মানুষের পাপ চোখে নাকি এসব পড়ে না। তবে যদি কেউ সত্যি সত্যি দেখে ফেলে তবে একটা নতুন কাপড় পেতে দিতে হয় তেনাদের জন্য। সেই কাপড়ে যদি তেনারা একবার গড়াগড়ি খান তাহলেই হয়ে গেল। যার কাপড় সে রাজা হয়ে যাবে। মাকে এ গল্প করেছে তার ঠাকমা। ঠাকমার বাপ নাকি বড় ওঝা ছিল। কিন্তু এখন নতুন কাপড় পাবে কোথায়? সে অসহায়-ভাবে চারপাশে তাকাল। এখন দৌড়ে তালতোড়ে গিয়ে কারো কাছ থেকে চেয়ে এনে যদি দ্যাখে এনারা নেই, তবে? আর দৌড়াতে গেলে পেছন-তাড়া করতে পারেন বিরক্ত হয়ে। কি করবে সে। এক হাত দিয়ে মাথা চুলকোতে গিয়ে আঙুলে গামছা ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে গামছা খুলে নিল ও। কাপড় বলতে আছে প্যান্ট আর এই গামছা। দুটোই ময়লা কালো। প্যান্টটা বাসি আর গামছা সকালে জলকাচা হয়েছিল। এটাই পেতে দিই তেনাদের জন্য—কিছু তো উপকার হবে। তুলসীজল ছিটিয়ে দিতে বলবে না হয় মাকে। ক্যানটা মাটিতে সন্তর্পণে রেখে সে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সাপদুটো নিথর হয়ে গেল। বুকের মধ্যে ঢুকবুক করছে, পা ভারী, কোনোরকমে ওদের পাশে গামছা বিছিয়ে সে পায়ে পায়ে সরে এলো ক্যানের কাছে। সাপদুটো চুপচাপ ওকে দেখছে, ওর

মতলব বোঝার চেষ্টা করছে। দূরে সরে এসে বুক হালকা করে ও বাতাস ছাড়ল। রাগ করো না মা মনসা, আমার মনে কোনো অন্যায় নাই—বিড়বিড় করে আওড়াতে লাগল সে। কাজ হলো যেন, সাপদুটো আবার নড়ছে। ল্যাজ-দুটো পরস্পরকে আঘাত করে মাটিতে আছাড় খাচ্ছে এখন। আর একটু হেল—আর একটু হেল—যাঃ, সরে গেল। গামছাটার কাছ ঘেঁষে এসেও সরে গেল সাপদুটো। ও মা মনসা, রাজা করে দাও গো, ও মা মনসা। চোখ বন্ধ করে সে মনসাকে ডাকতে লাগল। এক মিনিট পার করে দিয়ে সে চোখ খুলতেই স্থির হয়ে গেল। তেনারা একদম গামছার মধ্যিখানে এসে গেছেন। মা মনসার প্রতি কৃতজ্ঞতায় সে কেঁদে ফেলল।

তারপর একসময় তেনাদের লীলা শেষ হয়ে যেতেই তেনারা দৌড়ে যে যার থানে চলে গেলেন। চুপচাপ চারধার শুধু একটা ঘুঘু কোথাও ডাকছে। সে রোমাঞ্চিত শরীর টেনে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে গামছাটা তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। আঃ, সে রাজা হয়ে যাবে এবার। রাজা না হোক, নতুন কাপড় নয় যখন তখন গগন-খুড়োর মতো টাকা হবে নিশ্চয়ই। এটাকে এখন কোথায় রাখে। মাথায় রাখতে তো ঘাম লাগবে। তার চেয়ে শক্ত করে কোমরেই বাঁধা যাক। নিশ্চিন্তে ক্যানটা নিয়ে সে তালতোড়ের দিকে হাঁটতে লাগল। পায়ের তলায় এখন যেন গরম গালচে বিছানো।

তালতোড়ের মুখটাতেই শ'লোকের ভিড়। সেই যেখানে বাইশটা তালগাছ গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে ছায়া ফেলে রেখেছে জমিতে সেখানে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। বেশ জোরে জোরে পা ফেলে সে রাস্তাটায় এসে দাঁড়াল। গাঁয়ের লোক একপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার মধ্যে এবং ওপাশে কয়েকটা প্যাণ্ট-পরা লোক মাথায় টোকা চাপিয়ে হাত পা নেড়ে কি সব বলাবলি করছে। ওদের পেছনে কালো কাপড়ে মোড়া একটা যন্ত্র তার পেছনে একটা মানুষ মাথা মুড়ে এক একবার কি দেখছে আর বেরিয়ে আসছে।

বড় বড় চোখ মেলে সে রাস্তাটা পেরিয়ে গাঁয়ের লোকগুলোর দিকে যখন হাঁটতে শুরু করেছে তখন কাটকাট বলে চিৎকারটা উঠল। 'আঃ যতীন, তোমায় বললাম রাস্তাটা গার্ড দাও, দিলে নষ্ট করে।' সে অবাক হয়ে দেখল কালো কাপড় থেকে মুখ বের করে একজন চেঁচামেচি করতে লাগল। সে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই একজন এসে তার হাত ধরল ছুটে। এ্যাই ছোঁড়া, সরে যা সরে যা। খবরদার রাস্তা ক্রশ করবি না।'

ঠিক সেই সময় ও একটা মোটা গলা শুনল, 'যতীন, ওকে নিয়ে এসোতো এখানে।' কথাটা শেষ হতেই লোকটা ওর হাত ধরে টানতে টানতে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। সেখানে যিনি এক হাতে খাতা আর মাথায় টোকা পরে দাঁড়িয়ে-ছিলেন তিনি ভালো করে ওকে দেখলেন। তারপর ঘাড় নেড়ে বললেন, 'গুড, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। সুনীলবাবু যখন গরুর গাড়িতে করে গ্রামে ঢুকবেন তখন এ, ধরা যাক গ্রামের ছেলে, গরুর গাড়ির পেছনটা ধরে দৌড়ে আসতে থাকবে। একদম ন্যাচারাল হবে, কি বল ?'

সঙ্গে সঙ্গে অনেকে দারুণ দারুণ বলতে লাগল। হাতে-খাতা ভদ্রলোক ওর দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালেন, 'এ্যাই, তোর নাম কি ?'

'শ্রীরবীন্দ্রনাথ—।' ওকে থামিয়ে দিয়ে তিনি হো হো করে খানিকটা হেসে নিলেন, 'আরে বাস, শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথকে আর্টিস্ট হিসেবে পেয়ে গেলাম। বুঝলে হে, এইসব চাইল্ড ট্যালেণ্টকে ট্রেইণ্ড করাই হচ্ছে এ্যাকচুয়েল এফিসিয়েন্সি। কোন্ ক্লাসে পড়িস্ ? পড়িস্ তো ?'

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল তার, কোনো রকমে বলল, 'টু।'

'হুঁস। এ্যাকটিং করবি সিনেমায় ? তোর বাড়ি কোথায় ?'

'সেন্ট্রাল অফিসের কাছে।'

'দৌড়াতে পারবি ?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল সে। এটুকু ও বুঝতে পারছিল সিনেমার যে ছবি এখন ইনারা তুলবেন সেখানে তার ছবি থাকবে। তাকে দৌড়াতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে খালি হাতে গামছাটা চেপে ধরল। আঃ মা গো, তুমি যদি দেখতে। ততক্ষণে কোথা থেকে একটা গরুর গাড়ি এসে পড়েছে সামনে। তাতে একজন সুন্দর চেহারার পুরুষ বসে আছেন। গাড়োয়ানকে বলা হলো গাড়িটা জোরে চালাতে আর তাকে ওরা বলল গাড়ির পেছনটা ধরে সেই তালে ছুটতে। এটা তো একটা মজার খেলা, ওরা কত করে আর তখন গাড়োয়ানরা কি চেঁচায়। এক-হাতে ক্যানটা নিয়ে সে গাড়ির পেছনটা ধরতেই কয়েকজন হাঁ হাঁ করে এগিয়ে এলো। 'এই এটা রেখে দে, এটা নিয়ে ছুটবি কি রে!' একজন এসে প্রায় জোর করে তার হাত থেকে ক্যানটা ছিনিয়ে নিল, 'কি আছে এতে ?'

'মদ।' কোনোরকমে বলল সে।

'মদ! কে খায়—কার মদ ?'

'বাপ খায়—গোয়ালপাড়ার ভাঁটিখানা থেকে আনলাম।'

'আরে বাস। ও যতীনদা, বাপের জন্য ছেলে এই রোদ্দুরে মদ নিয়ে যাচ্ছে। এরকম তো বাপের জন্মে শুনিনি দাদা। আঃ, বেশ গন্ধ তো। এ্যাই ঠিক কথা বলছিস তুই ?'

'হ্যাঁ। আমি রোজ আনি। গগনখুড়ো বিনি পয়সায় দেয়।' প্রায় কেঁদে ফেলল সে। 'বিনি পয়সায় মদ দেয়। তোর বাপ করে কি ?'

'পানের দোকান আছে—ট্যুরিস্ট লজের সামনে।'

'ওরে শালা, ওই বুড়োটা তোর বাপ!'

এমন সময় খাতা-হাতে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'রেডি, মনিটর।' সঙ্গে সঙ্গে যতীন বলে মানুষটা বলল, 'নে ছোঁড়া, এটা আমার কাছে থাকল, ভয় নেই। যা যা ছোট।'

অগত্যা সে ছুটল। গাড়িটা হেট হেট করে ছুটতেই সেই সুন্দর মতো পুরুষ শুয়ে পড়লেন। কি গায়ের রঙ তার যেন সকালবেলার সূর্য। চোখ ভরে দেখতে দেখতে খানিক দৌড়াল কারণ কিছু দূর যেতেই পেছন থেকে চিৎকার করে তাদের থামতে বলা হলো। এর পর গাড়ি ঘুরিয়ে আবার আগের জায়গায় এসে

ওদের ছুটে যেতে বলা হলো। গাড়িও ছুটছে, সেও। ওকে বারবার করে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছিল তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে দেখল না। কিন্তু এবার থামতেই ও পেছনে সেই কালো যন্ত্রটার দিকে তাকাল। নির্ঘাৎ ওখানে ছবি উঠছে তার।

কাছাকাছি ফিরে আসতেই একটা লোক ওর দিকে দুটো টাকা এগিয়ে ধরল, 'নে এ্যাকটিং করলি, তার ফি।' প্রায় জড়ভরতের মতো সে টাকাটা ধরল। আরে বাপ, শুধু সিনেমায় ছবিই উঠবে না আবার ওকে তারা টাকাও দিলো! ও বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই সেই খাতা-হাতে লোকটা ওপাশের গাঁয়ের লোকদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমাদের কাজ শেষ। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ! এখানে যদি ছবিটা আসে অবশ্যই দেখবেন। ছবিটার নাম "এর নাম সংসার।" আপনাদের গাঁয়ের নাম ছবিতে থাকবে।'

গাঁয়ের লোকেরা খুশী হলো। ছেলেটা দেখল সেই সুবেশ পুরুষ গরুর গাড়ি থেকে নেমে মোটর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন। তিনি যখন ওর পাশ দিয়ে হাঁটছেন তখন যেন নাক বন্ধ হয়ে গেল ওর। মনে হলো উত্তরায়ণে যখন গোলাপ যুঁই রজনীগন্ধা ফোটে তখনও এত সুন্দর সুবাস ছড়ায় না। ভীষণ লোভীর মতো বার বার নিঃশ্বাস নিল সে। আঃ, বুক ভরে যায় যেন।

জিনিসপত্র গোটানো হয়ে গেলে সেই যতীন নামের লোকটা ওকে ক্যান ফিরিয়ে দিল। হাতে নিতে ও চমকে উঠল, বড় খালি খালি ঠেকে। ক্যানের ঢাকনা খুলতেই ওর সামনের গাঁটা যেন ঘুরে গেল আচমকা, ক্যানটা খালি। মুখ তুলে সে দেখল যতীন মুচকি মুচকি হাসছে, চোখাচোখি হতেই একটা হাত আকাশে তুলে বলল, 'যা ভাগ!'

'মদ কোথায়, মদ?' চিৎকার করে উঠল সে।

'আবার চেঁচায়?' ধমকে উঠল যতীন।

'আপনি আমার মদ নেছো—দেন, ফিরায় দেন।' প্রায় কেঁদে ফেলল ও। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে গেল ওদের ঘিরে। খাতা-হাতে লোকটা এবার এগিয়ে এলো, 'কি হয়েছে?'

কে একজন বলল, 'মদ নিয়ে যাচ্ছিল ছোঁড়া, যতীন ফেলে দিয়েছে।'

'মদ? তুই মদ নিয়ে যাচ্ছিলি?'

'হ্যাঁ।

'কার জন্যে?'

'বাপের জন্য। বাপ আমার চামড়া খুলে নেবে। এঁ এঁ এঁ।' চিৎকার করে কাঁদতে লাগল ছেলেটা। খাতা-হাতে লোকটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না ব্যাপারটা, 'কি রকম বাপ ভাই, ছেলেকে এই রোদে মদ আনতে পাঠায়।'

'আমার মদ দেন— দেন বলছি। আপনার টাকা ফিরায় নেন।' প্রায় পাগলের মতো চিৎকার করে যাচ্ছিল সে। এমন সময় সেই সুন্দর পুরুষ গাড়ি থেকে নেমে এলো, 'কি হয়েছে?'

খাতাহাতে লোকটা ঘটনাটা বলে শেষ করল, 'যতীন মদটা ফেলে দিয়েছে।

অবশ্যই ঠিক করে নি কিন্তু আমি ভাবছি কতখানি পাষণ্ড হলে বাপ নিজের ছেলেকে মদ আনতে পাঠায়। অদ্ভুত ব্যাপার।'
সুবেশ পুরুষ বলল, 'কিন্তু এটা ঠিক হয় নি। লোকাল লোককে চটিয়ে আমরা এখানে কাজ করতে পারব না। ওকে বরং মদের দামটা দিয়ে দিন।' খাতা-হাতে লোকটা যতীনকে বলল, 'এই, ওকে দশটা টাকা দিয়ে দাও।' সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগল ছেলেটা, 'না আমায় মদ দেন, টাকা নিয়ে কি করব। গগনখুড়ো না হলে টাকা দিলেও আমায় মদ বেচবে না জগুশুঁড়ী।' ঘ্যানর ঘ্যানর কান্নায় ওরা ক্রমশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এদিকে ব্যাপার দেখতে দূরে দাঁড়ানো গাঁয়ের লোক ক্রমশ ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে খাতা-হাতে লোকটা ঘাবড়ে গেছে। সুন্দর পুরুষ ওর কাছে আসতেই ছেলেটা কান্নার ফাঁকে ফাঁকে নাক টেনে গন্ধটা নিচ্ছিল সেটা সবাই নজর করেছিল। সুন্দর পুরুষ ওর খালি কাঁধে হাত রাখল, 'মদ যখন ফেলেই দিয়েছে তখন আর কি করবি, দশটা টাকা দিচ্ছে সেটা রাখ, বাপকে আমার নাম করে দিবি, বুঝলি ?'
ছেলেটা আবার নাক টানল। তাই দেখে পুরুষটি বলল, 'গন্ধটা পছন্দ হয়েছে? নিবি তুই ?'
সঙ্গে সঙ্গে মাথাটায় সব গোলমাল হয়ে গেল ছেলেটার। গন্ধটা তাকে দেবে বলছে। মার মুখটা মনে পড়ে যেতেই সে আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ। 'আমার ইন্টিমেটটা এনে দাও তো।' হুকুমটা হতেই একজন গাড়ি থেকে একটা বাক্স বের করে তা থেকে সুন্দর শিশি এনে তার হাতে দিল। পুরুষটি সেই শিশি ছেলেটির হাতে দিয়ে বলল, 'খুশি তো ? এর মধ্যে কে যেন দশটা টাকা গুঁজে দিয়েছে হাতে। সে দেখল যেন বিরাট ফাঁড়া কেটে গেছে। এ রকম ভঙ্গিতে ওরা দ্রুত গাড়িতে উঠে চলে গেল জায়গাটা ছেড়ে। ছেলেটা এবার এগিয়ে আসা গাঁয়ের লোকদের দেখে কেমন থতমত হয়ে বুঝতে পারল এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। টাকাগুলো ক্যানের মধ্যে ফেলে অন্য হাতে শিশিটাকে নিয়ে সে শামবাটির দিকে দৌড়তে লাগল।
পেছনের চিৎকার, হাসি দ্রুত পায়ে এড়িয়ে সে খালটার পাশে এসে দাঁড়াল। এখনও দূরের আকাশে ছুটে যাওয়া গাড়ি থেকে ওঠা ধুলোর ঝড় পাক খাচ্ছে! সে সন্তর্পণে হাতের মুঠো খুলল, একটা ছোট শিশির ভেতরে রঙিন তেল টলমল করছে। হাতটা মুখের কাছে নিয়ে এসে গন্ধটা নাক দিয়ে টানল সে— আঃ। কিসের সঙ্গে মেলে এটা। গোলাপ-যুঁই-উঁহু। বোতলের মুখটা শক্ত করে সাদা ছিপিতে আঁটা, তার গায়ে ছোট্ট একটা ফুটো। কৌতূহলী আঙুলে ছিপিটার মুখে জোরে চাপ দিতেই তীরের মতো সাদা ধোঁয়া আকাশের দিকে ছিটকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী যেন সেই অপরূপ গন্ধে ভুর ভুর করতে লাগল। এ রকমটা হবে জানা ছিল না, ভয়ে চট করে সে হাত সরিয়ে নিতেই শিশিটা স্বাভাবিক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত বাড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সেই গন্ধটা শরীরে মাখতে চাইল। আঃ। এখন এই মুহূর্তে ওর সামনে থেকে শেষ হয়ে আসা সূর্যটা, রক্তাক্ত হয়ে পড়ে থাকা খোয়াই যেন মুছে

গেছে। সমস্ত চরাচরে সে ছাড়া আর কেউ নেই।

শামবাটি পেরিয়ে গামছাটায় শিশিটা আচ্ছা করে বেঁধে সে হাঁটছিল। ডানদিকে উত্তরায়ণ—শ্রীনিকেতনে যাবার রাস্তা, ওকে বাঁ দিকের পথটায় যেতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে সে লক্ষ্য করছে যারাই ওর পাশ দিয়ে হাঁটছে তারাই অবাক হয়ে নাক টানছে। কিন্তু কেউ যেন অনুমান করতে পারছে না তার শরীর থেকেই গন্ধটা আসছে। ভীষণ মজা লাগছিল ওর, ঠিক লুকোচুরি খেলার মতন।

বাখারির দরজা ঠেলে সে যখন উঠোনে ঢুকল তখন সন্ধে হব হব। ওদের ঘরের দাওয়ায় খাটিয়াটা শূন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। আর সেদিকে তাকিয়েই ওর পেটটা কেমন চিনচিন করে উঠল। আটটা বাজলেই বাপ আসবে, এসে ওই খাটিয়ায় শোবে। হাতের ক্যানটার দিকে তাকাল সে। এতক্ষণ, সেই শিশিটা হাতে পাবার পর থেকে যে ভয়টা উবে গিয়েছিল সেটা যেন তাড়কা রাক্ষসীর মতো হা হা করে ফিরে এল। মদ না পেলে বাপ বাখারি ধরবেই—এখন কি হবে?

মাটিতে পা ঘষে ঘষে সাহস আনতে চাইল সে। মা মনসা তাকে যদি রাজা করে দেন, না হোক গগন-খুড়োর মতো টাকা দেন, তাহলে দিনরাত ভরপেট মদ খাওয়াবে সে বাপকে। তোমার আর পানের দোকান দিতে হবে না বাপ, ঘরে বসে দিনভরে মদ খাও। এই কথাটা সে কি করে বাপকে বোঝাবে?

এই সময় সে মাকে দেখতে পেল। ঘর থেকে বাইরে পা দিয়ে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, 'এ্যাই, কি হলো তোর? মদ আনতে গিয়ে খেয়ে এলি নাকি? যেমন বাপ তেমন বেটা হবে না? আমার হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গেল।'

সে তবু নড়ে না। বাপ একবার মার গায়ে হাত তুলেছিল তারপর তিনদিন ঘর আসে নি। মা গিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল। মা কি তার কথা শুনবে? ও অন্যকোন উপায় পেল না, এক পা এগিয়ে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াল সে, মার চোখ ঘুরছে।

'কি ব্যাপার রে. অমন চোরের মতো তাকাস কেন?' মার গলায় সন্দেহ। তারপর উঠোনে নেমে পড়ে তার দিকে দ্রুত আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নাক টেনে ঘ্রাণ নিল, 'কিসের গন্ধ রে, কি মদ এটা?'

'মদ নয়।' শুকনো গলা থেকে আওয়াজটা কোনো রকমে বের হলো।

ততক্ষণে মা কাছে এসে পড়েছে। দ্রুত নাকটা টানছে মা, তোর শরীর থেকে বের হয় যে—কি মেখেছিস—কোথায় পেলি?' আলতো করে তার হাত ধরল মা।

'স্যুটিং পার্টি দিল।'

'স্যুটিংপার্টি? তুই সেইসব দেখতে গেছিলি?'

'হুঁ। আমাকেও ছবিতে দেখা যাবে। ওরা আমার দৌড়ানোর ছবি তুলেছে।' ছেলেটা কথা শেষ করতেই মা ওঁকে জড়িয়ে ধরল, 'সত্যি?'

মায়ের শরীরের কাছে বসে ও পুটুর পুটুর করে সমস্ত ঘটনাটা বলল। সেই মা মনসার সাপ দুটো তার গামছায় লীলা করেছে আর সুনীলবাবু নামে সুন্দর পুরুষটা তাকে শিশি দিয়েছে সেই সঙ্গে বারো টাকা।

'বাপ আমাকে মেরে ফেলবে মা—মদ না পেলে বাপ—।' তার কথা থামিয়ে মা চিৎকার করে উঠল 'চুপ কর। মদ খেয়ে সে তো নর্দমা হয়ে পড়ে থাকে—এ রকম গন্ধ সে বাপের জন্মে এ বাড়িতে এনেছে ? হ্যাঁরে বইটার নাম কি ?'
'ওরা বলল, এর নাম সংসার। লোকটা কি সুন্দর দেখতে।'
'এর নাম সংসার।' মনে মনে যেন মুখস্থ করল মা, তারপর বলল, 'তেনার ছবি দেখেছি রাস্তায়। তুই আমার রাজা হবি রে রবি—তোর ছবি কত লোক দেখবে।' ওকে জড়িয়ে ধরে মা যেন কি করবে বুঝতে পারছিল না।
গামছাটা খুলে সে মায়ের হাতে দিল। শিশিটা এখন তার হাতে। মা চোখ বন্ধ করে গামছাটা মাথায় ঠেকিয়ে দ্রুত উঠে গিয়ে ঘরে রেখে এলো, 'দেখি দেখি শিশিটা।'
ও মাটিতে বসে মায়ের দিকে তাকাল। শিশিটা হাতে নিয়ে মার মুখ হাঁ হয়ে গেছে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোখের সামনে শিশিটা নিয়ে দেখছে। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে সামান্য উপুড় করে দেখল তেলটা বের হয় কি না। শেষে হতাশ হয়ে ছেলের দিকে তাকাল। সে হেসে ফেলল। এখন কায়দাটা তার জানা। মায়ের হাত থেকে শিশিটা নিয়ে সে ফুটোটা মায়ের দিকে করে ছিপিতে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়াটা ছিটকে গেল মায়ের শরীরে, আচমকা ঘাবড়ে গিয়ে মা উল্টে পড়ে যাচ্ছিল, তার শুখনো মুখে এখন অপ্রস্তুত ভাব। সে আঙুল সরাতে ধোঁয়াটা বন্ধ হয়ে গেল। মা উঠে বসে জোরে জোরে নিজের শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে বলল, 'আঃ দেখ কি সুন্দর। অ রবি, তোকে পেটে ধরেছিলাম বলে এটা পেলাম রে।' পাগলের মতো দুটো হাত মুখে ঘষতে লাগল মা।
ততক্ষণে ক্যানটার দিকে নজর গেল ছেলেটার। খুব সন্তর্পণে সে ক্যানের ঢাকনাটা খুলল। তলায় নোট দুটো পড়ে আছে। আঙুল দিয়ে সে দুটোকে তুলতেই দেখল গা-মাখা মদে নোট ভিজে একসা হয়ে আছে। মার নজর পড়েছিল এদিকে, হাত বাড়িয়ে ক্যানটা নিয়ে দেখল একটু তলানি রয়ে গেছে এখন। গন্ধটা যেন বমি এনে দিল মার, একটানে ছুঁড়ে দিল মা সেটাকে উঠোনের একপাশে। থু থু থু। নোট থেকেও গন্ধ বের হচ্ছে মদের। মা সেটাকে হাতে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছিল না প্রথমটায়। 'দশ টাকা আর দুটাকা। বারো টাকা। কাউকে দিবি না, ওই বইটা এলে তোতে আমাতে দেখব, বুঝলি ?' মার কথা শেষ হতেই সে বলল, কিন্তু বড় মদের গন্ধ ছাড়ে যে।' সঙ্গে সঙ্গে মা চিন্তা করে ফেলল তারপর নোট দুটো দুই আঙুলে সামনে ধরে বলল, 'ওই গন্ধের ধোঁয়াটা এর ওপর ছাড় তো, মদো গন্ধটা পালিয়ে যাবে, ছাড়।'
শক্ত করে শিশিটা হাতে ধরে ফুটোটা সেদিকে তাক করে সে ছিপিতে চাপ দিল। পিচকারীর মতো ধোঁয়াটা একরাশ গোলাপ যুঁই রজনীগন্ধা নিয়ে নোট দুটো ভিজিয়ে দিল। মার মুখটা কি মিষ্টি দেখাচ্ছে এখন, মাকে এমন সুন্দর করে হাসতে সে জন্ম থেকে দ্যাখে নি।
হঠাৎ তার খেয়াল হলো ধোঁয়াটা যত বের হচ্ছে তত শিশির তেল কমে আসছে। প্রচন্ড ভয় পেয়ে সে আঙুলটা সরিয়ে নিল তারপর শিশিটা দেখে নিয়ে মায়ের

দিকে বাড়িয়ে দিল। 'মা এটা শেষ হয়ে গেল আর গন্ধ বের হবে না যে।' হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে মা বলল, 'অর্ধেকটা আছে, তোর বাপের গায়ে একটু স না হয় দিয়ে দিস। বাপের জন্মে সে এসব দেখে নি তো।'



আঁচড়

এই রকম মেঘচটকানো দিন এবছর আর আসে নি। যদিও শ্রাবণের মধ্যকাল কিন্তু সূর্য তো দূরের কথা দিনদুপুরেই বুকচাপা বাতাসের মতো একটা অন্ধকার ঝুলছে, ঝুলে রয়েছে। অথচ আজ একটা জরুরী সভা ছিল। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে এমন ভেবেছিল লোকাল কমিটির সদস্যরা। কিন্তু ঠিক বিকেলের পর গাঢ় জল ঝরা শুরু হলো। সন্ধ্যে নাগাদ তো চারধার থৈ থৈ। নবোন্দু ছাতা মাথায় পার্টির অফিসে গিয়ে যখন পৌঁছাল তখন তার প্যান্ট ভিজেছে, পিঠেও জলের ছোঁয়া। যাওয়া মাত্রই কিশোর বলল, 'আসুন নবোন্দুদা, আজ মিটিং হবে না।'

ঘরে তখন জনা পাঁচেক বসে। তাদের মধ্যে ললিতা নেই। সে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেউ আসতে পারে নি বুঝি ?'

'আসবে কি করে ? এই বৃষ্টিতে পাগল আর আমরা ছাড়া কেউ পথে বের হয় না। আমি সেক্রেটারির বাড়িতে গিয়েছিলাম। উনিও বললেন মিটিং পিছিয়ে দিতে।' কিশোর বলল।

'আজ কেমন আছেন উনি ?'

'একই রকম। তবে ঘরেই থাকতে হবে সারাজীবন।' কথাটা বলে কিশোর গলা নামাল, 'ওঁর ইচ্ছে আপনিই সেক্রেটারী হন। বউদিকে উনি সমর্থন করছেন না। বললেন, এই শিল্পাঞ্চলে কোনো মহিলার পক্ষে দায়িত্বটা বেশী হয়ে যাবে। আর যাদবদাকে উনি পাত্তাই দিচ্ছেন না। কিন্তু বউদিকে সমর্থন করার মানুষ কম নেই।'

ঘণ্টাখানেক পার্টি অফিসে কাটান নবোন্দু। বাইরে একটানা বৃষ্টির শব্দ। আলো কাঁপছে। যে কোনো মুহূর্তেই লোডশেডিং হয়ে যেতে পারে। এলাকার কয়েকটা দাবী নিয়ে জনসাধারণের কাছে যেতে হবে। তার একটা লিফলেটের খসড়া করা দরকার। চিরকাল এই দায়িত্ব নবোন্দুর ওপর। সেই মকসো করতে গিয়ে সে মন পাল্টালো। বাড়িতে বসে করবে ; তার নজর বারংবার দরজায় যাচ্ছিল। ললিতা এখনও এলো না। অথচ একবার পার্টি অফিসে না আসার পাত্রী নয় ও। ওর স্কুলের সামনে সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে যায়। ললিতা তার স্ত্রী। বাইশ বছর তাদের বিবাহিত জীবন নির্বিঘ্নে কেটেছে। বাইশ বছর ধরে তারা একই রাজনীতি করছে। পার্টি যখন দুভাগ হলো তখনও একসঙ্গে, পার্টি থেকে যখন অনেকে বেরিয়ে গেল তখনও পার্টির সঙ্গে। এ সঙ্গে আন্দোলন করেছে, পুলিশের লাঠির ঘা খেয়েছে। নবোন্দু অবশ্য পার্টিতে এসেছিল আরও আগে। তখন সবে যৌবনে পা দিয়েছে, স্বাধীনতার পরেই পার্টি ব্যান্ড হয়ে গেল। আন্ডারগ্রাউন্ডে লুকিয়ে লুকিয়ে মার্কসসাহেবের

কাছে শিক্ষিত হয়েছিল তার রক্তে আমরণ একই আনুগত্য, ললিতা পরে যার সঙ্গী হয়েছেন। একই আঞ্চলিক কমিটিতে কাজ করতে করতে দিন কেটেছে ওদের। পদের মোহ বা নির্বাচনে আসক্তি কোনোকালেই ছিল না নব্যেন্দুর। আজ কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই তার বন্ধু কিংবা শিষ্য। নব্যেন্দু থাকতে চেয়েছে একই জায়গায়। কিন্তু এই লোকাল কমিটি আজ বিপন্ন। সেক্রেটারি কখনও সুস্থ হবেন না। অনেকেই তাকে ধরল হাল হাতে নিতে। এমন কি কেন্দ্রীয় কমিটি থেকেও অনুরোধ এল তার পিছিয়ে না থাকার জন্যে। নব্যেন্দু রাজী হলো। এবং বিস্ময় তারপরেই যাদবের কথা সে ধরছে না, ওর পদের ওপর মোহ চিরদিনই, ললিতাকেও রাজী হতে দেখল একই পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। এখন মূলত স্বামী স্ত্রীর লড়াই' যাদব ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

নব্যেন্দু এবং ললিতার সাংসারিক জীবন সুখের। অবশ্য সুখের সংজ্ঞা নিয়ে নানান মতভেদ থাকতে পারে। ওদের তো সন্তান হয় নি। এবং তা নিয়ে আপাত কোনো আক্ষেপ নেই কারো। ললিতার এবং নব্যেন্দুর মধ্যে কোনো ভুল বোঝা-বুঝি নেই ; কোনো আড়াল নেই। তাদের তিন কামরার বাড়িতে পার্টির ছেলে-মেয়েদের অবাধ যাতায়াত। মাঝে মাঝে মনে হয় পার্টির অফিসটাই যেন সেখানে উঠে গেছে। আর এত বাইরের কাজ সামলেও ললিতা সংসারের খুঁটিনাটি ঠিক নজরে রেখে স্কুলে যায়। ললিতার হাতের রান্না না খেলে তৃপ্তি হয় না নব্যেন্দুর।

যেদিন প্রথম খবরটা শুনল সেদিন বাড়িতে ফিরে ললিতাই তাকে বলেছিল, 'ওরা সবাই আমাকে চাইছে, তোমাকেও কেউ কেউ, কি করা যায় বুঝতে পারছি না।'

'তুমি তো শুনলাম সম্মতি দিয়েছ। বেশ তো, নির্বাচন হোক। এতে পার্টির গণতান্ত্রিক চেহারাটা উজ্জ্বল হবে। আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।'

বুকের কাছে চলে এসেছিল ললিতা, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ না তো ?'

'মোটেই না। তবে তুমি যদি চাও আমি সরে দাঁড়াতে পারি।'

'খবরদার না। তাহলে যাদববাবু বলে বেড়াবে বউএর মুখ চেয়ে তুমি কেটে পড়লে। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কিন্তু সেটা বাইরে, ঘরে আমাদের সম্পর্কে যেন চিড় না ধরে।'

ললিতার চুলে হাত বুলিয়ে নব্যেন্দু বলেছিল, 'তার চেয়ে এক কাজ কর। ভোট চাওয়ার জন্যে আমরা এ ওকে আক্রমণ করব না, নিন্দা করব না।'

'বেশ তাই হোক। কোনোরকম ক্যাম্পেন ছাড়াই আমরা কনটেস্ট করব।'

বৃষ্টি কমার কোনো লক্ষণ নেই। কিশোরকে ঝাঁপ বন্ধ করতে বলে ছাতি মাথায় রাস্তায় নামল নব্যেন্দু। এলোপাথারি ঝাপটা দিচ্ছে হাওয়া। জলের ফোঁটাগুলো বেশ ভারী। কয়েক পা হাঁটতে সম্পূর্ণ ভিজে গেল সে। এখন রাত আটটা। ললিতাদের স্কুল মাইল দেড়েক দূরে। সে কি এখনও স্কুলেই আটকে আছে ? সেখানে যাওয়ার আগে নিজের বাড়িটা দেখে যাওয়া উচিত মনে হলো। কিছু-

দূর হাঁটতেই ওর মনে হলো একা এই দুর্যোগে বেরুনো উচিত হয় নি। রাজনীতি এখন এমন ক্লেদাক্ত যে কেউ নিশ্চিন্ত নয়। আশেপাশের জেলায় চোরাগোপ্তা খুন হচ্ছে। পার্টির উঁচু দিকের মানুষের ওপর এই আক্রমণ। তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতার কাছে হার মেনে স্বার্থলোভী শক্তিগুলো এইসব আঘাত হানছে। যদিও এই জেলায় এখন এমন খবর পাওয়া যায় নি তবু কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। নবোন্দুর এই বৃষ্টিতেও হাসি পেল। মানুষ এখন মানুষের কাছেই বিপন্ন। নিঃস্ব শ্রমিকের বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে আর এক নিঃস্ব শ্রমিক।

মাঝরাস্তায় আলো নিভল। ঝুপ করে গভীর কালো জাল কেউ ছুঁড়ে দিল শহরটার ওপর। বৃষ্টি হলেই কেন যে লোডশেডিং হবে এই শহরে তার কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা নেই। রাস্তার আলো নিভে যাওয়ায় হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল। এইসব সময়ে নবোন্দু অনুভব করে তার বয়স হচ্ছে। আগের মতো সেই টগবগে ভাবটা আর নেই। এই যেমন, তুমুল বৃষ্টিতে ছাতি যখন কোনো কাজ করছে না তখন সেটাকে মাথার ওপর তুলে ধরা যে বাহুল্য তা মনে হলেও অভ্যাসে মেলে রাখা এমন আর কি।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে স্বস্তি ফিরল। ভেতরে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। তার মানে ললিতা ফিরেছে। দরজা খুলেই ললিতা চেঁচাল, 'এমা কি করেছ তুমি? এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এলে। একেই সাইনাসের ধাত তার ওপর—! তুমি একটা অসুখ না বাধিয়ে ছাড়বে না। দেখছ দিনটা এই রকম, কি দরকার ছিল বের হবার।'

'আজকে মিটিংটার কথা ছিল যে!' ছাতা বন্ধ করেও আবার মেলে দিল একপাশে নবোন্দু জল ঝরার জন্যে।

বাথরুম থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে খাটে বসতেই এক কাপ আদা দেওয়া চা ধরিয়ে দিল ললিতা। কৃতজ্ঞ নবোন্দু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। সন্তান হয় নি বলে শরীর ভাঙেনি কিন্তু মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে, চুলে রঙ ধরেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবোন্দুর মনে হলো ললিতা এখনও লাবণ্যময়ী। সে অন্য গলায় বলল, 'তোমারই নির্বাচিত হওয়া উচিত।'

'স্ত্রী হিসেবে আমিও ওই রকম বলব। আজ যে মিটিং হবে না তুমি জানতে না?'

'না। তুমি জানতে?'

'হুঁ। স্কুলেই খবর পেয়েছি!'

একটা চিনচিনে ব্যথা উঠেই মিলিয়ে গেল। ললিতার সঙ্গে ওদের বেশী যোগ। সে নিঃশ্বাস ফেলে কাগজপত্র নিয়ে বসল চা শেষ করে। ললিতা বসল স্কুলের খাতা নিয়ে। বলল, 'খাওয়ার ইচ্ছে হলে বলো। বেশী রাত না করাই ভালো। যা ভিজেছ তাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়াই ভালো।'

লিফলেটের খসড়া সবে শেষ হয়েছে এমন সময় দরজায় কড়া নড়ল। প্রথমটা হুঁশ করে নি নবোন্দু, ললিতা চেয়ার ছেড়ে উঠতেই সে মুখ তুলল, 'এই বৃষ্টিতে

কে এলো আবার ?' 'দেখছি।' ললিতা যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই সে বলল, 'তুমি বসো, আমি যাচ্ছি।' অরুণ হতে পারে। ও বলেছিল একবার আসতে পারে।' ললিতা এগিয়ে গেল বাইরের ঘরের দিকে। অরুণ ললিতার বশংবদ ভাই। নব্যেন্দুর সন্দেহ অরুণের পরামর্শেই ললিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সে ঘড়ির দিকে তাকাল, রাত পৌনে এগারটা। এখন আসা মানে কিছুক্ষণ ওর বকবকানি শুনতে হবে। ও-ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলল, শব্দ হলো।

'কাকে চাই ?' ললিতার গলায় প্রশ্ন বাজল।

'নব্যেন্দু আছে ?'

'আপনার নাম ?'

'নাম বললে কি চিনতে পারবেন! আমি ওর বন্ধুর আত্মীয়। একটু ডেকে দিন।'

সংলাপগুলো কানে এসেছিল। গলার স্বরের মালিককে চিনতে পারল না নব্যেন্দু। এই সময় ললিতা একটু বিরক্ত-মুখে ঘরে ঢুকে বলল, 'একটা বুড়ো তোমায় খুঁজছে, নাম বলল না।'

'উটকো জ্বালাতন এত রাত্রে। বিদায় করে দিতে পারলে না ?'

'বুড়োমানুষ মনে হলো সুস্থ নন। তারপর তোমার বন্ধুর আত্মীয়।' ললিতা আবার ছাত্রীদের খাতা নিয়ে বসল।

বাইরের ঘরের দরজা আধাভেজানো। বৃষ্টির শব্দ আসছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওঘরে দুটো আলোর সামনে বসে দুজন কাজ করছিল! এঘরে মোমবাতি জ্বলছে। তার কাঁপা আলোয় কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধকে দেখতে পেল সে। সম্পূর্ণ ভিজে ঠকঠক করে কাঁপছেন। কাঁধে একটা ব্যাগ রয়েছে পলিথিনের। হাতে একটা ছেঁড়া ছাতা। বুক অবধি সাদা দাড়ি আর মাথার চুল উঠে গেছে অর্ধেকটা। দুই চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।

'কি চাই ?'

'নব্যেন্দু—!' গলার স্বর কাঁপল।

'আমি, আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। কার আত্মীয় আপনি ?'

'নব্যেন্দু আমাকে তুমি চিনতে পারছ না ভাই ?'

তৎক্ষণাৎ সমস্ত শরীরে কাঁপন লাগল। হঠাৎ দারুণ শীত করতে লাগল নব্যেন্দুর। ওই ভাই শব্দটার উচ্চারণ তাকে একটানে নিয়ে গেল আটচল্লিশ সালে, তারপর নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে টেনে টেনে সাতষট্টিতে যখন এ'রা বেরিয়ে গেলেন দল ছেড়ে। কিন্তু কি চেহারা হয়েছে এ'র। এইরকম বিধ্বস্ত অবস্থায় কোনোদিন কল্পনা করে নি ওঁকে। সেই 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' দিনগুলোতেও এমনভাবে ভেঙে পড়তে দ্যাখে নি সে। কিন্তু এই মানুষটির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। কোনো রকম সাহচর্য বেআইনী, সাহায্য নিষিদ্ধ। পার্টি একবার তাকে নির্দিষ্ট কারণে বহিষ্কার করেছে তার কি প্রয়োজন এখানে, এত রাত্রে ?

'আমায় সত্যি চিনতে পারছ না ?'

মাথা নাড়ল নবেন্দু, হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'
'আমি তিনদিন অভুক্ত। অন্ধ্র থেকে একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। দিনটা গুলিয়ে ফেলায় আজই এসে গেছি এই শহরে। অর্থ নেই যে হোটেলে উঠব। আর এই বৃষ্টিতে পথেও কাটানো অসম্ভব। তোমার কথা মনে পড়ল। তুমি আমাকে একটা রাত থাকতে দেবে ভাই?' একটা হাত থরথর করে কাঁপছিল। সেটা সামান্য এগোল।
বুকের মধ্যে এখন লোহার বল নড়ছে। একি বলছে জগদীশদা। দল বিরোধী কাজ এবং উগ্রমানসিকতার জন্যে বিতাড়িত মানুষকে সে আশ্রয় দেবে দলের সক্রিয় সদস্য হয়ে। অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে নানান অভিযোগের ছুরির সামনে দাঁড়াতে হবে তাকে। এটা অপরাধ। অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নাড়তেই জগদীশ বললেন, 'দেবে না? নবেন্দু আমি তোমার কাছে ভীষণ আশা নিয়ে এসেছিলাম। এই বৃষ্টিতে বাইরে থাকলে আমি বাঁচব না। কত রাত ভালো করে ঘুমুইনি। উপোসের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজলে এই বয়সের শরীরটা মানাতে পারে না। এই পুরোন শহরে ফিরে এসে তোমার কথা মনে পড়ল। কত বছর আমরা একসঙ্গে আন্দোলন করেছি। সেই আটচল্লিশে পুলিশের—।'
নিঃশ্বাস নিলেন জগদীশ। একটানা কথা বলায় বোধহয় হাঁপ ধরেছিল।
নবেন্দু একবার ভেতরের ঘরের দরজা দেখল। ললিতা কি এসব শুনতে পাচ্ছে? না, এখন চাপা গলায় কথা বলছেন জগদীশদা। ওঘরে হ্যারিকেনের আলোয় ছায়া পড়ে নি। সে স্পষ্ট বলল, 'কিন্তু আপনি আমাদের পার্টির শত্রু।'
'পার্টির হতে পারি, তোমারও কি? আমরা দুজনেই কম্যুনিস্ট।'
'আমার দল আগে তারপর আমি;'
'আর মানুষ। আমাদের মানবিক সম্পর্ক! নবেন্দু, আমিই তোমাকে হাত ধরে মার্ক্সিজম শিখিয়েছিলাম। মনে পড়ে? আজকের রাতটা থাকতে দাও আমাকে। এই বৃষ্টির রাত্রে কেউ একথা জানতে পারবে না। কোনো মানুষ পথে নেই। কথা দিচ্ছি ভোর হবার আগে আমি চলে যাব। আমি আর পারছি না, একটু ঘুমুতে দাও।'
নবেন্দু মাথা নাড়ল। দীর্ঘকালের সংস্পর্শ, অনেক কৃতজ্ঞতা তাকে সপ্তরথীর মতো ঘিরে ধরেছিল। একটা রাত তো। কেউ জানবে না। ললিতা পর্যন্ত জগদীশদাকে চিনতে পারে নি। কাকপক্ষী জাগার আগে যদি মানুষটা ঘুমিয়ে নিয়ে চলে যান তাহলে—। সে মাথা নাড়ল আবার, 'ঠিক আছে, এই সোফায় শুয়ে পড়ুন। ভোরের আগেই চলে যাবেন। ওপাশে একটা বাথরুম আছে।'
'তুমি আমাকে বাঁচালে নবেন্দু।' যেন প্রাণ ফিরে পেলেন বৃদ্ধ।
'ললিতাকে আমি বলব আপনি আমার সহপাঠী নবীনের বড়দাদা।'
ভারী পায়ে ঘরে ফিরে আসতেই ললিতা প্রশ্ন করলো, 'কে গো?'
উত্তরটা মুখেই ছিল, জানিয়ে দিল নবেন্দু 'রাত্রে থাকতে চাইলেন, থাকবেন।'
'কোনোদিন নাম শুনিনি তো ওর। অবস্থা খুব খারাপ বলে মনে হলো।'
'হুঁ।' খসড়াটার ওপর নজর রাখলেও মন বসছিল না নবেন্দুর।

'খেয়ে নাও। রাত হয়েছে। ও হ্যাঁ, উনি খেয়ে এসেছেন?'
'কে?'
'তোমার বন্ধুর দাদা।'
'কি জানি। তুমি আমারটা দাও।'
'সেকি। বাড়িতে থাকবেন যখন জিজ্ঞাসা কর খাবেন কিনা।'
'থাকতে দিয়েছি তাই যথেষ্ট, আবার খাবার কি।'
'তাই কি হয়! ওঁর জামাকাপড় তো সব ভেজা। তোমার একটা লুঙ্গি দাও ওঁকে। অতিথি বাড়িতে থাকলে তাকে যত্ন করা উচিত।' ললিতা উঠে একটা পরিষ্কার লুঙ্গি আর তোয়ালে এনে দিল নবেন্দুকে। নবেন্দু তবু বলল, 'খামোখা নিজেদের খাবারের ভাগ—'
'চুপ করো তো। মাঝে মাঝে এমন উল্টো কথা বল তুমি আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'
শুকনো পরিধানবস্ত্র এবং পেটভরা খাবার পেয়ে জগদীশ তৃপ্ত। একসঙ্গে খাওয়া হলো কিন্তু কোনো কথা হলো না তেমন। নবেন্দু লক্ষ্য করলো জগদীশের শারীরিক পরিবর্তন এত বেশী যে তাকে চট করে চিনে ফেলা অসম্ভব। ললিতার পক্ষে তো নয়ই। তাছাড়া ওর হাতে গলায় একধরনের চর্মরোগ এবং মুখের খোলা জায়গায় চামড়া কুঁচকে থাকায় পরিচিতি লোপ পেয়েছে।
পাশের ঘরে জগদীশের নাক ডাকছিল। সোফায় পড়ামাত্র ঘুমে কাদা হয়ে গিয়েছেন মানুষটা। বোঝাই যায় দীর্ঘকাল উদ্বেগ এবং অনিদ্রার পর আজ এই মুহূর্তে শান্তি পেয়েছেন। নিজের বিছানায় শুয়ে নবেন্দু ওঁর কথা ভাবছিল। আটচল্লিশ থেকে বাষট্টি একসঙ্গে কাজ করে যাওয়া, বাষট্টির পর দল বিভক্ত হলেও একই সঙ্গে থাকা এবং তারপর সাতষট্টিতে হঠাৎ দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষটির আজ আশ্রয় নেই, খাবার নেই, সামান্য স্বস্তির জায়গা নেই। কি লাভ হলো ওঁর দল ছেড়ে? অথচ কর্মী এবং সংগঠক হিসেবে জগদীশদার তুলনা ছিল না।
নবেন্দু সারা রাত ঘুমুতে পারল না। তার ভয় হচ্ছিল যদি সে ঘুমিয়ে পড়ে। যদি রোদ ঢোকার পরও জগদীশদা ঘুমিয়ে থাকেন এবং ভোরবেলায় অরুণ এসে পড়ে তাহলে বিপদ তারই হবে।
বিছানার একপাশে ললিতা ঘুমিয়ে আছে। অদ্ভুত স্নেহশীলা মহিলা। নইলে অপরিচিত মানুষকে যেচে খাবার দেয়। নবেন্দুর মনে হলো ললিতাদের মতো মেয়েদেরই পার্টির প্রথম সারিতে এগিয়ে যাওয়া উচিত। তাহলেই দেশের সাধারণ মানুষ ওদের ভালবাসা পাবে। কিন্তু এই নির্বাচন না লড়ে যে উপায় নেই। এটা এখন আত্মসম্মানের পর্যায়ে চলে গেছে।
তখন চারটে বাজে কি না বাজে। নবেন্দু বিছানা থেকে নামল। আর একটু বাদেই ভোর হয়ে যাবে। জগদীশদার এখনই চলে যাওয়া উচিত। বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। সে ললিতার দিকে তাকাল। ঘুমে অচেতন হয়ে আছে মেয়েটা।

নিঃশব্দে বাইরের ঘরে চলে এলো নব্যেন্দু। জগদীশের মুখ হাঁ, চোখ বন্ধ। শরীর এলানো। হ্যারিকেনটার আলো সামান্য বাড়িয়ে সে ওঁকে ডাকতেই তড়-বড় করে উঠে বসলেন তিনি। খুব ভীত এবং সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল ওঁকে। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওঃ তুমি!'

'ভোর হয়ে আসছে।'

'তাই বুঝি।' এখনও শরীরে ঘুম এবং ক্লান্তি। কিন্তু জগদীশ উঠে দাঁড়ালো, 'বড় জোর ঘুম এসেছিল গো। বৃষ্টি থেমেছে?'

'হ্যাঁ।' নব্যেন্দু একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা জগদীশদা, এইসব করে আপনারা কি পেলেন? কি লাভ হলো?'

'কি সব?' জগদীশ তৈরি হচ্ছিলেন।

'এই হঠকারিতা। উগ্রপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের শান্তি নষ্ট করা?'

হাসলেন জগদীশ। তারপর বললেন, 'এবার চলি ভাই। তোমার স্ত্রীকে ধন্য-বাদ দিও। জানিনা আবার দেখা হবে কিনা কিন্তু তুমি আমার আশীর্বাদ নিও।'

দরজাটা নিঃশব্দে খুলে বাইরে তাকালেন জগদীশ। তখনও অন্ধকার পথ জুড়ে। সকালের দেরি করিয়ে দিচ্ছে মেঘলা আকাশ। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে জোর। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জগদীশ বললেন, 'কি লাভ হলো জিজ্ঞাসা করছিলে তুমি। লাভ নিশ্চয়ই হয়েছে। পঁচাত্তর কোটি মানুষের বুকে একটা খোঁচা লাগল তো! সাতষট্টি থেকে একাত্তর আমরা যা করেছিলাম তার বাস্তব কোনো মূল্য নেই কিন্তু তোমরা যারা মার্ক্সবাদে বিশ্বাস কর তাদের বিবেকে যদি সামান্য আঁচড় লাগে তাহলেই তো বড় লাভ, বড় পাওয়া। তাই না?'

আবছা অন্ধকারে বেরিয়ে গেল জগদীশ। শরীরটা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। দরজা বন্ধ করে সোফায় এসে বসল নব্যেন্দু। চুপচাপ। একটা অস্বস্তি এলো, আশংকার বোঝা মাথার ওপর থেকে নেমে গিয়ে হঠাৎ আর একটা কিছু জন্ম নিল, জন্মস্থান হৃদয়।

রোদ উঠল ঝলসিয়ে। কিন্তু তার রঙে হলদের ঝোঁকটা বেশী। কেমন ফ্যাকাশে, নীরক্ত।

কিছুটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল নব্যেন্দুকে। কেন মানুষটা কাকভোরে বেরিয়ে গেল এক কাপ চা-ও না খেয়ে? নব্যেন্দুর ভদ্রতায় আটকানো উচিত ছিল। ললিতার মুখের দিকে না তাকিয়ে নব্যেন্দু বলেছিল নিজেকে, ছিল। সবই ছিল। কিন্তু রাখতে পারিনি। সেই সঙ্গে সে ভীষণ হালকা হয়েছিল। এক রাত্রের যাতায়াতে কোন কেউ উঠবে না কোথাও। কিন্তু সারাদিন একটু একা হলেই জগদীশের শেষ কথাটা বুকে ঝাপটা মারছে। কি বলতে চেয়েছেন জগদীশদা। দীর্ঘকাল একসঙ্গে পুলিশের কাছে মার খেয়ে খেয়ে যখন পুলিশের ওপর হুকুম করার সুযোগ এল তখন জগদীশদারা আবার ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। এখন তারা যা করছে সেটাই তো কাম্য ছিল, নাকি ছিল না? রাষ্ট্রযন্ত্র হাতের মুঠোয় আসার পরও কেনও এত অতৃপ্তি থেকে যায়।

কিন্তু এইসব চিন্তাভাবনা সাময়িক। সারাদিন রাত এত কাজ, দলের হয়ে মিটিং

মিছিল আর সমাবেশ করে এইসব চিন্তা মাথা থেকে উধাও হতে দেরি হল না নব্যেন্দুর। দুদিন বাদে হঠাৎ একটা জরুরী মিটিং-এর সমন পেয়ে চমক লাগল তার। কেন্দ্রীয় নেতা আসছেন আগামী নির্বাচন এবং দলীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে। প্রত্যেক দায়িত্বশীল সদস্যকে সেদিন অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

মিটিং শুরু হলো। অন্য কয়েকটা এজেন্ডার পর লোকাল কমিটি সম্পাদক নির্বাচন প্রসঙ্গ। হঠাৎ কেন্দ্রীয় নেতা বললেন, 'এবং আগে একটি নির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা দরকার। আমাদের একজন কমরেড যার ওপর পার্টি আস্থা রেখেছিল, তিনি দলবিরোধী কাজ করছেন। আমরা তাঁর কাছে জানতে চাইব তিনি কি করে পার্টি থেকে বিতাড়িত জগদীশবাবুকে রাত্রে নিজের বাড়িতে আশ্রয় এবং খাবার দেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন পুলিশ যাকে খুঁজছে, পার্টির প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাকে আশ্রয় দেওয়া জঘন্য অপরাধ।

এই ঘরে একটা আলপিনের শব্দও বুঝি শোনা যেত। বিস্ময়ে প্রতিটি মানুষ অন্যকে লক্ষ্য করছে॥ নব্যেন্দু চোখ তুলল। ললিতা কাঠের পুতুলের মতো বসে আছে। মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। সে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল।

কেন্দ্রীয় নেতা এবার সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'কমরেড নব্যেন্দু, এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য জানতে চাই।

নব্যেন্দু অনেক কষ্টে শীত ভাবটাকে প্রতিকূল করল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনি এক বৃষ্টির রাত্রে জগদীশবাবুকে আশ্রয় দিয়েছিলেন?'

'না।' মাথা নাড়ল নব্যেন্দু।

'আপনি তথ্য গোপন করতে চাইছেন। এতে আপনার দায়িত্ব আরও বেড়ে যাচ্ছে।'

'আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি। সেইরাত্রে আমি দরজা খুলিনি। আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে।'

ললিতা মাথা নাড়ল, 'আমি দরজা খুলেছিলাম। সেদিন লোডশেডিং ছিল। জগদীশকে আমি চিনতে পারিনি। উনি আমার স্বামীর খোঁজ করছিলেন তাই ওঁকে ডেকে দিয়েছিলাম।'

কেন্দ্রীয় নেতা এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এরপরে তাকে রাত্রে থাকতে দিয়েছিলেন। খাবার দিয়েছিলেন। নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দিয়েছিলেন স্ত্রীর কাছে মিথ্যেকথা বলে।'

নব্যেন্দু মাথা নাড়ল, মোটেই নয়। আমি ওঁকে খাবার দিতে চাইনি। আমার স্ত্রী জোর করে ওঁকে খেতে দেন, পরিষ্কার লুঙ্গি দিতে বলেন।'

ললিতা বলল, 'সত্যি নয়। এসব করেছিলাম যেহেতু আমায় বলা হয়েছিল উনি আমার স্বামীর বাল্যবন্ধুর দাদা। তাই।'

নব্যেন্দু বলল, 'কথাটা সত্যি। জগদীশদা আর বাল্যবন্ধুর অগ্রজ।'
কেন্দ্রীয় নেতা হাসলেন, 'তাই শেষরাত্রে গোপনে রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন আপনারা ?'
চমকে তাকাল নব্যেন্দু। আর ললিতা না-কাঁপা গলায় জানাল কি করে সেই রাত্রে সে নিজেকে সংবরণ করেছিল। গোপনে নব্যেন্দুর উঠে যাওয়া, জগদীশের সঙ্গে আলোচনা এবং যাওয়ার সময় জগদীশের কিছু জ্ঞানগত উপদেশ পাওয়ার পর নব্যেন্দুর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা সে খুঁটিয়ে বিবৃত করল। এখন প্রতিটি মুখ নব্যেন্দুর দিকে ফেরানো।
কেন্দ্রীয় নেতা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন কেন ?'
ললিতার গলা কাঁপল না, 'আমি আমার পার্টির প্রতি অনুরক্ত। মার্কসীয় জীবনদর্শনে বিশ্বাসী। আমার স্বামী যদি সেই বিশ্বাসে অংশীদার না হতে পারেন সেটা অন্যকথা কিন্তু পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হয় এমন কাজ করায় তিনি আমার শ্রদ্ধা হারিয়েছেন।'
সমস্ত ঘরে যেন লক্ষ পায়রা উড়ল। হাততালিতে কান বন্ধ হয়ে গেল। একজন শ্লোগান দিয়ে ফেলল চাপা গলায়, 'কমরেড ললিতা জিন্দাবাদ।'
কেন্দ্রীয় নেতা বললেন, 'নব্যেন্দুবাবু, এই নির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে আমার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাবো। ওঁরা যতদিন কোনো সিদ্ধান্ত না নিচ্ছেন ততদিন আপনি পার্টির কোনো সংগঠনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না।'
নব্যেন্দু উঠে দাঁড়ালা, 'আমাকে কি সাসপেণ্ড করা হলো ?'
'ব্যাপারটা সেই রকম।'
নব্যেন্দু চুপচাপ বেরিয়ে এলো। এখন বেশ রাত। টুপটাপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার। নব্যেন্দু হাঁটতে হাঁটতে গলির মুখে চলে এলো। তার মাথার ভেতর শূন্য হয়ে গেল। ওরা শুধু অভিযোগ করে গেল কিন্তু কেউ জানতে চাইল না কেন সেদিন সে জগদীশকে আশ্রয় দিয়েছিল। এমন কি ললিতাও এই প্রসঙ্গে তার সঙ্গে কোনো কথা বলে নি। ললিতার সঙ্গে এতকালের সম্পর্ক অথচ সে-ও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি একবার। কিন্তু দলের কাছে গোপন রিপোর্ট পাঠাতে দেরি করে নি।
এতবছর একসঙ্গে বাস করেও যদি এতটা ফারাক হয়ে যায় দুটো মানুষের মধ্যে তাহলে অনেককাল একটি পার্টির জন্যে যৌবন এবং শ্রম দান করেও এই ব্যবহার পাওয়া স্বাভাবিক। সেই রাত্রে কেউ সাক্ষী ছিল না। ললিতা যা বলেছে তা মিথ্যে প্রমাণ করতে সে যদি তৎপর হয় তাহলে ওই বেচারা মুশ্‌কিলে পড়বে। কি দরকার! নব্যেন্দু হাসল, জগদীশদার শেষ কথাটা মনে পড়ল। বুকের ভেতর একটা আঁচড় লেগেছিল তাই বাইরের এই আঘাতটা খুব বড় মনে হচ্ছে না। বরং ললিতা তাকে সাহায্যই করল। লোকাল কমিটির সম্পাদক আর তাকে হতে হচ্ছে না। কোনো লক্ষ্যহীন পথে এগিয়ে যাওয়ার ভাঁওতায় ভুলে থাকতে হবে না। কিন্তু, নব্যেন্দু মাথার ওপর ছাতা খুলল, ললিতার সেক্রেটারী

হিসেবে নির্বাচন সুনিশ্চিত। স্বামী এবং দলের মধ্যে শেষটাকেই এ সম্মান দিল নিজস্ব বিচারে। এখন কি ও একসঙ্গে থাকতে চাইবে?

বৃষ্টি পড়ছে। পার্টির মিটিং ভেঙে গেল। নবেন্দু একটা আড়াল দেখে দাঁড়িয়ে রইল। মানুষজন বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর ললিতাকে দেখতে পেল না। গলি দিয়ে দ্রুত পায়ে আসছে সঙ্গে অরুণ। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অরুণ বলল, 'চল ললিতাদি, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। বৃষ্টি পড়ছে।'

'না না, কোনো দরকার নেই, আমি একটা রিক্সা নিয়ে নেব। তুমি কাল সকালে অবশ্যই বাড়িতে এসো।' ললিতার গলার স্বরে কর্তৃত্ব।

'কিন্তু নবেন্দুদা যদি বাড়িতে ফিরে—'

'ওসব ভয় করো না। তাহলে তো বাঁচা যায় না।' কথাটা বলে ললিতা বৃষ্টি মাথায় করে হাঁটতে লাগল। অরুণ চলে গেল উল্টো রাস্তায়।

নবেন্দু দ্রুত কয়েক পা হেঁটে ডাকল, 'শোন।'

চমকে ফিরে তাকাল ললিতা। রাস্তার ভিজে আলোয় তাকে অদ্ভুত নার্ভাস দেখাল।

নবেন্দু হাসল, 'বৃষ্টিতে ভিজো না।' ললিতার মুখ তখন রক্তশূন্য, চোখে বিস্ময় এবং ভয়। ছাতাটা এগিয়ে দিল নবেন্দু, 'এটা রাখো।'

দেশলাইয়ের বাক্স এবং নির্বারুদ কাঠি

সিগারেটের তামাক সরু তার দিয়ে পটু হাতে বের করে চেটোয় রাখল নীতা, তারপর কাগজের পুরিয়া খুলে বস্তুটি মেশালো সেই তামাকে। পুনরায় ফাঁকা সিগারেটটা নব্য মশলা দিয়ে টাইট হয়ে যেতেই একটা অপার্থিব আনন্দ ফুটল নীতার মুখে। অদ্ভুত উচ্চারণে ইংরেজি বলল সে, 'কে প্রথম ভালবাসবে ?'

তিনটি হাত উঠল। জিনা বলল, 'হা-ই, আমি ভালবাসার জন্যে মরে যাচ্ছি!'

সীতা মাথা নাড়ল, 'ও মাই সুইটি স্টিক, লিটল স্টিক।''

নীতা চোখ পাকাল, 'সিলি! একজন হাত তোলে নি। অতএব সে-ই শুরু করবে।' সিগারেটটা এগিয়ে দিল সে রিয়ার দিকে।

নীতাদের এই ঘর ভরতি বই। এত বই, বিভিন্ন বিষয়ের বই যে রিয়ার মনে হয় এখানে তাকে সারাজীবন বন্দী করে রাখলে ক্ষতি হতো না। এই ঘরে কোনো চেয়ার নেই। দামী কার্পেটের ওপর আধশোয়া হয়ে ও ফিউচার শক পড়ছিল। মুখ না তুলে হাত নাড়ল, 'নো, আই কান্ট স্ট্যান্ড।'

'ইটস মাইন্ড। ফ্রেস ফ্রম মণিপুর।' নীতা উঠে দাঁড়াল সিগারেটটা নিয়ে, 'কি বই ওটা ? ফিউচার শক্ ? দ্যাটস রাবিশ। টেক দিস শক অ্যান্ড ইউ উইল ফিল সামথিং!'

রিয়া বান্ধবীদের দিকে তাকাল। ওই সিগারেটের ভেতর আজ নীতা কি পুরেছে তা সে জানে না। হয়তো কোনো ড্রাগ, পাউডার বা স্রেফ গাঁজা। কড়া ধাতের গাঁজা। আর তার টান নেবার জন্যে প্রত্যেকে উদগ্রীব। এই সব মেয়েরা, রিয়ার বন্ধুরা ছেলেদের পাত্তা দেয় না। প্রেমট্রেম এদের ধাতে সয় না। ওদের জিজ্ঞাসা করলেই বলবে, যে কোনো একটা লোককে তুলে নাও এবং তার নাম দাও, যে কোনও নাম দাও, দেখবে সেই লোকটাকে ওই নামে চমৎকার মানাবে। ছাত্রী হিসেবে এরা প্রত্যেকেই ভালো ছিল, পড়াশুনা কারোরই খারাপ নয়, 'উই লিভ অন ড্রাই।'

এই কথাটা এখন খুব চালু নিজেদের মধ্যে। ডোন্ট গে ফর ওয়াটার, উই লিভ অন ড্রাই। নীতাদের এই ঘর, এই আড্ডা রিয়ার খারাপ লাগে না। শুকনো মাদক তাকে তেমন টানে না। মাঝে মধ্যে সংগ রাখার জন্যে সে দু-একটা টান দেয় মাত্র। সেই মুহূর্তে মাথার ভেতরে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। শরীরে ঝিম লাগে। অলস অবসন্ন সময় ফুড়ুৎ করে ফুরিয়ে যায়।

কিন্তু বেশির ভাগ দিনই সে বই নিয়ে আধশোয়া হয়। নীতার এই ঘরে বাড়ির কেউ ঢোকে না, ঢুকবে না। বাড়ির কেউ বলতে নীতার মা। বাবা থাকেন জলে। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান জাহাজের কাজে। মা সোস্যাল ওয়ার্কার। প্রায় প্রত্যেকের, এই ঘরে যেসব মেয়ে আছে, প্রায় প্রত্যেকের মা ডিগনিফায়েড সোস্যাল

ওয়ার্কার। এক একটি চীজ সব। রিয়ার নিজস্ব মা পর্যন্ত। কোয়ালিটিতে দুপুরের বিয়ার পার্টিতে না গেলে সামাজিক কর্তব্য করা হয় না।
নীতার প্রসারিত হাতের দিকে তাকিয়ে রিয়ার হঠাৎ মনে পড়ল ওর কোনো আত্মীয় নেই। বাবা মা এবং সে। সত্যি কথা বলতে কি ওর বান্ধবীদেরও একই দশা। কারো কারো হয়তো একটি ভাই বা বোন থাকতে পারে। কিন্তু সেই সব পিসি মাসি কাকা কাকিমাদের দিন ওভার। তাদের নিজেদের ফ্ল্যাটে ওসব মানুষ জন্মইস্তক আসেন নি। বাবা রাখেননি তাঁর পূর্ব-পরিবারের সঙ্গে কোন যোগা-যোগ, মা ছেদ করেছেন তাঁর বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক।
সিগারেটটা হাতে নিয়েই হেসে ফেলল রিয়া। নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? এটা কি তোমাকে হাসির কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে?'
'নো! ছোট পরিবার সুখী পরিবার।'
'সো হোয়াট?'
'আমাদের পরিবারগুলো এত ছোট যে বাড়ি গেলে কেউ কারো দেখা পাই না। আগুন জ্বালাও।'
একটা নীলচে আগুন আর তারপরই গলা দিয়ে নেমে যাওয়া ধোঁয়ার সোয়াদ চোখে আবেশ আনল। রিয়া টের পেল না সিগারেটটা ততক্ষণে হাত বদল হয়ে গেছে। উৎকট একটা গন্ধ তখন ঘরে পাক খাচ্ছে।
'ফিউচার শক' বইটা সরিয়ে রেখে দু পা ছড়িয়ে বসল রিয়া। আজ শুক্রবার। কারো বাড়িতেই খোঁজখবর করার কেউ নেই রাত দুটোর আগে। উইক-এণ্ড কাটাতে বাবা মায়ের দল কলকাতার লম্বা লম্বা ফ্ল্যাট বাড়ির যে কোনো একটায় ড্রিঙ্কস নিয়ে বসে গেছে। কিংবা ভিসি আর-এ লেটেস্ট হট কিছু একটি তাদের সময় জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এই চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে থমকে থাকা বাবা এবং মায়েরা সারা সপ্তাহ খেটে আজ বড্ড ক্লান্ত। তাই নীতারা চুটিয়ে আনন্দ নিচ্ছে গলায়।
হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে টলে গেল রিয়া। তারপর নিজেকে সতর্ক করে বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। এই সময় টয়লেট ছাড়া কেউ কোথাও যায় না। মাঝ-রাতে নীতার গাড়ি প্রত্যেককে ড্রপ করে দেবে দেশলাই বাক্সমার্কা ফ্ল্যাটগুলোর গেটে। ওই বুড়ো ড্রাইভারকে সবাই জনি বলে ডাকে আদর করে। রিয়ার তো ওই কালো বৃদ্ধটিকে দেখলেই আঙ্কল টমের কথা মনে পড়ে। হি ইজ সো নাইস। নেশাগ্রস্ত কয়েকটা মেয়েকে কি মমতায় ঘরে ঘরে পোঁছে দিয়ে যায়। নীতার বাবা মা বোধহয় সে খবর রাখে না।
পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়িটা ছেড়ে রিয়া বেরিয়ে এলো। ওর পরনে জিনস আর সাদা শার্ট। পায়ে হাওয়াই চটি। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসটার স্পর্শ পাওয়ামাত্র মাথা ধরে গেল আচমকা। কেমন বমি বমি পাচ্ছে। এখন রাত অনেক। কত? হু কেয়ারস? নীতাদের বাড়ি থেকে ওদের ফ্ল্যাটটা বেশি দূরে নয়। এই সব বড়-লোকি পাড়ার রাস্তায় চমৎকার আলো জ্বলে। বাস ট্রাম চলে না। মাথা ধরা সত্ত্বেও হাঁটতে বেশ ভালো লাগছিল ওর। ওদের বাড়িতে নিষিদ্ধ একটি গান

হঠাৎ চিৎকার করে গাইতে ইচ্ছে করল, দোলাও দোলাও আমার হৃদয়!
বাংলা পড়তে জানে না রিয়া, কারণ তাকে কখনও সেটা পড়ানো হয় নি। বাড়িতে কোনো বাংলা গপ্পের বই নেই। থাকলেও সেটা হিব্রু কিংবা টিবেটিয়ান বলে মনে হতো রিয়ার কাছে। নেই তাই রক্ষে। বাংলা রেকর্ড নেই। মা বলেন, 'বাংলা-গান মানেই তো প্যানপেনে রবীন্দ্রসঙ্গীত। শুনলেই নপুংসকদের কথা মনে হয়।'
বাবা বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের বাইরেও গান আছে হনি। ছিলও।'
মা খিলখিল করে হেসেছিলেন, 'সকল দেশের সেরা আমার জন্মভূমি? ওই মিথ্যে কথা সুর করে গাইলেই গান বলতে হবে? বি স্মার্ট রিয়া, জীবনটাকে টগবগে করো, বাঙালি সেন্টিমেন্ট ধোপার দেওয়া মাড়ের মতো। সুতির কাপড় শক্ত করে কিন্তু দুর্গন্ধ ছড়ায়। ওসব এ বাড়িতে বলবে না।'
দোলাও দোলাও তোমার আপন—। লিফটম্যানকে দেখে চুপ করে গেল রিয়া। এই লোকটা বাঙালি। যদি গানটা জানা থাকে তাহলে হয়তো ভুল ওয়ার্ডিং কিংবা টিউন ধরে ফেলবে। সোঁ সোঁ করে ওদের ফ্লোরে চলে এসে শান্তি।
তিনবার বোতাম টিপলো রিয়া। ভেতর থেকে কোনো শব্দ নেই। তারপর হিপ পকেট থেকে কিছু টাকা আর চাবি বের করল। এই ফ্ল্যাটের তিন বাসিন্দার জন্যে তিনটে চাবি বরাদ্দ। যে যখন ইচ্ছে ঢোক এবং বের হও।
ড্রইং রুমেই পরিচিত দৃশ্য। বাবা চিৎ হয়ে পড়ে আছেন সোফায়। মাথার পাশে পিটার স্কটের বোতলটা খালি। গ্লাসে এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। টাই দূরের কথা, জুতো পর্যন্ত খোলেন নি বাবা। মুখ হাঁ। আউট, মাই পাপা ইজ আউট। রিয়া এগিয়ে এসে বাবার পাশে দাঁড়াল। সামান্য ঝুঁকল। কালো রঙ, সামান্য ফেড হয়ে যাওয়ায় লালচে রুপোলি চুল ঝিলিক মারছে। এই মুহূর্তে বাবাকে খুব বুড়ো মনে হচ্ছিল। বুড়ো এবং অসহায়। কফিনে শুইয়ে দিলে বোধহয় চমৎকার শান্তি পেত। ভোর অবধি এইভাবেই পড়ে থাকেবেন বিখ্যাত কোম্পানির ডিরেক্টর। সকালে ক্লিন সেভ্ড হয়ে ঝকমকে হাসবেন, বলবেন হা-ই।
রিয়া মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়াল। নীলচে আলো জ্বলছে। কোনো শব্দ নেই। সে নিচু গলায় ডাকল, 'মাম্মি!' দুটো মুহূর্ত, কোনো সাড়া এল না। ভারি পর্দা সরিয়ে পা বাড়াতে শূন্য ঘর চোখে এল। ঘড়িতে তখন দুটো কোকিল পালা করে ডেকে জানাল বারোটা বাজছে। মায়ের বিছানার পাশেই ম্যাগনেটিক রিসিভার। ন্যুয়র্ক থেকে আনানো। কড্‌বিহীন রিসিভার নিয়ে এই ঘরের যে কোনো প্রান্তে গিয়ে কথা বলা যায়। রিয়া টেলিফোনের বোতামটা টিপতেই মায়ের কণ্ঠস্বর কানে এল, 'হা-ই, গোয়িং আউট ফর দা নাইট। ডোন্ট ওয়েট ফর মি।'
বোতামটা ছেড়ে দিতেই ঘর শান্ত। মেসেজ রেখে গেছেন সোস্যাল ওয়ার্কার। উইক এন্ড কাটাতে গেছেন তিনি। সারারাত আমি চরে বেড়াবো, আমার জন্যে কেউ বসে থেকো না। অন্তত বাবা বসে থাকেন নি। ছাব্বিশ আউন্স পেটে পুরে

সটান পড়ে আছেন।
এই বাড়িতে ঝি চাকর নেই। ঠিক নেই বললে ভুল হবে। একটা নেপালী ছোঁড়া আসে ভোরে। ব্রেকফাস্ট করে দিয়ে চলে যায়। আর সব সেলফহেল্প। মা বলেন পৃথিবীর যেকোনো সভ্যদেশে এটাই নিয়ম। তোমার খাবার তুমিই করে নেবে। ফ্রিজে সব রাখা আছে। সপ্তাহে দুদিন মায়ের ড্রাইভার সেগুলো কিনে এনে দেয়। যেহেতু ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় তাই নেপালিটির আগমন, নইলে সেটাও বন্ধ হলে মা খুশি হতেন। বাবার সমস্ত আধুনিকতা এখানেই হোঁচট খায়। কিন্তু—এই বাড়িতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মায়ের। মা লাঞ্চ ডিনার বাড়িতে খাচ্ছে এমন দিন হাতে গোনা যায়।
নিজের ঘরে ফিরে এলো রিয়া। এখন তার শুয়ে পড়া উচিত অথচ ঘুমের কোনো সম্ভাবনাই নেই। বরং উৎকট মাথা ধরে আছে। এই ছোট পরিবারে কেউ নেই যার সঙ্গে কথা বলা যায়। খুব আফসোস হচ্ছিল ওর। ফট করে না উঠে এসে নীতাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কাটালে, নেশাটা জমতো। আচ্ছা, এখন স্নান করলে কেমন হয়?
টয়লেটের সঙ্গেই শাওয়ার। জানলাটা খুলতেই ঝকঝকে আকাশ চোখে পড়ল। নীতাদের ওখান থেকে আসবার সময় খেয়াল হয় নি আজ জ্যোৎস্নার রাত। একটু বেড়ালে কেমন হয়? একটু ঘুরে বেড়ালে। এই রাত দুপুরে? চমচমে জ্যোৎস্না কিরকম কিলবিল করতে লাগল রিয়ার সামনে। সে পোশাক না ছেড়ে বেরিয়ে এলো। পিতৃদেব তখনও একই অবস্থায় পড়ে আছেন। বাবা কতদিন তাঁর বাবাকে দ্যাখেননি কে জানে? রিয়া শুনেছে ওই বুড়ো মানুষটা মালদার একটা গ্রামে বাস করেন। বাবার মা মারা যাওয়ার খবর এলে যে সব নিয়ম পালন করতে হয় তা এ বাড়িতে করা হয় নি। তখন রিয়া আরও ছোট ছিল, কেন হয় নি তা সে জানে না। তবে সেই মুহূর্তে মায়ের আড়ালে বাবাকে খুব দুঃখী বলে মনে হয়েছিল, তা ঠিক। এই সময় যেমন বাবাকে খুব সরল বলে মনে হচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষ কোনো প্রিটেনসন করতে পারে না এই জন্যেই কি?
দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রিয়া। লিফট নয়, সিঁড়ি ভেঙে সে নামছিল। নামবার সময় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। আমার শরীর ঠিক আমার না। পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরে নিঃশব্দে হেঁটে যাওয়ার মতো এই নামা। প্রতিটি ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। এই সফিস্টিকেটেড ম্যাচবক্স বস্তিটার মানুষজন বাইরে নেই। শুধু আমিই নেমে যাচ্ছি।
গেটের বাইরে এসে তার মন ধাতে এল। কোথায় যাওয়া যায়? এসব জায়গায় ডাকাতি বা ছিনতাই হয় বলে শোনা যায় না। আমি একটু আমার মতো পৃথিবীতে হাঁটতে চাই, খামোকা কেন তাতে বাধা দেবে কেউ? নিজের কাছে গড়ে নেওয়া এই সরল বিশ্বাসে আশ্বস্ত রিয়া পা ফেলতে লাগল। ভালবাসার গন্ধের মতো কিংবা ঘুমন্ত শিশুর হাসির মতো একটা জ্যোৎস্না বেরিয়ে আসছিল চাঁদের শরীর থেকে। আর তাতে ক্রমশ জবজবে হয়ে যাচ্ছিল রিয়া। এমন একটা সুখের সন্ধান সে কখনও পায় নি। এরকম রাত কখনও বলে না

ডোণ্ট ওয়েট ফর মি। বরং সেই দোলাও দোলাও শব্দ দুটো বারংবার ফিরে ফিরে আসে।
রিয়ার খেয়াল হলো লেকটার কথা। মাত্র মিনিট পাঁচেক দূরে সেই লেকটা, যেখানে এককালে সে বেড়াতে যেত। তখন একটা আয়া ছিল তার জন্যে। ফুট-ফুটে অনেক বাচ্চা আয়াদের গা ঘেঁষে বসে জল দেখত। অনেককাল সেখানে যাওয়া হয় নি। আজ গেলে কেমন হয়?
জ্যোৎস্না রাত্রে জলের মতো সুন্দরী আর কেউ হয় না। আকাশের মুখ জলের বুকে সাঁতরে সাঁতরে ভালবাসার ঘ্রাণ নেয় চাঁদের সংগ পেয়ে। একটা স্ট্যাচুর ধাপে বসে রিয়া এই দৃশ্য দেখছিল।
কখন চাঁদ মরে গেছে, কখন রাত ফুরোল কখন জলের রঙ কালো হলো রিয়া জানেনি। কারণ তার শরীর শীতল বাতাস পেয়েছিল, মাথা হেলেছিল স্ট্যাচুর স্তম্ভে। হালকা ঘুম ছড়িয়ে প্রকৃতি তার রাতের শেষ খেলা খেলে নিল। এবং তখনই কানে এল কিছু শব্দ। উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে কেউ কিছু শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছে। যার সুর এবং ধ্বনি অদ্ভুত একটা মায়ালোক তৈরি করে ফেলছে চারপাশে। রিয়া দেখল ভোর হচ্ছে। আকাশের অনেকটাই এখন লাল ছোপ মেখেছে। শব্দতরঙ্গ তাকে কৌতূহলী করছিল। ধীরে ধীরে সে পা বাড়াল। গাছের আড়াল সরতেই তার দৃষ্টিতে এক দীর্ঘকায় মানুষ ধরা দিলেন। তাঁর দুটো হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে আবদ্ধ। পরনে ধুতি এবং সাদা ফতুয়া। তন্ময় হয়ে সূর্যের প্রতীক্ষায় মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। সেই মন্ত্রের অর্থ রিয়ার জানা নেই। শব্দগুলো তার অবোধ্য। তবে সংস্কৃত বাক্যগুলোকে উচচারণে অনুমান করতে পারল সে। ঠিক সেই সময় আকাশকে চমকে দিয়ে জলের ওপর উঁকি মারল দিনের প্রথম সূর্য। লাল সোনালি আভায় পৃথিবী ছেয়ে যেতে বৃদ্ধ মন্ত্রপাঠ শেষ করলেন। তারপর প্রণাম জানিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই রিয়ার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো। রিয়া হাসবার চেষ্টা করল, 'হা-ই।'
বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যালো!'
রিয়া প্রশ্ন করল, 'তুমি এতক্ষণ কি করছিলে?'
বৃদ্ধ জবাব দিলেন। তাঁর উচ্চারণে দক্ষিণভারতের টান, 'প্রার্থনা করছিলাম। যাতে সূর্য ওঠে, অন্ধকার দূর হয়। তুমি বুঝতে পার নি?'
মাথা নাড়ল রিয়া, না।
'সেকি? তুমি তো ভারতীয়, তুমি সূর্যস্তোত্র শোন নি?'
'ভারতীয়!' রিয়া মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না। তুমি কি বলছিলে এতক্ষণ?'
দক্ষিণ ভারতীয় বৃদ্ধটি বললেন, 'আমি প্রার্থনা করছিলাম যাতে সূর্যদেব ওঠেন, জগতের মঙ্গল হয়, কারণ অন্ধকার মানেই অপবিত্র।'
রিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এই প্রার্থনায় তোমার কি উপকার হবে? তোমার তো বয়স হয়েছে। তাই না?'
বৃদ্ধ বললেন, 'বয়স? হ্যাঁ, তা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যারা পৃথিবীতে আছ, অনেকদিন থাকবে, এই প্রার্থনা তাদের উপকারে আসবে। আমরা সবসময় কি

নিজের জন্যে সব কিছু করি ?'
ঠিক সেই সময় একটি কিশোর দূর থেকে চিৎকার করে উঠল। ছুটে আসছিল সে পাগলের মতো। এসে জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধকে। তারপর দ্রুত নিজের ভাষায় কিছু বলে গেল। বৃদ্ধ সস্নেহে তাকে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে যেতে রিয়া আবার প্রশ্ন করল, 'এ তোমার কে হয় ?'
'নাতি। আমাকে ডাকতে এসেছে।'
'কেন ?'
'আমার ছেলে আর বউমা চায়ের টেবিলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, তাই।'
বৃদ্ধ হাসলেন। তারপর চলে যেতে যেতে বললেন, 'বাই।'
শূন্য জলের ধারে ভোরের রোদ কখনও কখনও জ্যোৎস্নার চেয়েও সুন্দরী করে তোলে প্রকৃতিকে। সেই আলোয় আলোকিত রিয়া জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। সে দেখল তার ঠোঁট নড়ছে। আর সমস্ত শরীর মন্থন করে অমৃতের স্বাদ মানা একটা শব্দ সেই ঠোঁটের ফাঁক গলে পৃথিবীর শরীরে মিশে গেল 'বা-ই।' তারপরেই বুক ভরে বাতাস নিল সে। নিয়ে বলল, 'বাই দাদু।'

পায়ের তলায় মাটি

নিঃশ্বাস ফেলার উপায় নেই শীতাংশুর। এতগুলো ব্যবসা এক সঙ্গে দেখা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু তিনি এই অসম্ভব কাজটি করে থাকেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওঁর বিছানায় শোওয়ার সময় বড়জোর পাঁচ ঘণ্টা, স্ত্রী লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে কথাবার্তার জন্যে পনের মিনিট বরাদ্দ। ষাট বছর বয়স অবধি, তাঁর কখনো জ্বর হয় নি, বড় রোগ তো দূরের কথা। ব্যবসাগুলো যেহেতু সফল তাই টাকা আসছে জলস্রোতের মতো এবং তার বেশীর ভাগই কালো ছাপ মারা। যদিও গতবার কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় প্রচুর বন্ড কিনে সেগুলোকে ফরসা করেছেন তবু তো আসার বিরাম নেই। শীতাংশুর মুশ্কিল, তিনি যাতেই হাত দেন তাই ঠিকঠাক লেগে যায়। আর টাকা এলে, সে কালো কিংবা সাদা যাই হোক না কেন, কেমন মমতা জন্মে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু লুকোবার সব খোপগুলো ঠাস হয়ে রয়েছে অথচ কিছু করার উপায় নেই। এক বন্ধু উপদেশ দিলেন, ছবি কর। আর্ট, ফিল্মের একজন নামী পরিচালককে দিয়ে ছবি করাও, দশ লাখ যাবে কিন্তু দারুণ পাবলিসিটি পাবে। ট্রামে বাসে পত্রিকার চিত্র সমালোচনায় তোমার নাম ছাপা হবে। এক আর্ট ফিল্মমেকার ছবি করলেই বিদেশের ফেস্টিভ্যালে যান, তুমিও প্রযোজক হিসেবে সঙ্গে যেতে পারবে। চাই কি প্রাইজ-ট্রাইজও পেয়ে যেতে পার। ব্ল্যাক টাকা কমল কিন্তু তুমি হোয়াইট হয়ে গেলে। ওসব ছবি তো দেশের মানুষ এক সপ্তাহের বেশী দ্যাখে না, তাই পুরো'টাই লস বলে ক্লেইম করতে পারবে সরকারের কাছে।

কথাটা মনে ধরলেও খুঁতখুঁতানি গেল না। হাজার হোক টাকা, জেনে শুনে জলে ফেলতে মন চায় না। পনের মিনিটের আলাপের সময় লাবণ্যপ্রভাকে প্রস্তাবটা জানালেন। লাবণ্যপ্রভার কোনো কাজ নেই। দিন দিন শুয়ে বসে আর নভেল পড়ে শরীর বড় স্ফীত হয়ে যাচ্ছে। ইদানীং টি ভি আর সিনেমা দেখে সময় কাটান। ঈশ্বর এমন অবিবেচক যে সন্তান পর্যন্ত দেন নি। কথাটা শুনে উজ্জ্বল হলেন তিনি। শীতাংশুর আর উপায় থাকল না। বন্ধুর সঙ্গে সেই পরিচালকের দ্বারস্থ হলেন পরদিন। বিশ্বখ্যাত পরিচালক তাঁকে কথা দিলেন দশ লাখের মধ্যেই ছবি হবে। বন্ধু জানালেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো. ওঁর লাস্ট বারোটা ছবি এক সপ্তাহের বেশী চলে নি। তোমার বিদেশ যাওয়া কে আটকায়! শীতাংশুর একটি ছোট্ট নিবেদন ছিল ' ছবির শুরুতেই তাঁর পিতার ফটোগ্রাফ দেখাতে হবে। পরিচালক অনেক যুদ্ধ করে সেটি মেনে নিলেন। ছবি মুক্তি পেলে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। তরতর করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাউস ফুল বোর্ড ঝুলিয়ে ছবিটি সুবর্ণ জয়ন্তী করে ফেলল। পরিচালককে শীতাংশু ফোন করলেন, একি হলো ?' পরিচালক বিষণ্ণ গলায় জানালেন,

'পাবলিক বিট্রে করেছে। আমি এ্যাদ্দিন বলতাম, যে-ছবি দর্শক বোঝে না সেইটাই ভালো ছবি। শালা আমাকে বেইজ্জত করতেই ছবিটা সুপারহিট হলো। এখন আর ফেস্টিভ্যালে এই ছবি নেবে না।'

বন্ধু বলল, 'ঘাবড়ে যেও না। হু হু করে টাকা আসছে যখন তখন এই ফাঁকে কালোগুলো সাদা করে নাও।'

ছবিটি তিনবার দেখেছেন শীতাংশু। লাবণ্যপ্রভা দশবার। পনের মিনিটের সাক্ষাতের সময় লাবণ্যপ্রভা বললেন, 'একটা কথা বলব?'

শীতাংশু শুয়ে শুয়ে একটা ভাগোর কথা ভাবছিলেন, বললেন, 'বলো।'

'ছবি দেখতে গেলেই মন খারাপ হয়ে যায়। লোকে বাবার ছবি দেখছে কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারছে না।'

'কি করব! বক্স অফিস হিট করলে ছবি প্রাইজ পায় না, কাগজেও ফটো ছাপা হয় না। লাকটাই খারাপ।'

'কিন্তু পাঁচজনের তো তোমাকে চেনা দরকার।'

কথাটা মনে ধরল শীতাংশুর। গাড়ি করে যাওয়া আসা করেন কিন্তু কেউ ভুলেও তাঁর মুখ দ্যাখে না। উত্তেজনায় তিনি উঠে বসলেন। রোজ প্রচুর লোক আসে তার কাছে সাহায্যের জন্যে। দান টান করার জন্যে তিনি রোজগার করছেন না। সবাইকে হটিয়ে দিতেন এ্যাদ্দিন। না, ভালো মতলব এসেছে। ঠাট্টার গলায় তিনি বললেন, 'তুমিও তো চেননি?'

লাবণ্যপ্রভা নাক ফোলালেন, 'ওমা! একি কথা! এই দ্যাখো!'

শীতাংশু দেখলেন লাবণ্যপ্রভা তাঁর বিশাল বুকের খাঁজ থেকে যে লকেটটা বের করলেন তার একদিকে শীতাংশুর ছবি। খুব ভালো লাগলেও একটু হতাশ হলেন তিনি। বুকের খাঁজে তার ছবি থাকলে পাবলিক দেখবে কি করে! থাকা আর না থাকা তাই সমান।

পরদিন সকালে কয়েকটা জরুরী কাজ মিটিয়ে এসে শুনলেন পাড়ার কালীপুজো কমিটি তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। হটিয়ে দিতে গিয়েও দেখা করলেন শীতাংশু। খরাত্রাণের জন্য একটা বিরাট জলসা হবে। ওরা কিছু সাহায্য চাইছে।

শীতাংশু পরিমাণটা জানতে চাইলে ওরা খুব উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'এক হাজার।'

'কত খরচ হবে?'

'তিশ হাজারের মতো।'

'কত উঠবে?'

'পঁয়ত্রিশ। পনের হাজার খরাত্রাণে দেব।'

'পুরো খরচটাই আমি দিতে পারি। তোমরা খরাত্রাণে পঁয়ত্রিশ দিও!'

ছেলেরা যেন হার্ট ফেল করতে যাচ্ছিল।

শীতাংশু বললেন, 'কিন্তু একটা শর্ত আছে। এমন কিছু ব্যাপার নয় অবশ্য। অনুষ্ঠানের যেসব বিজ্ঞাপন ছাপা হবে তাতে আমার নাম থাকবে, শীতাংশু পালের সৌজন্যে।'

'ফেস্টুন, ব্যানার, সুভ্যেনির সব জায়গায় রাজী ?'
ছেলেরা উল্লসিত হলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ রাজী।'
'আর একটা কথা। খরাত্রাণের চেকটা কার হাতে দেবে ?'
'মুখ্যমন্ত্রী।'
'বেশ সেটা আমি দেব। তোমরা সঙ্গে থাকবে। রাজী ? তোমাদের কাছে দেওয়াটা বড় কথা, কে দিল সেটা এমন কিছু ভাবনার বিষয় নয়। তাই না ?'
ছেলেরা রাজী হয়ে চলে গেল।
প্রথম দিনেই ছবির কথা বললেন না শীতাংশু। ওরা বেঁকে বসতে পারে। বিজ্ঞাপন শীতাংশুর টাকায় বের হতে লাগল। শীতাংশু পালের সৌজন্যের নিচেই তার ছবি, হাসি হাসি মুখ। ছেলেরা ঢোক গিলল। শীতাংশু বললেন, 'এত খাটছ তোমরা! ফাংশন হয়ে গেলে দার্জিলিং বেড়িয়ে এসো, খরচ আমার।'
এখন চারধারে শীতাংশুর ছবি। লোকে দেখলেই ফিরে তাকায়। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে চেক দেওয়ার সময় তোলা ছবি কাগজে ছাপা হয়েছে। এইসময় একদিন বাজার কমিটি তার কাছে এলো।
তিনি বাড়িতে ছিলেন না। লাবণ্যপ্রভা দর্শন দিলেন। বাজারের দোকানিদের প্রতিনিধি হাতজোড় করে বলল, 'প্রতি বছর আমরা অন্ন উৎসব করি। গরিব দুঃখীরা পাত পেড়ে খায় সেদিন। কিছু সাহায্য যদি দেন তাহলে বড় ভালো হয়। জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে আর পারছি না। এত বড় পুণ্যকাজ—দরিদ্রনারায়ণের সেবা হবে!'
লাবণ্যপ্রভা প্রথমে না বলবেন ভাবলেন। এখানে তো ছবি ছাপানোর কোন সুযোগ নেই। পাবলিক টেরই পাবে না। কিন্তু তারপরেই সেই হিন্দী সিনেমাটার কথা মনে পড়ল তার। পৌরাণিক ছবি। প্রতি বছরে একবার রাজ্যের গরিব মানুষদের পাত পেড়ে খাওয়ানো হয়। রাজারাণী সেদিন নিজে হাতে প্রথম দশজনের পাত পরিষ্কার করেন। এটা এমন পুণ্যকর্ম যে রাজার সব পাপ বছরের জন্য ধুয়ে যেত। লাবণ্যপ্রভার খেয়াল হলো শীতাংশু কোনো পুণ্য করেন না। এইটে বেশ সুযোগ।
বাড়ি ফিরে কথাটা শুনে প্রথমে চটে লাল হলেন শীতাংশু। ছবি ছাপার যেখানে কোনো সুযোগ নেই সেখানে টাকা দিতে যাবেন না তিনি। এখন তাঁর নাম হয়েছে, পাঁচজনে চেনে, এখন বুঝেসুঝে টাকা দিতে হবে। তাছাড়া যত হাঘরে এসে তার টাকায় গিলবে আর তিনি সেই পাত পরিষ্কার করবেন। এমন পুণ্যে তার দরকার নেই। ওই বাজারটার মধ্যে ঢুকলেই গা ঘিনঘিন করে।
লাবণ্যপ্রভা খুব বিমর্ষ হলেন। ছবি ছাপার পর থেকে শীতাংশুর চালচলন পাল্টে যাচ্ছে। তিনি অভিমান করলেও বড় একটা গা করেন না। কিন্তু মাঝরাত্রে শীতাংশুকে তিনি ঠেলে তুললেন। ঘুম ভাঙালে বড় বিরক্ত হন শীতাংশু। কিন্তু লাবণ্যপ্রভা তখন উত্তেজিত, দুহাত মাথায় ঠেকিয়ে বারংবার নমস্কার করছেন। শীতাংশু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল ?'
লাবণ্যপ্রভা কোনরকমে সামলে নিয়ে বললেন, 'আগে বল ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়

কি না ?'
শীতাংশু চোখ কুঁচকে বললেন, 'এখনও ভোর হয় নি।'
'নাহোক, হব হব তো !'
'কি হয়েছে তাই বলো ? স্বপ্ন দেখেছ ?'
'হ্যাঁ।'
'পেটে বায়ু জমেছে। মৌরি ভেজানো জল খেও।'
'নাগো। আমি নিজের চোখে দেখলাম।'
'অন্যের চোখে কেউ স্বপ্ন দ্যাখে না।'
'আঃ শোন না কথা। বিরাট মাঠের মধ্যে মানুষজন সার দিয়ে বসে আছেন। প্রত্যেকের সামনে কলাপাতায় নানানরকম খাবার। তুমি আর আমি আসছি। তোমার পরনে রাজবেশ, মাথায় মুকুট। আমিও একটা সোনার শাড়ি পরেছি।'
শীতাংশু বললেন, 'উঃ।'
লাবণ্যপ্রভা বলে যাচ্ছেন, 'তারপর দেখি হাজার ক্যামেরাম্যান আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ক্লিক ক্লিক শব্দ করে ছবি তুলছে। ঘনঘন ফ্ল্যাশবাল্ব জ্বলছে। প্রত্যেকটা ক্যামেরায় তোমার ছবি আমার ছবি !'
তড়াক করেউঠে বসলেন শীতাংশু। তারপরে উত্তেজিত হয়ে লাবণ্যপ্রভাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলেন, 'দারুণ দারুণ, আইডিয়া। ওফ্ আমি কত বড় মূর্খ, এই কথাটা মাথায় আসে নি একবারও। ডান। আমি রাজী। ওদের বলে দিও যা টাকা লাগবে আমি দেব।'
অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন লাবণ্যপ্রভা। স্বামীর এই পরিবর্তনের কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তাছাড়া অনেকদিন পরে এই আলিঙ্গন তাকে বেশ শিহরিত করেছিল। তিনি বিব্রত গলায় বললেন, 'এটা তো স্বপ্ন !'
স্ত্রীর পিঠে আদরের চাপড় মারলেন শীতাংশু, 'তোমার স্বপ্নকে সত্যি না করতে পারলে আমি কিসের স্বামী। আমি টাকা দেব। ভিখিরীরা খাবে। তারপর তুমি আমি গিয়ে খুব নত হয়ে তাদের এঁটো পাত তুলে ফেলে দেব। অবশ্য পাঁচজনের বেশী নয়। তার আগে সবকটা খবরের কাগজের ফটোগ্রাফারদের নিয়ে আসবো। রিপোর্টার থাকবে। বিখ্যাত ধনী এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রের সফল পুরুষ নিজ হাতে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করছেন। পরদিন কাগজে এই হেডিং-এ খবরের সঙ্গে ছবি ছাপা হবে। জনগণের বন্ধু, সেবক, শীতাংশু পাল। ওফ্ তুমি মাইরি মহামায়া।'
লাবণ্যপ্রভা লজ্জা পেলেন, 'ছি ! স্ত্রীকে মহামায়া বলতে নেই।'
পরদিনই বাজার কমিটি টাকা পেয়ে গেল। খুব ধুমধামের সঙ্গে খাওয়াতে হবে। দিন ঠিক হলো। প্রত্যেকটা খবরের কাগজের রিপোর্টার ফটোগ্রাফারদের নিমন্ত্রণ করা হলো।
বেলা বারোটার মধ্যে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে শীতাংশু রেডি হয়ে ছিলেন। উদ্যোক্তাদের বলা আছে রান্না হওয়া মাত্র তাঁকে টেলিফোন করতে। সবাই যখন খাওয়া শুরু করবে তখন তিনি যাবেন। লাবণ্যপ্রভা বেনারসী পরেছেন তিন-

বার। রঙ পছন্দ হয় নি। শেষমেষ সেজেগুজে স্বামীর পাশে এসে বসলেন। প্রতি মুহূর্তে খবর নিচ্ছেন শীতাংশু। রিপোর্টাররা এসে গেছে। দু হাজার লোক খেতে বসেছে। এই ভাত হয়ে গেল। এবার পরিবেশন হবে। উদ্যোক্তারা ফোন করল, 'চলে আসুন স্যার।
সাদা এ্যাম্বাসাডারে উঠে শীতাংশু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ব্যাগে ডেটল নিয়েছ তো ?'
লাবণ্যপ্রভা ঘাড় নাড়লেন, 'হ্যাঁগো। সাবানও আছে।'
গাড়ি থেকে নামা মাত্র উদ্যোক্তারা এগিয়ে এলো। খাওয়া শেষ হতে চলল। একটু শরীরটা রি রি করে উঠল। দু হাজার লোক তাঁরই পয়সায় গিলছে। সব ভিখিরী নয় অবশ্য। রিপোর্টাররা ঘিরে ধরল তাঁকে। তিনি বললেন এইটুকু যদি না করতে পারি তাহলে কেন মানুষ হয়ে জন্মালাম। শাস্ত্রে আছে নারায়ণের সেবা এটা : নিঃস্ব মানুষের পাশে দাঁড়ানো। মার্ক'সও তো তাই চেয়েছিলেন।'
খাওয়া হয়ে গেছে কিন্তু কেউ পাত ছেড়ে নড়ছে না। উদ্যোক্তারা বললেন, 'একটা পাতা তুলুন স্যার, তাতেই হবে।'
শীতাংশু বললেন, 'না ভাই, পাঁচটা হাতে পাঁচ আঙুল।'
ঘনঘন ফ্লাশ বাল্ব জ্বলতে লাগল, হাততালি পড়ছে। শীতাংশু এঁটো পাতা তুলে উদ্যোক্তাদের হাতে দিচ্ছেন, তারা ড্রামে ফেলছে। লাবণ্যপ্রভা ঝুঁকতে পারলেন না বলে স্বামীর হাতের পাতায় আঙুল ছোঁয়ালেন। সেই ছবি উঠল। পাঁচ নম্বর পাতের সামনে এসে থমকে গেলেন শীতাংশু। এ ব্যাটা হদ্দ পাগল ! সারা শরীরে চিটচিটে ময়লা কাপড় জড়িয়ে বসেছে। মুখে জটা পাকানো দাড়ি। তিনি থমকে আছেন দেখে মাথা দুলিয়ে বলল, 'কই পাতা তোল !'
শীতাংশু দেখলেন পাগলটা অন্যদের মতো কলাপাতায় খায় নি। সেরেফ মাটির ওপর ভাত ডাল, মেখে খেয়েছে। এই পাত তিনি কি করে তুলবেন ?
পাগলটা তাড়া দিল, 'দাঁড়িয়ে কেন, তোল তোল ছবি উঠছে।'
শীতাংশুর জেদ চেপে গেল। হ্যাঁ এই পাতা তিনি তুলবেন। মাটি থেকে তিনি নিকিয়ে নেবেন। এঁটোগুলো। ফটোগ্রাফাররাও ভালো বিষয় পেয়ে ক্যামেরা তাক করছে। উদ্যোক্তারা হাঁ হাঁ করে এগিয়ে এলো, 'স্যার, ও পাগল।'
'ঠিক আছে। পাগলও তো মানুষ।' উঁচু হয়ে বসে এঁটোগুলো তুলতে লাগলেন শীতাংশু। ছবি উঠছে। কিন্তু চটচটে কাদা হয়ে গেছে মাটি। যত তুলছেন তত গভীর হয় যাচ্ছে গর্ত।
পাগলটা হা হা করে হাসল, সকড়ির জল বয়ে যাচ্ছে যে। তোলা হচ্ছে না ঠিক। আর একটু মাটি তোল।'
এবার বিব্রত হলেন শীতাংশু। সবাই তাকিয়ে আছে, নেমে পড়ে পিছিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। এঁটো জল মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গিয়েছিল এর মধ্যে। নরম মাটি থেকে শেষ জলটুকু তুলতে গিয়ে নতুন ভেজা মাটি বেরিয়ে এলো।
পাগলটা উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগল, 'কতটুকু এঁটো তুলবে। পায়ের তলায় সারা পৃথিবীটাই এঁটো করে দিচ্ছে ! খোঁড়, খুঁড়ে খুঁড়ে মর।'

কুঁচকে যাওয়া পাটসিল্কের ঝোলা পাঞ্জাবি খাটো ধুতি আর প্রায় সাদা হয়ে আসা মোজাহীন জুতো পরা লোকটা নগদ টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজল। ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল বুড়ো সাবির মিঞা। সাবিরের পেছনে সদ্য কেনা ছাগল আর মুরগীর পালগুলো সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকেই মওকা পেলে মাল কিনছে সাবির। মেলা এখন জমজমাট। তিনমাস অন্তর এই ভবানীর থানের মাঠে জন্তু-জানোয়ারের কেনাবেচার মেলা বসে। মাইক বাজে, তেলেভাজা আর জিলিপির দোকানে গন্ধ ফোটে। চার পাঁচ ঘর ফুর্তির জায়গা তৈরি হয়ে যায় সেই ফাঁকে। দিশি মদের ভালো যোগান থাকে। পয়সা থাকলে এই সময় আকাশ ছোঁওয়া যায়।

বুড়ো সাবির বলল, 'অনেকদিন পর দেখা হলো। মেল্লায় আস না কেন ?'

সিল্কের পাঞ্জাবি লাল দাঁত বের করে হাসল, 'চার চারটে মাদী ছাগল, ওরা না বিয়োলে এখানে এসে কি ফয়দা। মুরগীগুলো ডাগর হতে নিয়ে এলাম। তবে হ্যাঁ, বিইয়েছে একটা ছাগল, পরের মেলায় আসব।' লোকটি গলায় একটা রঙিন রুমাল বাঁধল, 'ও হ্যাঁ, মিঞা সায়েবের সন্ধানে কাজের লোক আছে ?'

'কাজের লোক ?' মিঞা ফোকলা দাঁতে হাসল, 'সারা দেশের লোক কাজ খুঁজছে। তা কিরকম লোক চাই ? যোয়ান না যুবতী ?'

'না না। মেয়েছেলের আমার ডেরায় ঢোকা নিষেধ। বাচ্চা চাই। খাবে কম খাটবে বেশি।'

'হঠাৎ লোক চাই কেন ?'

লোকটা মুখ নামাল, 'কাউকে বল না। শরীরটা বিগড়েছে আমার। হপ্তায় তিন দিন জ্বর আসে। কথা নেই বার্তা নেই কাঁপুনি আর জ্বর। শালা সাড় থাকে না শরীরের। ওই সময় জানোয়ারগুলোর জন্যে একটা বাচ্চা চাই।'

'ডাক্তার দেখাও। এ জ্বর ভালো না।'

'দুস শালা! পয়সা খরচ করে সুঁই ফোঁড়াবো এমন বান্দা আমি নই। লাল ওষুধ দিচ্ছে কম্পাউন্ডারবাবু, তাই গিলি। সন্ধানে আছে তেমন ?'

সাবির মিঞা হাত তুলল। 'সকালে দেখলাম পুবের মাঠে জনমজুর ভিড় করেছে। গিয়ে দ্যাখো একবার। মওকা পেলে ছাগলের চেয়ে কম দাম'।

মাটি থেকে চটের থলেটা তুলে হেলতে দুলতে মেলা ফুঁড়ে লোকটা চলে এলো পুব দিকে : সেখানে গাছের তলায় শীর্ণ মানুষেরা বসে আছে কাজের আশায়। লোকটার চোখ চরকির মতো ঘুরছিল। সব শালা খাঁচা বুকে নিয়ে বসে আছে, গোনা যায় প্রত্যেকটা হাড়। একটা ছোঁড়া চাই ছোঁড়া।

শেষতক একটা গাছের সামনে গিয়ে সে হাঁকল, 'অ্যাই কাজ করবি' ?

প্রৌঢ় লোকটি উবু হয়ে বসেছিল। তার উদোম ঊর্ধাঙ্গে হাড় কাঁপছে।
প্রশ্ন শোনামাত্র লোকটার চোখের চেহারা পাল্টে গেল। দুটো হাত আকাশের দিকে তুলে বলল, 'হ বাবু হ। কাম দ্যান বাবু, একটা কাম'।
'দূর শালা। তোকে নিয়ে আমার কি হবে। আমার কাজ শক্ত কাজ। জঙ্গলের মধ্যে আমার ক্ষেতি। সেখানে আছে ছাগল মুরগী শুয়োর। সে সব দেখতে হবে। এ জন্মে তোর সেই শক্তি হবে না। এটি কে' ?
'আমার ছাওয়াল। একমাত্র ছাওয়াল'।
'এ কাজ করবে ? কি রে কাজ করবি ? দশ টাকা দেব। দুবেলা ভাত পাবি। যাবি' ?
প্রৌঢ়ের গা ঘেঁসে ছেঁড়া হাফ প্যান্ট পরে কুচকুচে কালো একটি বালক দেখছিল লোকটাকে। তার মুখে সাড় এলো না। প্রৌঢ় বলল, 'দুধের ছাওয়াল বাবু, নয় মাইয়া আর এই ছাওয়াল। কথা কইতি পারে না। আমারে নেন বাবু, আমি পারুম। সব কাজ পারুম'।
লোকটি মাথা নাড়ল, 'না। তোমাকে শালা একসের চাল খাওয়াতে হবে আর ও ব্যাটা একপো পারবে না। ও যদি পারে তো আসুক। আমি মিঞার দোকানে আছি। ঠিক দুটোয় জঙ্গলে ফিরব হাঁ।'
পাটসিল্কের পাঞ্জাবি চলে যেতে প্রৌঢ় অতীব মায়ায় পুত্রের মুখ দেখল। সঙ্গে সঙ্গে বালকের মুখ হাঁ হয়ে গেল। জিহ্বা নেড়ে সে বোঝাতে চাইল, ভাত ? প্রৌঢ় মাথা নাড়ল। তারপর প্রবল আক্রোশে চুল খিমচে ধরল। ছেলেটা বাপকে ধরে দুহাতে টানতে লাগল। তারপর বাপের অর্ধকুঁজো শরীরটার সঙ্গে ফিরে গেল আধ মাইল দক্ষিণের নদীর চরে। সেখানে হোগলার ছাউনিতে তাদের বাস।
'কাম পাইলা না' ? দড়ি হয়ে আসা একটি নারী যাকে প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা বলা যায়, নদীর চরে হোগলার ছাউনির সামনে ছেঁড়া চট বিছিয়ে রোদ্দুরে শুয়ে কাতর গলায় প্রশ্ন করল। তার আশেপাশে ন'টি বিভিন্ন বয়সের শিশু। বড়টির বয়স বারো কিন্তু শরীর বাড়ে নি। প্রৌঢ়ার শরীরে জীর্ণ শাড়ি অথচ উদর স্ফীত। মুখের চেহারায় বোঝা যায় শরীরে জ্বর রয়েছে বেশ।
প্রৌঢ় দেখল শিশুকন্যারা তাকে দেখামাত্র দৌড়ে এসে জড়ো হয়েছে সামনে। সে চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়তেই নারীর কণ্ঠে আক্ষেপজনক শব্দ বের হলো, 'তিনদিন কামে যাই নাই। লোক আসছিল খুঁজতে। শাসায় গেল অনেক।'
এই সময় এক বছরের শিশু এগিয়ে এল হামা দিয়ে। মায়ের কাপড়ের তলায় শুকনো স্তনে মুখ গুঁজল খাদ্যের আশায়। রুগ্ন হাতেও ঝটকা এল, 'মর মর, সব চুষে চুষে মেরে ফেলল আমারে। হা কপাল' ! নদীর চরে সেই চীৎকারের সঙ্গে ছিটকে পড়া শিশুর কান্না উত্তাল হলো। বাকিরা ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছে তাদের কনিষ্ঠাকে। তবু তার মধ্যেই একটি কচি গলায় শব্দ ছিটকালো, 'ক্ষুধা লাগছে বাপ, মুড়ি খামু'।
প্রৌঢ় উবু হয়ে বসল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'একটা লোক কাম দিতে চায়

খোকারে। পেট ভাত আর দশ টাকা। ছাগল মুরগী দেখনের কাম। দিবা' ?
চকিতে উঠে বসল নারী। অপলক চোখে বালকের দিকে তাকাল। তারপর ডুকরে উঠল মুখচাপা দিয়ে, 'তোমারে দিয়া হইব না।'
'না'। প্রৌঢ় মাথা নাড়ল, 'আমার প্যাট বড়, শরীরে রোগ। দশ টাকা কম না। চাপ দিলে পনের টাকা হইতে পারে'।
'কুথায় ঘর' ?
'জঙ্গলে'। প্রৌঢ় আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, 'হপ্তায় একদিন ছুটি'।
শেষ মিথ্যেটা কানে গেল না নারীর। শক্ত গলায় শুধালো, 'কবে থিকা' ?
'আজই। দু'টায় যাত্রা'।
'হা কপাল'। নারীর নিঃশ্বাস পড়ল।
ভালো জামা নেই। যেটি ছিল সেটিকে টানটান করে পরিয়ে দিল দিদি বোনেরা। মুখ মুছিয়ে চুল আঁচড়ে দিল নারী। বারংবার বলতে লাগল সে যেন দুষ্টুমি না করে, না কাঁদে, হপ্তায় একদিন এসে দেখে যায়। এই পৃথিবীর নয় বোন আর মা বাপ শুধু তাকিয়ে আছে। বড় বোন বলল, 'মা, ছাগলে দুধ দেয়' ?
নারী ঘাড় নাড়ল, 'দামী দুধ। খাইলে তাগদ বাড়ে'।
আর একজন বলল, 'মুরগীর ডিম' ?
নারী মাথা নাড়ল। প্রৌঢ় যোগান দিল, 'তার সাথে এক পো ভাত। ভাবন যায় না'।
নয়টি শিশু চকচকে চোখে তাদের ভাইকে দেখতে লাগল। বালক দুধ ডিম-এর ভাতের প্রাসাদে যাচ্ছে। একজন ফিসফিসিয়ে বলল, 'হপ্তায় যখন আসবি একটু দুধ আনবি ? দুধ আমি কখনও খাই নাই'। আর একজন বলল, 'ডিম আনবি দাদা ? মুরগীর ডিম' ?
বালক অপলক দেখছিল, শুনছিল। তার ঠোঁট দুটো শুধু থরথরিয়ে উঠল। শেষ সঞ্চয়ের মুড়ি বের হলো তিনমুঠো আর আধ-ভাঙা বাতাসা। নয় বোন বৃত্তাকারে বসে। নারী খাইয়ে দিচ্ছে বালককে। দু'মুঠো খাওয়ার পর বালক মাথা নাড়ল। প্রতিবাদ করল। এই মুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা চোখগুলোর দিকে নজর পড়তেই সোজা উঠে দাঁড়াল। ছোটজন থাবা বাড়াল মুড়িতে। দশটি পাঁজরের নিঃশ্বাস শরীরে নিয়ে বালক পিতার সঙ্গে যাত্রা করল জীবিকার সন্ধানে। যেমন করে বধুকে শ্বশুরগৃহে যাওয়ার সময় বিদায় জানানো হয় তেমনি করে দশটি শরীর পিছু পিছু এগিয়ে এলো অনেকটা, তারপর একটা চাপড়া বেঁধে পড়ে রইল শোক অথচ আশার কাঁপন নিয়ে নদীর চরে।
ধু ধু মাঠ আর বাশঝাড় পেরিয়ে জঙ্গল। জঙ্গলের গায়ে আবাদ। তার পাশে লোকটির ঘর, ক্ষেত আর পোষা জীবদের ডেরা। লোকটি যখন সেখানে পৌঁছাল তখন ঘুঘু ডাকছে, চারধার নিঃসাড়। বালক আর হাঁটতে পারছিল না। লোকটি বলল, 'এই হলো আমার জায়গা। সব দেখে নে। ছাগল দেখবি, মুরগী দেখবি। কারো যদি অযত্ন হয় তো পেটে পা ঢুকিয়ে দেব শালা। পনের টাকা দিতে হবে। কাজ যদি সেরকম না হয় লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব। শরীরটা আবার ঢিসোচ্ছে

রে। জ্বর এলো বুঝি। আজ রাত্রে খাওয়া বন্ধ। আমি ওই ঘরে শুচ্ছি। তুই এই বারান্দায় শুবি। কাল সকালে ভাত করব তখন খাবি। এদিকে আয়'।
লোকটা বালককে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জীবগুলোকে দেখাল। এক ডজন মুরগী আর ছাগল। তারা মুখ তুলে দেখল, পেছনে বাচ্চাগুলো তিড়িং তিড়িং করে নাচছিল। 'সাবধানে এদের দেখবি। ও-পাশের ক্ষেতে যেন না যায়। সামনের মেলায় ছাগলছানাগুলো গায়ে গতরে হলে বেচে দিয়ে আসব। আজ কিছু মুরগী বেচেছি মিঞার কাছে। দর দিল না শালা'। নিজের মনে কথা বলতে বলতে কেঁপে উঠল লোকটা। তারপর দু'হাত বুকের ওপর চেপে বলল, 'উঁহু বড্ড শীত লাগে রে। আমি আলো জ্বালি না। মাটি-তেলের দাম খুব। তুই কাজে লাগ। আর হ্যাঁ, ছানাগুলোকে মা ছাগলটার কাছ থেকে সরিয়ে রাখবি, বাঁটে দুধ জমুক, কাল সকালে তাই দিয়ে পথ্য করব আমি'।
কাঁপতে কাঁপতে লোকটা ঘরের দরজায় তালা খুলে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। সমস্ত চরাচর জুড়ে এখন নিঃশ্বাসের শব্দ। গাছপালার শরীরে বাতাস পাক খাচ্ছে। বালক সেই নির্জনে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলল। শব্দহীন কান্নায় বুকের খাঁচা কাঁপতে লাগল তার। এবং সেই সময় মুরগীগুলো একসঙ্গে ডেকে উঠে ডানা ঝাপটাতে লাগল। সেই বিকট এবং সম্মিলিত চিৎকার বালককে শূন্যবোধ থেকে মুক্ত করে ছুটিয়ে নিয়ে এল চালার সামনে। এবং সেখানে আসতেই তার নজর পড়ল সাপটার ওপর। পায়ের পাতা ডোবা ঘাসের মধ্যে শরীর রেখে মুরগীদের দিকে এগোচ্ছিল, বালকের ছুটে আসার শব্দ তাকে থমকে দিয়েছে। আজন্ম নদীর চরে থাকায় বালক সাপ চেনে। সাপ দেখলেই তারা বালির চরে ছুটতো সেটাকে মারতে। নারী বলত, সাপকে আক্রমণের সুযোগ দেবার আগেই মেরে ফেলা উচিত। পড়ে থাকা একটা বাঁশ তুলে নিয়ে বালক ছুটে গেল সামনে। বিপদ দেখে সাপটি পালাবার চেষ্টা করেও বিফল হলো। তার মৃত শরীরকে বাঁশের ডগায় ঝুলিয়ে বালক নিয়ে এলো লোকটির ঘরের দাওয়ার সামনে। তার প্রথম কাজ সে যেন লোকটাকে দেখাতে চায়।
মুরগীগুলো ডাকছে না। কিন্তু তাদের চোখে অসীম কৃতজ্ঞতার ভাষা পড়তে পারল বালক। সে ছাগলগুলোর দিকে তাকাল। তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু ছানারা স্থির হয়ে রয়েছে। লোকটা এখন উঠবে না। ঘরের ভেতর থেকে কোঁকানির শব্দ ভেসে আসছে। সাপটাকে সেখানেই ফেলে রাখল সে। আর তখনই মনে পড়ল মায়ের কথাগুলো। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে মাকে বলতে শুনতো, 'তুমি একটা সাপ। ছোবল মাইর‍্যা মাইর‍্যা এই শরীরটারে বিষ কইর‍্যা দিয়াও শান্তি নাই'।
সে তাকাল সাপটার দিকে। তার বাবা কি করে সাপ হলো কে জানে। মা বাবার ভাষা মাঝে মাঝে সে বুঝতে পারত না। হঠাৎ খুব অবসন্ন বোধ করল বালক। খিদেয় পেটের ভেতরটা গোলাচ্ছে। সে বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। লোকটা বলেছে কাল ভাত হবে। কিন্তু দু'মুঠো মুড়ি ছাড়া আজ সে কিছুই খায় নি। তার মা বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে ভাত নিয়ে আসতো থালায় বেঁধে। বাপ কাজ

পেলে চরে উনুন জ্বলতো। তারা দশ ভাইবোন সেই ভাত পেটে পুরে রাত্রে ঘুমুতো। তিনদিন মা কাজে যায় নি, বাবা কাজ পায় নি। তাই ভাতও নেই পেটে।

বালক চারপাশে তাকাল। বাগানময় গাছ, কিন্তু গাছে কোনো ফল নেই। তার মনে পড়ল লোকটা বলেছে ছানাগুলোকে মায়ের কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে। এগিয়ে গেল সে। দরজা খুলে দিতেই তিড়িং তিড়িং ছন্দে তিনটে ছানা বেরিয়ে এলো। মা-ছাগলটা বের হবার আগেই দরজা বন্ধ করে দিল সে। খানিকক্ষণ সব বিস্মৃত হয়ে বালক ছাগল ছানাগুলোর সঙ্গে মুক্ত আকাশের নিচে খেলা করতে লাগল।

ওপাশে মুরগী এবং ছাগলগুলো ডাকছে। সারাদিন অভুক্ত থাকায় তারা চিৎকার শুরু করল। এই সময় ঘরের ভেতর থেকে জ্বরো গলায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'ও-পাশের দাওয়ায় ছাগল আর মুরগীর খাবার চাপা দেওয়া আছে, দিয়ে দে। ওরে বাবারে, কি শীত'।

বালক হুকুমটা পালন করামাত্র জন্তুগুলোর খুশির নিঃশ্বাস শোনা গেল। সে ব্যাকুল চোখে দেখল কি তৎপর হয়ে ওরা খাদ্য গলাধঃকরণ করছে। বালকের চোয়াল নড়তে লাগল। হাত বাড়িয়ে সেই খাদ্যপদার্থ তুলে নিয়ে জিভে দিতেই শরীরটা গুলিয়ে উঠল। না, এটা খাওয়া যাবে না। সে ছানাগুলোকে ওই খাদ্য এনে দিল। তৎপর ছানারা তাতে মুখ দিয়েও ফিরিয়ে নিল। ওই খাদ্য তাদেরও পছন্দ নয়।

সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। আর জঙ্গলের মাথায় উবু হয়ে বসেছে তরমুজের মতো চাঁদ। তারই আলোয় চারটে ছানা নিয়ে বসেছিল বিষণ্ণ বালক। ছানাগুলো সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। বালকের চোখের সামনে নদীর চর, হোগলার ঘর এবং নয় বোনের মুখ ভেসে উঠতেই সে কেঁদে ফেলল। আর তখনই একটি ছানা চট করে জিভ বের করে তার গরম অশ্রু চেটে নিল। একটা কষ্টের কান্না কিভাবে যে হাসিতে রূপান্তরিত হয় তা বালক বুঝল না, কিন্তু পলকেই দুঃখ ভুলে সে ছাগলটাকে জড়িয়ে ধরল। ও-পাশে মা-ছাগলটা এখন ছানাদের ডাকে সাড়া দিতে শুরু করেছে। ছানা চারটের পা একটা দড়িতে বেঁধে রাখা সত্ত্বেও তারা ছুটে যেতে চাইছে মায়ের কাছে। একটুও ছেলেমানুষি নেই ওদের আচরণে। লোকটা বলেছে ছানাগুলোকে আলাদা রাখতেই হবে। নইলে মা-ছাগলটার বাঁটে দুধ জমবে না, 'সেই দুধে লোকটা পথ্য করবে আগামীকাল' অনেক চেষ্টার পর ছানাগুলো নেতিয়ে নেতিয়ে পড়ল। যেমন করে সে আর তার বোনেরা বালির চরে নেতিয়ে থাকত মা ফিরবে খাবার নিয়ে এই আশায়। এবার নিশ্চয়ই ছানাগুলো ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে পড়লে খিদে থাকে না, এটা সে জানত। কিন্তু তখনই মুরগীগুলো চিৎকার শুরু করল। চমকে উঠল বালক। তারপর বাঁশটা তুলে ছুটে যেতে কিছু একটা পালিয়ে গেল পাশের জঙ্গলে। মুরগী-গুলো সরে গিয়েছিল একপাশে। এবং তখনই বালক অবাক হয়ে দেখল জিনিস-টাকে। খাঁচার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সে ডিমটাকে বের করে নিয়ে এলো বাইরে।

এটা ডিম? খেলে তাগদ বাড়ে। ঘ্রাণ নিল সে। কোনো ঘ্রাণ নেই। শক্ত খোলটা হাতের চাপেও স্থির। বিকেলে এটা ছিল না এখানে। লোকটা নিশ্চয়ই জানে না। ডিম কি কাঁচা খায়? এই সময় মা-ছাগলটা অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল। বালকের মনে পড়ল, শূন্য নদীর চরে নারী যখন চিৎকার করে তাদের ডাকত তখন তার গলাটা অনেকটা এইরকম শোনাতো। সে উঠে গেল মা-ছাগলটার কাছে। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় মা-ছাগলটা কাতর চোখে তাকে দেখল। সম্মোহিতের মতো বালক এগিয়ে গেল। ছাগলটি সন্দিগ্ধ হয়ে সরে দাঁড়াতে গিয়েও দাঁড়াল না। এবং এই প্রথম বালক সচেতন চোখে দুধ দেখতে পেল। বালক নতজানু হয়ে বাঁট স্পর্শ করতেই পুরুষ্ট শরীর থেকে দুধ ছিটকে এল তার হাতে। বিস্মিত বালক এই প্রথম মাতৃদুধের স্পর্শ পেয়ে এমন হতবাক হয়ে গেল যে মা-ছাগলটির খোলা দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়া আটকাতে পারল না। হাতটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে অমৃতের স্বাদ পেল সে। তারপর চেতনা ফিরতেই সে ছুটে বাইরে এসে দেখল দুটি ছানা মায়ের দুই বাঁটে মুখ ডুবিয়ে তৃপ্তিতে স্থির, বাকি দু'জন নাচছে তাদের ঘিরে। তারা চেষ্টা করেও বাঁটের দখল পাচ্ছে না।

বালক ভীত হলো। ছানাগুলো যদি সব দুধ খেয়ে নেয় তাহলে কাল লোকটার পথ্য হবে কিসে? জবাবদিহির ভয়ে সে যখন বাঁশটা নেবে ভাবছে ঠিক তখন ঘরের মধ্যে থেকে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'পাহারা দিবি সারা রাত। শেয়াল আসে মুরগী খেতে। কিছু হলে দেব ভাত ঢুকিয়ে'।

সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল বালক। তার হাতের মুঠোর ধরা ডিম শক্ত হলো। এই মুহূর্তে যদি লোকটা বেরিয়ে আসে তাহলে—। সে ডিমটাকে পাথরের মতো আঁকড়ে ধরল। কিন্তু লোকটি বের হলো না। বালকের হঠাৎ মনে হলো তার বাপ যদি সাপ হয় তাহলে ওই লোকটা শেয়াল। নারী বলত শেয়াল খুব চালাক। নইলে নিজের জ্বর হয়েছে বলে তাকে ভাত দেবে না কেন? সে মাটি খুঁড়ে ডিমটাকে পুঁতে রাখল নিচে। চরে বিচি পুঁতলে সে দেখেছে তরমুজের গাছ বের হয়। নিজেকে একটা গোপন সম্পত্তির মালিক বলে মনে হলো তার।

বালক এগিয়ে গেল। তারপর অপেক্ষারত দুটো ছানার সঙ্গে বসে রইল মা ছাগলটার দিকে তাকিয়ে। নদীর চরে উনুন জ্বললে যেমন তারা বসে থাকত। আর মা-ছাগলটা, হঠাৎই মমতা এবং ভারমুক্তিতে সস্নেহে বালকের গাল চেটে দিল। এতক্ষণে পরিবেশটা ভীষণ পরিচিত হয়ে গেল।

শূন্য চরাচরে সহজ বালক অপেক্ষা করে যায়। পৃথিবীর সব দৃশ্য মুছে গেছে তার সামনে থেকে, শুধু টৈটুম্বুর খাদ্যভাণ্ডার বিশ্ব জুড়ে, যা দখলের জন্যে কুশলী হতে হবে তাকে। সে আর তৃতীয় এবং চতুর্থ ছানা হতে চায় না।

ললাট লিখন

গ্রামের নাম ত্রিশূল। মোটামুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কিন্তু জমিদার মানুষটা বড্ড খরুচে। দুহাতে টাকা খরচ করেন। তাঁর নানান রকমের শখের মধ্যে একটি হলো জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া। ভারতবর্ষের বড় বড় জ্যোতিষীর কাছে যান আর নিজের ভাগ্য জেনে আসেন। অবশ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে ওঁদের ভবিষ্যদ্বাণীর মিল হয় না কিন্তু মূল ব্যাপারটি অভিন্ন থেকে গেছে। যে কথাটা সবাই বলেছেন তা হলো যতই খরচ করুক তাঁর পকেট খালি হবে না। এতেই জমিদারবাবুর শান্তি, পকেটে মাল থাকলে যে কোনো সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু একটা ব্যাপারে জমিদারবাবুর একটু অস্বস্তি আছে। ত্রিশূল গ্রামের ঠিক মুখটাতে যে বিরাট বটগাছ কয়েক দশক ধরে ছায়া বিলোচ্ছে তার তলায় এক সাধুবাবা বাস করেন। প্রায় কুড়িবছর হয়ে গেল সাধুবাবা সেখানেই অবস্থান করছেন। প্রথম প্রথম লোকে ওঁকে একটু সন্দেহের চোখে দেখতো কিন্তু মানুষটার ওপর একটু একটু করে সবার শ্রদ্ধা জমেছে। কুড়িটা বছর বড় দীর্ঘ সময়। এই সময় কেউ ওঁকে প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া আসন ছেড়ে উঠতে দ্যাখে নি। গ্রামের লোক খেতে দিলে খান না দিলে অনশনে কাটান। শরীর ক্রমশ শীর্ণ হলেও মুখে এক ধরনের জ্যোতি জন্ম নিচ্ছে। কথা বলেন খুব কম। সাধুবাবা কিছু চান না, কাউকে স্তোকও দেন না, নিজের মনেই থাকেন। এই মানুষটি সম্পর্কে জমিদারবাবুর প্রথমদিকে কোনো কৌতূহল ছিল না, এখন হচ্ছে। দু'তিনদিন সাধুবাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি, চামচেদের দিয়ে সাধুবাবার মত জানতে চেয়েছেন কিন্তু কোনো উত্তর পান নি।

জমিদারবাবুর স্ত্রী সন্তান সম্ভবা ছিলেন। আজ ভোরে উঠে জমিদারবাবুর মনে হলো স্ত্রীর গর্ভে পুত্র কিংবা কন্যা আছে কিন্তু ঠিক কি আছে তা তিনি জানেন না। কোনো জ্যোতিষী এই ব্যাপারে মুখ খোলেন নি। সাধুবাবাকে প্রশ্নটা করলে কেমন হয়। তারই জমিদারীর মধ্যে একজন সাধু বাস করছে অথচ তিনি আগামীকালের কথা আগাম জানতে পারছেন না এ কি করে সহ্য করা যায়! খোঁজখবর নিয়ে জানলেন ঠিক দুপুরবেলায় সাধু একা থাকেন। কাটফাটা রোদ্দুরে কেউ আর গ্রামের বাইরে যায় না। দুপুর অবধি কোনো-রকমে ধৈর্য ধরে থাকলেন জমিদারবাবু। তারপর কাউকে সঙ্গে না নিয়ে নিঃশব্দে ছাতি মাথায় বেরিয়ে পড়লেন।

দূর থেকে সাধুবাবাকে দেখতে পেলেন তিনি। নির্জন বটগাছ আর তার নিচে সাধুবাবা ধ্যানমগ্ন। একটা নেড়িকুকুর ছায়ায় বসে এক দৃষ্টিতে সাধুবাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। জমিদারবাবু সাধুর সামনে এসে প্রণাম জানা-লেন। সাধুর চোখ বন্ধ, তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা জমিদারবাবু বুঝতে

পারলেন না। অথচ ধ্যান ভাঙাতেও ঠিক সাহস হচ্ছে না। বেশ কিছুসময় প্রতীক্ষায় কেটে গেল। সাধু চোখ খুলছেন না। ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়লেন জমিদারবাবু। শেষে তার মাথায় একটা মতলব এলো। পড়ে থাকা গাছের ডাল কুড়িয়ে সজোরে নেড়িকুকুরটিকে প্রহার করলেন তিনি। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে কুকুরটি সাধুবাবার আসনের দিকে ছুটে গিয়ে শেষমুহূর্তে দিক পরিবর্তন করে উধাও হলো। কিন্তু ততক্ষণে জমিদারবাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সারমেয়ের চিৎকারে সাধুবাবার ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে। তিনি চোখ মেলে দেখলেন জমিদারবাবু করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পলায়মান নেড়িকুকুরটির দিকে তাকিয়ে চিৎকারের কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না, বিরক্ত সাধুবাবা প্রশ্ন করলেন ; কৃষ্ণের জীবটিকে কি তুমি প্রহার করেছ ?'

জমিদারবাবু বললেন, 'হ্যাঁ বাবা।'

'কেন ?'

'না হলে আপনার ধ্যান ভঙ্গ হতো না। শুনেছি বরফ পাহাড়ের সামনে খুব জোরে আওয়াজ করলে তবেই বরফ ফাটে।'

সাধুবাবার মুখে হাসি দেখা দিল। লোকটি বুদ্ধিমান বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গেল এই মানুষটি এর আগে তার কাছে কয়েকবার এসেছেন একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে। ইনি নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চান। ঈশ্বরকে ডাকেন তিনি, ঈশ্বরের নাম করেন, কিন্তু কোন্ বিদ্যায় ভবিষ্যতের খবর জানা যায় তা তার জানা নেই। জানতেও চান না। ঈশ্বর তাঁকে করুণা করলেই তিনি ধন্য। অথচ এই সাধারণ মানুষগুলো মনে করে যেহেতু তিনি সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করছেন তাই মানুষের অতীত ভবিষ্যত জেনে বসে আছেন। তাঁর যে সেরকম কোনো ক্ষমতা নেই, ক্ষমতার লোভে তিনি এগোন নি একথা বললেও, কেউ বিশ্বাস করবে না। এই কারণেই তিনি খুব কম কথা বলেন, লোকালয়ের কাছে না থাকলে না খেয়ে মরতে হবে তাই এখানে থাকা।

সাধুবাবার হাসি দেখে জমিদারবাবু বললেন, 'বাবা আমার বংশে সন্তান আসছে, আপনি বলুন সে পুত্র হবে তো ?'

সাধুবাবা মাথা নাড়লেন, 'বিধাতা যা চায় তাই হবে।'

জমিদারবাবু বললেন, 'সেকথা ঠিক, কিন্তু মন তো জানতে চায়। আপনি তো সবই জানেন দয়া করে বলুন।'

সাধুবাবা বললেন, 'আমি সে ক্ষমতার অধিকারী নই। ঈশ্বরের করুণা পাওয়ার জন্য বসে আছি, তিনি প্রসন্ন হলেই আমার মুক্তি।'

'আপনি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।' জমিদারবাবু অসহিষ্ণু হলেন।

'আমি মিথ্যে কথা বলব কেন তাই বুঝতে পারছি না।'

জমিদারবাবু একথা বিশ্বাস করতে রাজী হলেন না। তিনি উষ্ণ গলায় বললেন, 'আগামীকাল আবার আমি এইসময়ে আসব। আশা করি তখন আপনি ফিরিয়ে দেবেন না।'

ক্ষুন্ন জমিদারবাবুকে চলে যেতে দেখলেন সাধুবাবা। কি আশ্চর্য ব্যাপার,

কোনো মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না যে তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান না। সেই ক্ষমতা কি করলে আয়ত্ত হয় তাও তিনি জানেন না। দিনরাত ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া আর কোনো কিছুই যে তিনি জানেন না। শুনেছেন বড় সন্ন্যাসীরা এসব পারেন কিন্তু বড় সন্ন্যাসী হতে গেলে কি করা দরকার সে বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা নেই।

সাধারণ মানুষের দোষ দেন না সাধুবাবা, তারা তো জানতে চাইবেনই। ক্রমশ তাঁর মনে অভিমান এলো। এত বছর কেটে গেল ঈশ্বরের প্রত্যাশায় তবু তাঁর করুণা পেলেন না। শীর্ণ, জটাধারী তপ্ত মধ্যাহ্নে আকাশের দিকে তাকালেন। সেখানে একখণ্ড মেঘও নেই। মনে মনে প্রার্থনা করলেন, হে করুণাময়, তুমি দয়া করো। আমি কিছুই চাই না তোমার কাছে শুধু তোমার লীলার স্বাদ নিতে চাই।

সেই সন্ধ্যায় সাধুবাবা কিছু খেলেন না। গ্রামের ভক্তরা অবশ্য নিত্যদিনে উপাচার পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। এই সঙ্গে এসেছিল আর একটি বিশেষ থালা। ওটি জমিদারবাবু পাঠিয়েছেন। রাজভোগ, রাজসন্দেশ এবং রাজফলে সেটি পরিপূর্ণ। সাধুবাবা কোনোদিকেই তাকালেন না। চিত্ত স্থির করে ক্রমশ ডুবে যেতে লাগলেন এক অসীমে। যেখানে গেলে কোনো জাগতিক কোলাহল কর্ণে প্রবেশ করে না।

মধ্যরাত পেরিয়ে গিয়ে আকাশ একটু একটু করে চেহারা বদলাচ্ছিল। ফিকে জাফরান রঙের সমারোহ সেখানে। নবমীর চাঁদ ননীর রঙ মেখে ঝুলে রয়েছে মধ্যগগনে। শুকতারা ক্রমশ উজ্জল হচ্ছে এখন। শেষ প্রহরে সাধুবাবার চেতনা ফিরে এল। বড় নির্জন হয়ে আছে পৃথিবী। বিশ্বচরাচর এখন ঘুমের অতলে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। সাধুবাবা চোখ মেললেন। হঠাৎ তার শ্রবণেন্দ্রিয় সতর্ক হলো। দ্রুত পায়ের আওয়াজ কানে আসছে। এই শেষরাতে কে আসছে? ঠিক তখনি নজরে এল। ত্রিশূলে গ্রামের ভেতর থেকে এক ব্যক্তি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে বলা চলে। আকৃতি দেখে চিনতে পারলেন না সাধুবাবা। অথচ এই গ্রামের প্রতিটি মানুষকে তিনি ভালো করে চেনেন। কোনো কুমতলব শেষ করে লোকটা ফিরে যাচ্ছে না তো! গ্রামের মানুষ তাঁর ভক্ত, তাঁকে সেবা করে। ওদের কোনো ক্ষতি করে আসছে না তো লোকটা?

চোখের সামনে দিয়ে যখন সে হন হন করে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন সাধুবাবা তাকে ডাকলেন, 'ওহে, এদিকে একবার শোন!'

লোকটি একটু শ্লথ হয়ে আবার চলতে শুরু করলে সাধুবাবা গলা তুললেন, 'তুমি কে হে? ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না?'

এবার লোকটি থামল। তারপর সেখানেই দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছেন তাড়াতাড়ি বলুন, আমার সময় নেই।'

সাধুবাবা হাসলেন, 'অত ব্যস্ত কেন? দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে যাও না।'

লোকটি বিরক্ত মুখে এগিয়ে এলো, 'কি বলছেন?'

'তোমাকে তো কখনো দেখিনি বাপু কোথায় থাক?'

'এতদিন চোখ ছিল না তাই দ্যাখেন নি এখন চোখ হয়েছে তাই দেখছেন। কি কারণে ডাকছেন তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।'
সাধুবাবা লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বসো।'
'না না বসার সময় নেই। এক্ষুনি ভোর হবে, তার আগেই আমাকে পাশের গাঁয়ে যেতে হবে। আগে কাজ পরে কথা।'
সাধুবাবার শরীর রোমাঞ্চিত হলো, 'আমি কি ঠিক দেখছি ?'
লোকটি হাসল, 'হ্যাঁ ঠিকই দেখছ। এতদিন অন্ধ ছিলে আর পাঁচজনের মতো চোখ থাকতেও আমায় দেখতে পাওনি। এত বছরের সাধনার পর আজ তোমার দৃষ্টি ফুটেছে তাই দেখতে পেলে। আমি বিধাতা পুরুষ।'
সাধুবাবা সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর বললেন, 'আমি ধন্য, আমি ধন্য।'
বিধাতাপুরুষ বললেন, 'ঠিক আছে। এখন কেন ডেকেছ তাই বল !'
সাধুবাবার মাথায় কোনো জিজ্ঞাসা সহসা এলো না। তস্কর ভেবে তিনি বিধাতা-পুরুষকে ডেকেছিলেন। এখন কি জবাব দেবেন ভাবতে গিয়ে জমিদারবাবুর মুখ মনে পড়ল। বেচারা জানতে চায় তার ছেলে হবে না মেয়ে হবে ! সাধু-বাবার আর কোনো খেয়াল রইল না এই প্রশ্নটাই বিধাতাপুরুষকে করলেন।
বিধাতাপুরুষ হাসলেন, 'আমি তো তার বাড়ি থেকেই আসছি হে। আজ তৃতীয় প্রহরে তার স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করেছে। সেই পুত্রের ললাটে ভাগ্যলিপি লিখে ছুটে আসছি। যেতে হবে পাশের গাঁয়ে। সেখানে এক চাষীর কন্যা জন্ম নিচ্ছে। তারও ললাটে লিখতে হবে ভবিষ্যৎ। এখন এত কাজের চাপ একা সামলানো মুস্কিল হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর তুমি পিছু ডেকে দেরি করিয়ে দিলে। মানুষ ভাবে বিধাতা হয়ে আমি খুব সুখে আছি !'
সাধুবাবা নতজানু হয়ে বললেন, 'ভগবান এত যদি করুণা হলো তবে দয়া করে আর একটু বলে যান। ওই দুই নবজাতকের ললাটে কি লেখা হলো বা হবে !'
বিধাতাপুরুষ বললেন, 'তুমি ভক্ত লোক তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। তাছাড়া আমি একবার ললাটে যা লিখে দেব পৃথিবী রসাতলে গেলেও তা মিথ্যে হবে না। হ্যাঁ, জমিদারের ছেলের কপালে লিখলাম, কয়েকবছর সে বেশ আদরে মানুষ হবে। কিন্তু জমিদারের বেহিসাবী খরচের জন্যে জমিদারী নিলামে উঠবে। বাপ মা মরে গিয়ে ছেলেটি একদম অনাথ নিঃস্ব হয়ে জীবন কাটাবে। তবে অতি দীন অবস্থায় তাকে বাঁচাবার জন্যে একটি কালো গরুর ব্যবস্থা রেখেছি। সেই গরুর দুধ বিক্রি করে সে বেঁচে থাকবে।'
বিধাতাপুরুষ যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালে সাধুবাবা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর ওই চাষীর মেয়ের কপালে কি লিখলেন ?'
মুখ ঘুরিয়ে বিধাতাপুরুষ বললেন, 'সে মেয়ের বিয়ে হবে ষোল বছর বয়সে। ঠিক সতের বছরে বিধবা হবে। তার এক ভাসুর তাকে নষ্ট করবে। বাধ্য হবে সে পথে বেরিয়ে আসতে। তোমাদের পাশের গঞ্জে সে ঘর ভাড়া নেবে। খুব কষ্টে তার দিন কাটবে কিন্তু একদম যাতে না খেয়ে মারা যায় তাই রোজ রাত্রে

অন্তত একজন খদ্দের সে পাবেই এই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর কথা বাড়িও না বাপু, ভোর হয়ে এল বলে, আমি চলি।' বিধাতাপুরুষ প্রায় দৌড়ে গেলেন পাশের গ্রামে।

সাধুবাবা সেই ছুটে যাওয়া নয়নভরে দেখলেন। তারপরেই তার খেয়াল হলো স্বয়ং ঈশ্বর এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অথচ নিজের জন্যে কিছু চাওয়ার কথা তাঁর মনেই আসে নি। তা থাক, তিনি তো এখন এই পৃথিবীর দুটি মানুষের ভবিষ্যতের কথা জানেন। এই ক্ষমতা তো ঈশ্বর তাঁকে দিয়ে গেলেন। তারপরই তাঁর মনে হলো, আহা ওই ছেলে মেয়ে দুটো কত না কষ্ট পাবে। কোনো উপায়ে কি তাদের কষ্ট দূর করা যায় না? তিনি ভেবে রাখলেন, জমিদারবাবু যদি আবার আসেন তাহলে ওকে বলবেন মিতব্যয়ী হতে। সন্তানের জন্যে যথেষ্ট সম্পত্তি রেখে যেতে। পাশের গাঁয়ের চাষীকে গিয়ে বলে আসবেন সে যেন খবরদার তার মেয়েকে ষোল বছর বয়সে বিয়ে না দেয়। তারপরেই মনে হলো মানুষের কর্মফল তো ভোগ করতে হবে। তিনি কেন বাধা দিতে যাবেন। তাছাড়া ঘটনাগুলো আদৌ ঘটে কিনা তাও জানা দরকার।

এই ঘটনার পরে আরো কুড়িটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সেই একই আসনে সাধনা করে সাধুবাবা আরও শীর্ণ হয়েছেন। এখন তাঁর শরীর কয়েকটি হাড়ের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। কুড়ি বছর পর এক মধ্যাহ্নে সাধুবাবার স্মরণে পড়ল ঘটনাটার কথা। এই কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি বিধাতাপুরুষকে আর দেখতে পান নি। কিন্তু এখন প্রতিমুহূর্তে মর্মে মর্মে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করেন। জাগতিক সুখ দুঃখ তাঁকে আর বিব্রত করে না। ঘটনাটা মনে পড়ায় তাঁর কৌতূহল হলো। ঈশ্বরের লীলা কি প্রকৃতির তা দেখা যাক। তিনি আসন ছেড়ে উঠলেন।

সাধুবাবাকে গ্রামের পথে দেখতে পেয়ে ভিড় জমে গেল। চল্লিশ বছর ধরে ওঁকে কেউ গ্রামে ঢুকতে দেখেনি। সাধুবাবা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন জমিদারের বাড়িটা কোন্ পাড়ায়। ভীড়ের ভেতর থেকে একজন জানাল, 'জমিদারের বাড়িটা এখন আর নেই। ধারপত্তর করে তাঁদের অবস্থা এত খারাপ হয়েছিল যে সব নিলাম হয়ে গিয়েছে। বাড়িটা যারা কিনেছিল তারা ভেঙে ফেলে গুদাম করেছে। জমিদারবাবু নেই, শুধু তাঁর ছেলে খুব কষ্টেসৃষ্টে একটা ভাঙা বাড়িতে কোনোরকমে থাকে।

সাধুবাবার ইচ্ছায় ওরাই তাঁকে একটা জীর্ণ বাড়ির সামনে পৌঁছে দিয়ে গেল। সেখানে একটি তরুণ করজোড়ে দাঁড়িয়ে সাধুবাবাকে অভ্যর্থনা করল, 'বাবা, এ আমার কি ভাগ্য যে আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন!'

সাধুবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি জমিদারের পুত্র?'

'হ্যাঁ বাবা, তাই ছিলাম কিন্তু এখন অতি দীনদরিদ্র, আপনার সেবা করার যোগ্যতাটুকুও নেই। আপনি আমার দুঃখ দূর করুন।'

সাধুবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার চলে কি করে!'

ছেলেটি বলল, 'আমার তো সবই গিয়েছে শুধু একটা কালো গরু কোনোরকমে

টিকেছিল। তার দুধ বিক্রি করে বেঁচে আছি।'
সাধুবাবা শিহরিত হলেন। তাহলে বিধাতাপুরুষের বাক্য মিথ্যে হয় নি। তিনি কিছুক্ষণ নয়ন বন্ধ করে চিন্তা করতেই এক ধরনের হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠল। আচ্ছা একটু মজা করলে কিরকম হয়। দেখা যাক, এতে ছেলেটির কোনো উপকার হয় কিনা। তিনি জমিদার পুত্রকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তুমি যদি আমার উপদেশ মতো চল তাহলে তোমার দুঃখ দূর হতে পারে।'
ছেলেটি তাঁর পায়ে হাত রাখল, 'আপনি আদেশ করুন আমি পালন করব।'
সাধুবাবা বললেন, 'বেশ। তুমি তোমার কালো গরুটিকে গোয়াল থেকে খুলে বাজারে নিয়ে যাও। সেখানে সেটা ভালো দামে বিক্রি করে এস।'
ছেলেটি আঁতকে উঠল, একি কথা বলছেন বাবা, ওই আমার সবেধন নীলমণি, ওকে বিক্রি করলে খাব কি!'
সাধুবাবা বললেন, 'আমার কথা শোন তোমার অমঙ্গল হবে না।'
ছেলেটি তবু দোনমনা করছে দেখে সাধুবাবা কপট ক্রোধ প্রকাশ করলো, 'যা বলছি তাই যদি না কর তোমার—।' বাক্য সমাপ্ত না করে তিনি ফিরে চললেন নিজের আসনে।
সারা রাত মন চঞ্চল হয়ে রইল। ছেলেটি তার নির্দেশ মান্য করল কিনা বুঝতে পারছেন না তিনি। ভোর হতে না হতেই দেখলেন ছেলেটি ছুটে আসছে তাঁর কাছে। সাধুবাবার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। ছেলেটি এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বলল, 'এ আপনার কি লীলা বাবা। গতকাল আপনার আদেশ মতো আমার কালো গরুটাকে বিক্রি করে ফিরে এলাম। খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আজ সকালে চারটের সময় অভ্যেসমত ঘুম ভেঙে যেতেই হাম্বা ডাক শুনতে পেলাম। গোয়ালঘরে ছুটে গিয়ে দেখি সেখানে একটা কালো গরু দড়ি দিয়ে কে বেঁধে রেখে গেছে।'
সাধুবাবা বললেন, 'এইসবই ঈশ্বরের লীলা, তাঁকে করতেই হবে। কাল কত দাম পেলে?'
'চারশ টাকা।'
'বেশ, আজই ওই গরুটাকে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দাও। দেখবে কাল সকালে গোয়ালে আর একটি গরু বাঁধা থাকবে। তোমার দৈনিক আয় জমিদারীর আয়ের চেয়ে কম হবে না হে। যাও।'
ছেলেটিকে বিদায় করে মনে মনে তৃপ্ত হলেন সাধুবাবা। তারপর লাঠি হাতে আবার বেরিয়ে পড়লেন পাশের গঞ্জের দিকে। এর মধ্যেই লোকমুখে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে সাধুবাবার অলৌকিক ক্রিয়ার কথা। সবাই এসে নিজের কষ্ট জানিয়ে সাধুবাবার আশীর্বাদ চায়। কোনোক্রমে তাঁদের এগিয়ে সেই গঞ্জের 'খারাপ পাড়ায় উপস্থিত হলেন তিনি। এখানে কয়েকঘর স্বৈরিণী বাস করে। কিন্তু তাদের মধ্যে বিধাতা পুরুষের বলে যাওয়া মেয়েটি কোনটি হবে? জনে জনে জিজ্ঞাসা করা শোভন নয় কিন্তু সাধুবাবাকে বেগ পেতে হলো না। স্বৈরিণীরা সবাই ছুটে এলো তাঁর কাছে। এসে পায়ে পড়ে বলল, 'বাবা, আমা-

দের উদ্ধার কর।'

সাধুবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কার ষোলতে বিয়ে হয়ে সতেরতে বিধবা হতে হয়েছিল?'

সুন্দরী এক যুবতী বলল, 'আমি সেই হতভাগিনী।'

সাধুবাবা দেখলেন মেয়েটি সুন্দরী কিন্তু তার সাজপোশাক অত্যন্ত জীর্ণ। বোঝাই যায় খুব কষ্টে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কিরকম আয় হয়?'

মেয়েটি বলল, 'সে পাপের কথা মুখে আনতে লজ্জা করছে বাবা। তবু যখন জিজ্ঞাসা করলেন তখন বলছি সারা রাত কুপি জেলে বসে থেকে কোনোরকমে একটা খদ্দের জোটে।'

সাধুবাবা শুধোলেন, 'কোনো রাত খদ্দের ছাড়া গেছে?'

মেয়েটি জানালো, 'না বাবা, সে রকম হয় নি। একটা টাকা দিক কি দুটো দিক একজন না একজন এসেছে। এই বাজারে কি আর ওই রোজগারে চলে!'

সাধুবাবা প্রফুল্ল হলেন ঠিক আছে। আমি যা বলছি তাই করবে। আজই গঞ্জে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দাও, আজ রাত্রে যে বেশ্যার ঘরে আসবে তাকে এক হাজার টাকা দিতে হবে।' মেয়েটির চোখ কপালে উঠে গেল। খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না সে। তারপর তড়বড়িয়ে বলে উঠল, 'একি কথা বলছ বাবা। লোক আমায় পাঁচটা টাকা দিতেই পাঁচকথা শোনায় তুমি আমায় হাজার টাকা চাইতে বলছ? অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা কজনের আছে? আর দেবেই বা কেন?'

সাধুবাবা কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, আমি যা বলছি তাই কর তো তোমার—।' বাক্য শেষ না করে সাধুবাবা গঞ্জের বাইরে এক গাছতলার আসনে ফিরে গেলেন। পরদিন সকাল হতেই মেয়েটি ছুটে এলো সেখানে, 'বাবা, তোমার কী লীলা সত্যিই পাশের গাঁয়ের জমিদারবাবু এসেছিল গো আমার ঘরে। গুনে গুনে এক হাজার টাকা দিয়ে গেছে আমাকে। তাই দিয়ে সব ধার শোধ করে এলাম। ঢ্যাঁড়া শুনে জমিদারবাবু নাকি অবাক হয়ে দেখতে এসেছিলেন।'

সাধুবাবার মুখে হাসি ফুটল, 'বেশ, আজ ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দাও তোমার ঘরে ঢুকতে হলে দু'হাজার টাকা দিতে হবে।'

মেয়েটি ঢোঁক গিলল। কিন্তু এক হাজার টাকার আনন্দে ছুটে গেল ঢ্যাঁড়া পেটাতে। পরদিন মেয়েটি এলো একটু বেলায়। সাধুবাবা দেখলেন ওর অঙ্গে ভাল শাড়ি উঠেছে। হাঁটা-চলার ঢংটাই পাল্টে গেছে। এসে মুচকি হেসে বলল, 'এসেছিল গো। ঢ্যাঁড়া যখন দেওয়া হচ্ছিল তখন এক রাজাসাহেব গাড়িতে চড়ে শিকারে যাচ্ছিলেন। তিনি শুনে বললেন, 'কি ব্যাপার, এই রাজত্বে দু' হাজারী মাল আছে? দেখতে হয়। এই বলে আমায় দু'হাজার দিয়ে গেলেন।' একটা পান গালে ফেলে মেয়েটি হাসল, 'তা, হ্যাঁ বাবা, আজ কি তিন হাজার বলব?'

সাধুবাবা মাথা নাড়লেন, 'না।'

'তাহলে?' মেয়েটি যেন দমে গেল।

'আজ ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দাও, যে মানুষ আজ রাত্রে তোমার ঘরে আসতে চাইবে তার অন্তত তিনটে হাত থাকতে হবে। তিন হাজার নয়, তিন হাত না হলে তুমি কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবে না যাও।'

মেয়েটির চোখ কপালে উঠল, 'একি খেলা বাবা, মানুষের কি তিন হাত হয়, হতে পারে ?'

সাধুবাবা বললেন, 'তোমার যখন পাঁচ টাকা রোজগার হতো না সেখানে কাল দু'হাজর হলো কি করে ? যাও আর কথা বাড়িও না, যা বলছি তাই করো খবরদার আদেশ অমান্য করো না।'

মেয়েটি কালো মুখে চলে গেলে সাধুবাবা হাসলেন। এইবার দেখা যাক কি হয়। সেদিন সন্ধ্যে হতে না হতেই সাধুবাবা নিঃশব্দে পতিতা পাড়ায় প্রবেশ করলেন। মেয়েটি যে বাড়িতে থাকে তার ঠিক সামনেই একটা বড় কাঁঠাল গাছ দেখতে পেয়ে তার নিচে আসন নিলেন তিনি। অন্ধকারে কেউ তাঁকে দেখতে পাচ্ছেনা কিন্তু তিনি সব দেখছেন। কারণ দরজায় দরজায় লণ্ঠন আলো হাতে নিয়ে স্বৈরিণীরা দাঁড়িয়ে। খদ্দের আসছে এবং দরজা বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু সাধুর নজর বিশেষ ঘরের দিকে। সেখানে অত্যন্ত গরবিনীর ভঙ্গিতে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। অনেক সাধাসাধি করলেও সে কাউকে ঘরে তুলছে না।

ক্রমশ রাত বাড়ল। পাড়াটা ঝিমিয়ে এল। মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সব আলো নিভে গেল সে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। সাধুবাবার অস্বস্তি শুরু হল। রাতের তৃতীয় প্রহর এখন। এতবড় গঞ্জ ঘুমে কাদা হয়ে আছে। মাথার ওপর অম্বুরী তামাকের গন্ধের মতো ঝলমলে জ্যোৎস্না এসে পড়ল। এখন চরাচর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাধুবাবা দেখছেন রাত খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় পায়ের শব্দ হলো।

সাধুবাবা সচকিত হলেন। একটি মানুষ হন হন করে ছুটে আসছে। কোনদিকে না তাকিয়ে সে মেয়েটির বন্ধদরজার সামনে উপস্থিত হয়ে কড়া নাড়ল। দুবার শব্দ হতেই ভেতর থেকে মেয়েটির গলা পাওয়া গেল, কে রে ?

লোকটি জবাব দিল, 'আমি।'

'আমি টা কে ?' ভেতর থেকে ঘুমজড়ানো গলা ভেসে এলো।

'তোমার কাছে রাত্তিরে কারা আসে ?'

'অ। তা তোমার তিনটি হাত আছে ? সাধুবাবা বিধান দিয়েছেন।'

'বেরিয়ে দ্যাখো আছে কি নেই।'

দরজা খুলল। লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল আগন্তুকের মুখে। সাধুবাবা গলা বাড়িয়ে লোকটির মুখ দেখতে চেষ্টা করলেন।

মেয়েটি বলে উঠল, 'ওমা, তাই তো। এরকম আবার হয় নাকি। সাধুবাবা ঠিক বলেছেন দেখছি। তিন হাতে আদর খাব আজ।'

লোকটি মুখ বিকৃত করল, 'এইজন্যে, আগে ভাগে জানাতে নেই। উত্তরটা জেনে ব্যাটা খুব চাল চালল, চল।'

সাধুবাবা দেখলো বিধাতাপুরুষকে নিজের মর্যাদা রাখতে তিন হাতে ঘরে

ঢুকতে হচ্ছে। ঈশ্বরের ললাটে এইটে কেউ লিখে দিয়েছিল কিনা কে জানে। ভাবতেই হাসি পেল। ঈশ্বরের ললাটে লেখার ক্ষমতা আবার কার আছে? মানুষ ছাড়া!



কদিন থেকে একটা কথা ঘাই মারছে মাথায়। এই শ্রাবণে সে পঁচিশে পড়ল কিন্তু এখনও কাউকে মরতে দ্যাখে নি। একটা মানুষ সারা জীবন সুখ দুঃখ ভোগ করে যখন মরতে বসে তখন নিশ্চয়ই খুব আইঢাই করে। বাঁচার জন্যে ছটফট করতে করতে থেমে যায়। বায়োস্কোপে এইরকম দৃশ্য দেখলেও বাস্তবে চোখে পড়ে নি। অবশ্য সারাজীবন কথাটাও গোলমেলে। একটা মানুষের জীবনের মাপ কি ? ষাট সত্তর আশি ?

অবশ্য এসব হিসেব নিকেশে গিয়ে কাজ কি, মোদ্দা কথা হলো সে নিজের চোখে কাউকে মরতে দ্যাখে নি। হরিহরের দাদু যেদিন মারা যায় সেদিন সে ছিল মাঝ নদীতে। পারে নেমে খবর পেয়ে গিয়ে দেখল বুড়ো ঘুমোচ্ছে। মুখে কোনো চিহ্ন নেই যন্ত্রণার কিংবা আনন্দের। ঠিক মৃত্যুর সময়টায় বুড়ো কি ভেবেছিল বোঝার কোনো অবকাশ নেই। চুপচাপ শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। অথচ বুড়ো ছিল খুব কুচুটে। সবসময় মানুষের খুঁত ধরত। কার বউ অসতী, কোন্ মেয়ে কোন্ ছেলের সঙ্গে রস করে কথা বলছে এই সব কেচ্ছা থাকত তাঁর জিভের ডগায় জমজমাট। আর ছিল হাড় কিপ্পন। তা এই সময় ওঁকে দেখলে কে বলবে ও কথা। এখন মরে গিয়ে প্রচণ্ড সরল হয়ে গেছে বুড়ো। হরিহরের দাদুর বয়স যদি আশি নবদা তো বাইশে টেঁসেছিল। নবদার বাপের অবস্থা ভালো। এক ছেলে। শহরে পড়ত। সে দেখেছে নবদার শরীরে কেমন একটা তেলচকচকে ব্যাপার থাকত। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে বেশি কথা বলত না ছুটিতে এলে। নদীর ধারে বই নিয়ে বসে থাকত।

গ্রামে আসার দুটো পথ। একটা নদী পেরিয়ে আর দ্বিতীয়টা বাস রাস্তায় নেমে দুক্রোশ পায়ে হেঁটে। বৃষ্টির সময় দ্বিতীয়টায় হাঁটুভর কাদা, হাঁটবে কার সাধ্য। নবদার মরার সময় বর্ষা ছিল না। ওর বন্ধু এলো সেই পথে। শহরের ছেলে। নবদারই বয়সী। গ্রামে ঢুকে তাকেই জিজ্ঞাসা করেছিল বাড়িটা কোন্ দিকে। দুপুরের খাওয়া সেরে নবদা তাকে নিয়ে গিয়েছিল নদীর ধারে। বিকেলে খবর এল নবদা মরে পড়ে আছে। ছুটে গিয়েছিল সে। চিৎ হয়ে শোওয়া নবদার চোখ খোলা। বুক থেকে রক্তের স্রোত বইছে তখনও। কিন্তু কোনো যন্ত্রণার চিহ্ন নেই, মুখেরও। শুধু রক্তটুকু বাদ দিয়ে চোখ বুজিয়ে দিলে মনে হবে নবদা ঘুমুচ্ছে। তার বন্ধুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। মরবার সময় নবদার কিরকম হয়েছিল। সারাজীবন নবদা—আচ্ছা, নবদার সারাজীবন তাহলে বাইশ বছর।

এই সব চিন্তা যত মাথায় ঘাই মারে তত বাপের ওপর রাগ হয় বিলাসের। তিনি গত হয়েছেন আগেভাগে, নইলে বিলাস বলতে পারত সে অন্তত এক-

জনকে দেখেছে, কেমন করে যমদূত এসে দেহ থেকে আত্মাটাকে খুলে নিয়ে যায় সেই দৃশ্য জানা হয়ে গেছে। কিন্তু বাপ মরেছে তার এক মাস বয়েসে।

বিলাস শুনেছে তার বাপ ছিল রইসি-আদমি। ফিনফিনে ধুতির নিচে পাম্পশু পরত। গায়ের জামাটাও ছিল শৌখিন। আতর মাখত। এসব দেখে গ্রামের মানুষদের চোখ টাটাতো। দুই ক্রোশের মধ্যে বাস চলে না, সিনেমা হল নেই কিন্তু শীতের সময় বায়োস্কোপের গাড়ি আসে যেখানে, সাইকেল মেরে যেতে হয় আট ক্রোশ দূরের শহরে, হরিসভার গান ছাড়া আনন্দ করবার আর কোনো রাস্তা নেই সেখানে। ওই সব পোশাক পরে বর্ষাকালে নৌকোয় চাপলে তো ফিস-ফিসানি কথা উঠবেই। হরিহরের দাদু রটিয়েছিল শহরে নাকি মেয়েমানুষ পুষেছে বিলাসচন্দ্রের বাপ। সেই মাগীই শুষে নিচ্ছে রস। নইলে জমির আয়তন ছোট হচ্ছে কেন? যা রটছে তার কিছু ঘটছে ভেবে বাড়িতে অশান্তি শুরু হয়েছিল। মায়ের মুখে তখন কথা ফুটত না, বুড়ি ঠাকুমা মাথা ঠুকতো। বিলাস শুনেছে, তার জন্মাবার চার মাস আগে শহরে যাওয়া ছেড়েছিল লোকটা। কিন্তু জন্মাবার এক মাস পরে আচমকা শহরে গিয়েছিল কাউকে না বলে। ফেরার পথে কেন যে লোকটা নৌকো থেকে ঝাঁপিয়েছিল তা মাঝি জানে না। ভরপেট মাল ছিল কিন্তু মাথায় তো হুঁশ ছিল। লোকটা নাকি চিৎকার করে বলেছিল, 'দুই দিকে জাল ফেলেছে উড়ব কি করে?'

কথাটার মানে কারও বোধগম্য হয় নি। কিন্তু বিলাসের মাঝে মাঝে লোকটাকে দেখতে ভারী ইচ্ছে করে। বেশ বেঁচেবর্তে ছিল। গ্রামের আর পাঁচটা মানুষের থেকে আলাদা। যদ্দিন ছিল চুটিয়ে বেঁচেছে। বাপের একটা ছবি আছে মায়ের স্যুটকেসে। বেশ তকতকে চেহারা। মা বলে, লোকটার মন ছিল খুব নরম। নেশা করলেই একটা হিন্দী গান গাইত। শহর থেকে ফিরলেই সেটা বারংবার শোনা যেত। মেরা বুলবুল শো রহা হ্যায়। ওই একটাই লাইন। কিন্তু লোকটা মরল কেন? মরবার সময় মনমুখের অবস্থা কি হয়েছিল? বিলাসের দেখার বয়স হয় নি তখন। কিন্তু মায়ের কাছে লোকটার দুটো জিনিস গচ্ছিত আছে। সে দুটোকে দেখেছে বিলাস। একটা চ্যাপ্টা মদের বোতল। একদম আনকোরা। পঁচিশ বছরে একটুও বিবর্ণ হয় নি। আর ছোট সরু আতরের শিশি। শক্ত ছিপি মুখে এঁটে বসে আছে। ওই মদ আতর মায়ের কাছে রেখে লোকটা কেটে গেল। প্রথম প্রথম প্রাণে ধরে দেখতে দিতেও রাজী ছিল না মা, এখন কিছু বলে না। বিলাসের মনে হয়। ওই বন্ধ বোতল এবং শিশিতে বাপের ইচ্ছে-গুলো রয়েছে। এইগুলো নিয়েই কি মরার সময় উড়তে চেয়েছিল বাপ?

অনেক উড়িয়ে যে জমিগুলো মরার সময় রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিল বাপ তাই দিয়েই সংসার চলে যাচ্ছে। দুই মরশুমের চাষ তিনজনের পেট ভরায়, জামা-কাপড় দেয়। বুড়ি ঠাকুমা আর বিধবা মায়ের কোনো শখ-আহ্লাদ নেই। বিলাস সিগারেট খাচ্ছে ইদানিং। ওইটুকুই বিলাসিতা। গ্রামের স্কুলে ক্লাস এইট অবধি গড়িয়েই সে থেমে গিয়েছিল। এখন খাও ঘুমোও আর নদীর ধারে ছিপ নিয়ে বসে সিগারেট টানো—এই আরামেই তার শান্তি। অবশ্য চাষের মরশুমে

বেরুতেই হয়। সেটা অভ্যাস।
নদীর ধারে বসলেই তার মাথায় চিন্তাগুলো ফণা তোলে। মানুষ মরার সময় কি করে? দু একজনকে প্রশ্নটা শুধিয়ে দেখেছে তাদের মুখ চোখ কিরকম যেন হয়ে যায়? ফ্যালফ্যাল করে তাকে দ্যাখে। মদনদা তো বলেই দিল, 'দ্যাখ বিলেস বেঁচে থাকতে এত চিন্তা যে মরবার সময় পাই না। তাই লিয়ে ভাবব এই অবকাশ কোথায়? তোর বাপ তো তবু জীবন রেখে গেছে আমি তো তাও পারলাম না।'
'জীবন?' হকচকিয়ে গেল বিলাস।
'কেন? তুই! তোর ঠাকুরদা তোর বাপকে দিয়েছিল, তোর বাপ তোকে। তুই দিবি তোর ছেলেকে। এমনি করেই তো জীবনটা থেকে যায়। আমি শালা তাও পারলাম না। ঠাকুর দেবতা ঝাড়ফুঁড়ে সব চারশো বিশি কারবার।' মদনদা ফোঁত করে নিঃশ্বাস ছেড়েছিল।
সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তাটা পাক খেল। মানুষ তাহলে বেঁচে থাকে মরে গিয়েও। তার মধ্যে বাপ বেঁচে আছে? আই বাপ! সমস্ত শরীরে শিহরণ এল। কিন্তু বাপের কোনো ইচ্ছে তো তার মধ্যে নেই। বাপ মাল খেত, সে মাল খায় না। বাপ আতর মাখত, সে মাখে না। বাপ শহরে যেত সে যায় না। তাহলে বাপ বেঁচে থাকল কি করে তার মধ্যে? খুব জটিল ব্যাপার।
আজ সঙ্গে ছিপ নেই, জলের ধারে বসে ঢেউ দেখছিল বিলাস। এই ঢেউ-এর তলায় শুয়ে বাপের প্রাণ বেরিয়েছে। জলের মধ্যে প্রাণ বেরুলে সেটা তো জলেই মিশে থাকবে, আকাশে ওঠার সুযোগ পাবে না। তন্ময় হয়ে ব্যাপারটা যখন সে ভাবছে তখন বলরাম ছিপ ফেলতে ফেলতে বলল, 'মদনের বৌটা বোধহয় বিধবা হলো! মানুষের জীবন কি অনিত্য। মাছ দেখেছ এখানে? খাবে মনে হয়?'
তড়াক করে উঠে দাঁড়াল বিলাস। মদনদা মরে যাচ্ছে? গতকালও লোকটা দোকানে বসেছিল! এখনও যদি প্রাণটা শরীর ছেড়ে না গিয়ে থাকে—ছুটল বিলাস।
কিছু জমি আর চালু দোকানটার দৌলতে মদনদার অবস্থা খারাপ নয়। টিনের চালে নতুন রঙ পড়েছে, বাগানের চারপাশে বাখারির বেড়া। বাড়ির সামনে পেঁছে একটু থমকে দাঁড়াল বিলাস। না, কোনো কান্নাকাটির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে এখনও মারা যায় নি মদনদা। সমস্ত শরীরে চাঞ্চল্য এলো। ঠিক সেই সময় অবনী ডাক্তারের দেখা পেল বিলাস। চারটে টাকা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। বিলাস তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'মদনদা কেমন আছে অবনীকাকা?'
'রুখে দিলাম। যম এসে গিয়েছিল। তবে সর্বনাশের সময় পণ্ডিতরা অর্ধেক ত্যাগ করে। মদনও করে বাঁচল। চার টাকায় এর বেশি হয় না।'
দরজা খোলাই ছিল। বিলাস সটান চলে এল ভেতরে। প্রতিবেশীরা এসেছে, মহিলারা গুনগুন করছে। মদনদা শুয়ে আছে খাটে। চোখ বন্ধ। মৃত না জীবিত বোঝা মুশ্কিল। মুখের একটা দিক বেঁকা। চেনা মদনদা এখন ঠিক

চেনা নয়। সুখলতা বউদি মাথার পাশে বসে হাওয়া করছে গম্ভীর মুখে। মৃত মানুষকে কেউ হাওয়া করে না। মিনিট দশেক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল বিলাস। মদনদার নড়চড়ার কোন লক্ষণ নেই। আলোচনা কানে এল গুনগুনানি থেকে। সন্ন্যাস রোগ হতে হতে হয় নি। তবে শরীরের একটা দিক গেছে। একদম অবশ।

অতএব মদনদা এখনই মরল না। বিলাস ফিরে এলো। মদনদা যদি কথা না বলতে পারে, চিরকাল অমনি শুয়ে থাকে তাহলে সেটা কি বেঁচে থাকা হলো? যম যখন পাশে এসেছিল তখন নিশ্চয়ই মদনদা মৃত্যুকে দেখেছে। তাহলে এখন মদনদা জীবনেও নেই মরণেও নেই।

বাড়ি এসে বিলাস আতরের শিশিটা বের করল। ছিপিটা এমন এঁটে আছে যে খোলা অসম্ভব। চেষ্টা করতে গিয়ে একদিন ছিপির একটা কোণ ভেঙে গিয়েছিল। বিলাস সেটাকে আবার নাকের নিচে আনল। কোনো গন্ধ নেই। মদের বোতলটায় নাক নিয়ে গিয়ে দেখেছে কোনো গন্ধ নেই। বিলাস জানে প্রাণ থাকতে মা এদের খুলতে দেবে না। যদ্দিন এই অবস্থায় থাকবে তদ্দিন বাবাকে যেন আটক রাখতে পারবে মা।

ঠিক সেই সময় সাইকেলের ঘণ্টি বাজল। বিলাস উঁকি মেরে দেখল গণেশকাকা সাইকেলে বসে। লোকটা বাপের বন্ধু ছিল। শহরে চাকরি করে। ছুটিছাটায় গ্রামে আসে। এখানেও জোতজমি আছে। বিলাসকে দেখে গণেশকাকা বলল, 'এই যে বিলাস, তোর কাছেই এসেছিলাম। একটু আয়, কথা আছে।'

বাড়ি ছেড়ে বিশ হাত গেলেই যে আমগাছ তার তলায় দাঁড়াল গণেশকাকা সাইকেল নিয়ে। বিলাস সেখানে পৌঁছলে বলল, 'তুই এখন বড় হয়েছিস, সংসারের কর্তা বলতে তুই, বিপদ আপদ যা আসবে তোকেই তো সব সামলাতে হবে। কি বল?' প্রশ্নটা করেই চশমার নিচ দিয়ে তাকাল গণেশকাকা।

কিছু না বুঝেই মাথা নাড়ল বিলাস। গণেশকাকা তার সঙ্গে কখনও এইভাবে কথা বলে না। আজ কি হলো?

গণেশকাকা বললেন, 'তুমি এখন সাবালক হয়েছ। তোমার কিছু কথা জানা দরকার। না না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমার বাবা আমার অত্যন্ত বন্ধু ছিল। সেই সুবাদেই তোমাকে বলছি।'

বিলাস দেখল বিকাশকাকা বলতে গিয়েও পারছে না। তুই থেকে টপ করে তিনি তুমিতে উঠে এসেছেন নিজের অজান্তে। সে চুপ করেই থাকল।

গণেশকাকা বলল, 'তোমাকে একবার শহরে আসতে হবে। এই দু'একদিনের জন্যে। আমার বাড়িতেই উঠবে। তবে কি জন্যে যাচ্ছ তা কাউকে বলার দরকার নেই। শনিবার গিয়ে রবিবার ফিরে এস। কেমন?'

'শহরে যেতে হবে কেন?'

'কারণ আছে। আমি একজনের কাছে কথা দিয়ে ফেলেছি। তুমি আমার বন্ধুপুত্র বলে কথা, তোমার ওপর নিশ্চয়ই দাবি আছে আমার। বাস ধরে শহরে নামবে। নেমে জিজ্ঞেস করবে, জিজ্ঞাসা করার কি দরকার, সোজা বাণী টকিসে

চলে আসবে। ওখানে আমার নাম বললেই যে কেউ তোমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দেবে। এই শনিবারেই চলে এস, কেমন ?

'এই শনিবার ?' বিলাস কিরকম অসহায় হয়ে পড়েছিল।

'ঠিক আছে, তার পরের শনিবার। মানে বেশি দেরি করো না।'

গণেশকাকা সাইকেলে চেপে চলে গেল। আর দুশ্চিন্তা মাথায় জুড়ে বসল বিলাসের। ব্যাপারটা কি ? গণেশকাকাকে মা পছন্দ করে না কেন করে না তা কোনদিন বলে নি। শহরে যাওয়ার ব্যাপারে মায়ের আপত্তি আছে। পঁচিশ বছরে সে তিনবার শহরে গিয়েছে। অত রিক্সার আওয়াজ, গাড়ির শব্দ আর লোক-গুলোর চ্যাটাংচ্যাটাং কথা মোটেই ভালো লাগেনি তার। সকালে গিয়ে সন্ধ্যে-নাগাদ ফিরে এসেছে। দুবার ঠাকুর দেখতে আর একবার কোনো কারণ ছিল না। কথা মাকে না জানিয়ে শহরে যাওয়া অসম্ভব। আবার জানালেই মা আপত্তি করবে। একে গণেশকাকা তার ওপর শহর। ভারি দুশ্চিন্তায় পড়ল বিলাস। একটা রহস্য রেখে গেছে গণেশকাকা। সেটা শহরে না গেলে ভাঙবে না। সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরলে চলবে না। রাত কাটাতে হবে। এইটেই মুশ্কিল।

বাড়ি ফিরতেই মা জিজ্ঞাসা করল, 'কে এসেছিল রে, ঘণ্টি বাজল তখন ?'

সত্যি কথাটাই বলল বিলাস, 'গণেশকাকা।'

'অ। মতলবটা কি ?'

বিলাস একটু উত্তপ্ত হলো, 'মতলব মানে ? কেউ কারো বাড়িতে এলেই মাথায় মতলব নিয়ে আসে বুঝি ? মাঝে মাঝে তুমি এমন কুকথা বল—!'

গণেশের মতো লোক এলে আসে। তোর বাপ মারা যাওয়ার পর আমার কাছে বোতল চাইতে এসেছিল। আমি মরছি স্বামীর শোকে সে চাইছে বোতল।'

'বোতল ?'

'ওই যে, তোর বাপ যেটা রেখে গিয়েছে। গণেশ নাকি মৃত্যুর আগের দিন তোর বাপকে দিয়েছিল। সে খেতে পারে নি তাই ফেরত নিতে চেয়েছিল। তা আমি তো এই দেওয়া-নেওয়ার কথা জানি না। তার খেতে ইচ্ছে হয়েছিল বলে রেখে দিয়েছি, চাইলেই আমি দেব কেন ? কিন্তু বিধবা মেয়েছেলের কাছে মদের বোতল চায় কি করে ? নচ্ছার লোক। কি বলল তোকে ?'

'খবরাখবর জিজ্ঞাসা করছিল। আমাকে শহরে গেলে ওঁর বাড়িতে যেতে বলল।'

সত্যি কথাটা সরাসরি বলতে সাহস করল না বিলাস।

'তাতো বলবেই। তোকে শহরে না টানলে ষোলকলা পূর্ণ হবে কি করে ? তিন তিনটে ধিঙ্গি মেয়ে মাথার ওপরে। তাদের পার করতে হবে তো! তোর বাপ মদ খেত আতর মাখত কিন্তু বন্ধুর মতো এমন কুচুটে বুদ্ধি ছিল না।'

মা চলে গেলে বিলাসের মনে পড়ল মেয়ে তিনটের কথা। তারা শহরেই থাকে। গত বছর গণেশকাকা বোধহয় জোর করেই গ্রামে এনেছিল। এখানে তাদের মন টেকে না। গ্রামের অন্য মেয়েদের থেকে ওরা আলাদা। এটা বোঝাবার জন্যে কথা-বার্তা হাঁটাচলায় কি চেষ্টা তাদের। সেই মেয়েদের গণেশকাকা তার ঘাড়ে কি করে চাপাবে ? তারাই তো চাপবে না। মায়ের সব ব্যাপারেই সন্দেহ। তবে

গণেশকাকা মদের বোতলটা চাইতে এসেছিল কি করে ? লোকটা সম্পর্কে তার মনে একটু তিক্ততা এল।

দিন সাতেক পরে ডাক এলো বিলাসের। মদনদার কর্মচারী এসে বলে গেল সে যেন এখনই দেখা করে। এখন মদনদার দোকান বন্ধ। অবনীকাকার ওষুধ খেয়ে মদনদা কথা বলতে শুরু করেছে। তবে শরীর বশে আসে নি। মুখ তেমনি বেঁকেই রয়েছে। বিছানা থেকে শরীর এক চুল না নাড়লে নড়ছে না। এসব কথা কানে এসেছে বিলাসের। যাবে যাবে ভেবেছিল কিন্তু শুনেছিল সুখলতা বউদি এই যাওয়াটা নাকি পছন্দ করে নি। সামনে দাঁড়িয়ে কেউ আহা, ইস বলেছিল। সুখলতা বউদি তাকে শুনিয়ে দিয়েছে, 'বাড়িতে যেন চড়ক বসেছে। দরদের ঠেলায় প্রাণ বাঁচলে হয়।'
তারপর থেকেই লোক যাওয়া বন্ধ হয়েছে ও বাড়িতে। জিভে বড্ড ধার মদনদার বউ-এর। শহরের মেয়ে বলে গর্ব আছে। বাচ্চা-কাচ্চা হয় নি বলে নাকি মেজাজ টঙ হয়ে থাকে। চেহারায় কেমন যেন উদ্ধত ভাব, মা মাসী বউদি বলে মনে হয় না।

বাড়িটা নিঝুম। কিন্তু ভেতরে পা বাড়াতেই সুখলতা বউদির গলা কানে এল, 'কে ? কে ওখানে ? যুধিষ্ঠির নাকি ?'
'না। আমি বিলাস। যুধিষ্ঠির খবর দিয়েছিল।'
'অ। সত্যবাদী। সময় হলো তাহলে। দাদা দাদা করে শুনেছি হেদিয়ে মরতে তা সেই দাদা বাঁচল কি মরল তা দেখতে আসার সময় পাওয়াই যায় না। হুঁ। এই যে তোমার সরল সত্যবাদী লক্ষ্মণ ভাই এসেছে। ঘরে ঢোক।'
সুখলতা বউদি যখন চিৎকার করে কথা বলে তখন একটা ক্যানকেনে শব্দ বের হয়। বিলাস ঘরে ঢুকল। মদনদা শুয়ে আছে। শরীরটা খুব টসকেছে। চোখ ঘুরিয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করছে। সে সামনে দাঁড়াতেই মুখে গোঁ গোঁ শব্দ বের হলো যার অর্থ বোঝো। তারমানে মদনদার কথা স্পষ্ট হয় নি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'মদনদা, এখন কেমন আছ ?'
'দ্রুত ঘাড় নেড়ে না বলার চেষ্টা করল মদনদা কিন্তু মাথা বেশি নাড়ল না। পেছন থেকে সুখলতা বউদি বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ! আমার কপাল পোড়া নইলে এইরকম হয়। অবনী ডাক্তার বলে দিয়েছে আর কিছু করার নেই।'
'করার নেই ?'
হাতুড়ে ডাক্তারের কি করার থাকবে ? শহরে নিয়ে যেতে হবে চিকিৎসার জন্যে। আমি অবলা মেয়েমানুষ একা পারব কি করে ? যুধিষ্ঠির তো রাতে চোখে দেখে না। তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে কোনো কাজ হবে না। তুমি দিন দশেকের জন্যে আমাদের সঙ্গে শহরে যেতে পারবে ?'
বিলাস এইরকম প্রস্তাবের জন্যে তৈরি ছিল না। সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। মাথা নামিয়ে বলল, 'দেখি, মাকে বলি।'

'মাকে বলি ? মানুষের উপকারে হ্যাঁ বলবে কিনা তা মাকে জিজ্ঞাসা করবে ? তুমি জোয়ান ছেলে তো। বিয়ে করলে একগণ্ডা বাচ্চা হয়ে যেত।'

'চ-ল।' অনেক কষ্টে শব্দটা উচ্চারণ করল মদনদা। বিলাস দেখল মদনদা তার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে আছে।

সুখলতা বউদি বলল, 'আমার বাপের বাড়িতে কোনো জোয়ান পুরুষ নেই। বাপ এমন বুড়ো যে তার পক্ষে হাসপাতাল করা সম্ভব নয়। না হলে তোমাকে বলতাম ? বিপদে পড়ে ইনি বিলেস বিলেস করছেন। এখন তোমার বিবেক যা বলে তাই কর।'

'কবে যাবেন ?'

'কবে আবার। আজ বলতে আজই। যত তাড়াতাড়ি ওকে হাসপাতালে রাখা যাবে তত মঙ্গল।'

অতএব বিলাস আর না বলতে পারল না। বাড়িতে এসে মাকে ব্যাপারটা বলতেই বাড়িতে থম ধরল। মা বলল, 'কেন ভু-ভারতে মদনের কোনো বন্ধু ছিল না ? শহরে যাওয়া আমি দুচক্ষে পছন্দ করি না আর তুই হ্যাঁ বলে এলি।'

'মদনদা এমন করে তাকাল। ওদের লোকজনও নেই।'

দশদিন নয় পাঁচদিনের কড়ারে মায়ের অনুমতি পাওয়া গেল। তার থাকা খাওয়ার চিন্তা নেই, সেটা মদনদার শ্বশুরবাড়িতেই হবে। পাঁচদিনে ব্যবস্থাটা চালু করে দিয়ে বিলাস ফিরে আসবে। তবে হ্যাঁ, গণেশকাকার সঙ্গে কোনো-মতেই দেখা করা চলবে না। বিলাস মাকে কথা দিল।

অতবড় শরীরটাকে নৌকোয় তুলতে হিমসিম খেয়ে গেল চারটে মানুষ। ছই-এর মধ্যে শুইয়ে দিয়ে বিলাস ঘেমে উঠল। শহরের ঘাটে নামবে কি করে ? একটা মৃত মানুষকে যত সহজে কাঁধে তোলা যায় জীবন্ত মানুষ যদি মরার মতো পড়ে থাকে তাহলে সেটা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নৌকো চলছিল। এখন আবহাওয়া চমৎকার। মেঘ নেই, রোদের তাপও কম। জলে চিকচিকে আলো। ছই-এর ভেতরে মদনদা চোখ বন্ধ করে বসে আছে। তার মাথার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে সুখলতা বউদি পান সাজছে। পুরো সংসারই যেন চলেছে নৌকোয়। বিলাস ঠিক করল পাঁচটা কুলিতে হবে না। সেই রকম বলেছিল বউদি। মদনদার দিকে আর একবার তাকাতেই চমকে উঠল সে। মদন-দার বুক হাপরের মতো ওঠা নামা করছে। ঠোঁট ঈষৎ ফাঁকা। সতর্ক হলো সে। মদনদা কি মরে যাচ্ছে ? সে কি এখনই মৃত্যুদৃশ্য দেখবে ? মিনিটখানেক গেল কিন্তু মদনদার কিছুই হলো না। বিলাসের চমক ভাঙল সুখলতা বউদির কথায়, 'ড্যাবড্যাবিয়ে কি দেখা হচ্ছে ? অবশ্য আমি দোষ দিই না। জোয়ান বয়স বিয়ে থা হয় নি, গাঁয়ে একটা দেখার মতো মেয়েও নেই ছাই।' বলে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল।'

'না। মানে—।'

'থাক থাক আর বানাতে হবে না। যেতে তো ইচ্ছে ছিল না এক ফোঁটা। আরে বাবা সারাক্ষণ তো আর হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে না। দুবেলা খাবার

নিয়ে যাওয়া, ওষুধপত্র কিনে দেওয়া। আমার বাবা হাসপাতালে যেতেই ভয় করে। টপাটপ মানুষ মরে সেখানে।'

বিলাস মুখ ফিরিয়ে জলের দিকে তাকাল। হাসপাতালে টপাটপ মানুষ মরে। যদি সে হাসপাতালে গিয়ে সারাক্ষণ বসে থাকে তাহলে নির্ঘাৎ মানুষের মরণ দেখতে পাবে। মনে মনে খুশী হলো বিলাস। জব্বর একটা সুযোগ পাওয়া গেল। এই সময় জলে বুদ্‌বুদ উঠল। আর সেটা দেখে সজাগ হলো সে। এ নির্ঘাৎ কোনো বড় মাছের কাজ। নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নিশ্চয়ই। শালা, সঙ্গে একটা ছিপ থাকলে হতো।

সুখলতা বউদির বুড়ো বাপ মদনদাকে হাসপাতালে ভরতি করে দিল। চার-ধারে কড়া ওষুধের গন্ধ, সারি সারি মানুষ শুয়ে, বিলাসের শরীর গুলিয়ে উঠেছিল। প্রত্যেকের চেহারাই যেন মরার মুখে, শুধু প্রাণটাই যা খাঁচা ছাড়ে নি। ঘুরে ঘুরে তাকে সব চিনিয়ে দিল বউদির বাপ। লাঠি হাতে লোকটা ভালো করে পা ফেলতে পারে না। বিলাসের মনে হচ্ছিল ওরই এখানে শুয়ে থাকা দরকার। ডাক্তার বলল, উঠে বসবে, দাঁড়াবেও, তবে কদ্দিন লাগবে তা বলা সম্ভব নয়। তবে আবার যদি অ্যাটাক না হয় তাহলে কোনো ভয় নেই।

মালপত্র নিয়ে বউদি চলে গিয়েছিল বাড়িতে। সেটা হাসপাতাল থেকে বেশি দূর নয়। রাস্তায় নেমে স্বস্তি হলো বিলাসের। ওই লাল বাড়িটায় এতক্ষণ যেন কেউ তার কলজে থাবায় চেপে ছিল। বুড়ো বাপের সঙ্গে সাবধানে পথ হাঁটছিল সে। এত রিক্সা আর সাইকেল এক সঙ্গে কখনও দেখে নি বিলাস। আর কি শব্দ। কানে তালা ধরে যাবে। শহরটাকে তার কিছুতেই মনে ধরছিল না। মানুষের মুখগুলো অদ্ভুত। তাকালে মনের কথা বোঝা যায় না।

সুখলতা বউদির বাড়িটা হাসপাতাল থেকে মিনিট আটেকের পথ। বেশ পুরোন টিনের চালওয়ালা বাড়ি। সামনে বাখারির বেড়া দেওয়া বাগান। ভেতরে ঝুপসি কিছু আম কাঁঠাল গাছ।

'কি বলল ডাক্তার ?' সুখলতা বউদির গলা ভেসে এল। তখন বিকেল শেষ। অন্ধকার নামব নামব করছে।

'বলল ভয় নেই, সেরে যাবে।' কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দিল বুড়ো বাপ।

'যাক, চিন্তা ঘুচল। কাল থেকে তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই। ওসব এখন থেকে বিলাসই করবে।'

'ভালো, তাই ভালো। আমি আর পারি না। একটু হাঁটতেই—তোর মা কোথায় ?'

'রান্নাঘরে। মা তো ধুঁকছে, রাতে কিছু দেখতে পায় না বলল।'

'বয়স কত হলো ভাব। এবার যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে আছি আমরা। কিন্তু-তোর কপালে এ কি হলো! বাচ্চা নেই, স্বামীটারও ওই দশা।'

আমার কথা ভেব না। আমি বেশ আছি।' সুখলতা বউদি চাপা গলায় বলতেই বিলাসের খারাপ লাগল। সত্যি মহিলার মনে দুঃখ আছে। বাইরে যে মুখরা ভাবটা দেখায় সেটা সত্যিকারের নয় বোধহয়। এই সময় তার দিকে নজর পড়ল

সুখলতা বউদির। কপালে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞাসা করল বউদি, 'এই যে সত্যবাদী, সব দেখে শুনে নিয়েছ তো? কাল থেকে তুমি আমার ভরসা' অন্ধের লাঠি, অগতির গতি। বাবা পারবে না, তোমাকেই যাওয়া আসা করতে হবে।'
বিলাস বলতে গেল, হ্যাঁ সব নিয়েছে সে কিন্তু তার পক্ষে বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। মায়ের কাছে কথা দিয়ে এসেছে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে। মদনদা কতদিনে সেরে উঠবে তা কে জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কিছু বলল না। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে এখন প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে। সুখলতা বলল, 'মুখে কথা না ফুটলে পিত্তি জ্বলে যায়। এসো, তোমার থাকার জায়গা দেখিয়ে দিই।'
ভেতরে এক চিলতে বাগান। তার ওপাশে দুটো ছোট কাঠের ঘর। দেখেই বোঝা যায় সদ্য পরিষ্কার করে বাসযোগ্য করা হয়েছে। সুখলতা বউদি বলল, তোমার জন্য এই ঘর। কেউ বিরক্ত করবে না, বেশ নিরিবিলিতে থাকতে পারবে। এইদিকেই জানলা খুললেই বাগান। ওপাশে কুয়ো আছে আর তার গায়েই কল-পায়খানা ঠিক আছে?'
বিলাস মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।
রাত্রের খাওয়া বলতে ভাত ডাল আর একটা নিরামিষ। এরা রুটি খায় না বলে খুশী হলো সে। তারপর হ্যারিকেনটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। তক্তপোশটার ওপর পাতলা তোশক দেওয়া আছে বটে কিন্তু সেটা খুব আরামের না। বিলাস অবশ্য এসব নিয়ে মোটেই ভাবছিল না। মদনদা বাঁচবে কি মরবে বোঝা যাচ্ছে না। নেহাৎ দায়ে পড়ে তাকে আসতে হলো এখানে। থাকার জায়গাটা সুবিধের নয়। কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ বের হচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে অবশ্য গন্ধটাকে টের পাবে না। কিন্তু এর চেয়ে হাসপাতালের মধ্যে একটা বিছানা পেলে ভালো হতো। অত অসুস্থ মানুষ এক জায়গায়। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ মরছে বা মরবে। সে নিশ্চিত দেখতে পেত সেই মরে যাওয়া। যখন মানুষ খাবি খায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে তখন তাকে সে জিজ্ঞাসা করত যম বলে কেউ আছে কিনা? কেমন লাগছে ওই সময়? কিছু দেখতে পাচ্ছে নাকি? মানুষের শরীরে যখন জন্মাবার আগে প্রাণ ঢোকে তখন তো দেখার উপায় নেই, কিন্তু মরবার সময় শরীর ঠাণ্ডা করে ওটা যখন বেরিয়ে যায় তখন তো দেখার সুযোগ থাকে। অনেকেই দেখেছে কিন্তু সে দেখতে পায় নি।
মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল বিলাসের। তার মনে হলো স্বপ্নটাই দেখছে। সে স্বপ্ন দেখছিল মদনদা বলছে, বিলাস আমি মরলাম। এই দ্যাখ আমার শরীর কেমন বের হয়ে আসছে। প্রাণটা বুক থেকে বেরিয়ে গলায় চলে এসেছে। দাঁতে চেপে আছি বলে বেরুতে পারছে না। সুখলতাটাকে সুখ দিতে পারলে খুশী হতাম। ও বেচারা কি নিয়ে থাকবে বল? আমি মরলে তো শহরে চলে যাবে। আমার দোকান ভিটে সব শেষ হয়ে যাবে। এবার আমি হাঁ করব বিলেস তুই বিশ্বরূপ দর্শন কর। আর তখনই সুখলতা বউদি পায়ের কাছে বসে ডুকরে কেঁদে উঠল। স্বপ্নটা এখানেই শেষ। ঘামে শরীর ভিজে গিয়েছিল। বিছানায় উঠে বসল বিলাস। এইভাবে বলে বলে মরে যাওয়া যায় নাকি। এবং তখনই তার কান্নার

শব্দ পেঁছিল। কেউ যেন চাপা গলায় ডুকরে কাঁদছে। অবিকল স্বপ্নের সুখ-লতার মতো। কিন্তু এটা স্বপ্ন নয়। বিলাস বিছানা থেকে নেমে জানলার কাছে দাঁড়াল। হালকা তারার আলোয় বাগানটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। তারপর তার নজরে এলো। তুলসীবেদীর সামনে বসে সুখলতা বউদি চাপা গলায় কেঁদে যাচ্ছে। এখন কত রাত কে জানে। পৃথিবীতে কোনো প্রাণ জেগে নেই বোধহয়। সুখলতা বউদি এই সময় একাকী বাগানে বসে কাঁদছে কেন ? তাহলে কি মদনদার কোনা খারাপ খবর এল ? সেটা এলে বাড়িটা চুপচাপ থাকবে কেন ? বিলাসের কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। সে চুপচাপ বিছানার ফিরে এসে চোখ বন্ধ করল। ঘুমিয়ে পড়লে সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মরলে যেমন কোনো সমস্যাই থাকে না। যে মরে গেল তার আর কি দুশ্চিন্তা। ঘুম তাহলে মৃত্যুর ছোটভাই। আপাতত চোখ বন্ধ করে প্রাণপণে ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগল বিলাস। কিন্তু কান্নাটা যতক্ষণ মিলিয়ে না যাচ্ছিল ততক্ষণ ঘুম এল না। তাহলে ঘুম এবং জাগরণের মধ্যে কান্না পাঁচিল তুলতে পারে কিন্তু জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে যতই কান্না থাকুক দ্বিতীয়টিকে সেটা ঠেকাতে পারে না।

দুপুরে নিজের ঘরে ঢুকে বিলাসের মনে হলো আর নয় এবার তাকে পালাতেই হবে। সুখলতা বউদি তাকে চাকরের মতো খাটাচ্ছে। আজ সকাল থেকে কি কি কাজ করেছে তার একটা হিসাব করল সে। ভোর বেলায় চা খেয়েই বাজারে তাকে ছুটতে হয়েছে। না, মাছ নেই তালিকায়, যত রাজ্যের নিরামিষ তরকারি তাকে আনতে বলা হয়েছিল। বাজার এলেই হাসপাতালে ছুটতে হয়েছিল খবর নিতে। সেখানে ডাক্তার একটা ওষুধের লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছিল। সেটা নিয়ে বাড়িতে এসে টাকা নিয়ে ফের বাজারের গায়ের ওষুধের দোকান থেকে ওগুলো কিনে হাসপাতালে পেঁছে দিতে হয়েছিল। ফিরে এসে সুখলতা বউদির বাপের সঙ্গে শহরের আর এক প্রান্তে কালিবাড়িতে যেতে হয়েছিল মানত করতে গেলে কি কি করণীয় জানতে। ফিরে এসেই পাতলা সুজি আর ফল নিয়ে সুখলতা বউদির সঙ্গে ফের হাসপাতালে। চামচে করে বউদি মদনদাকে খাইয়েছে ভেজা খোলা চুলে ঘোমটা দিয়ে আর তাকে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে। এরপর বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়ার পর সে নিজের বিছানায় এল। এত পরিশ্রম বিলাস জীবনে করেনি। বউদির বাপটা খুব খিটকেল লোক। কালিবাড়িতে গিয়ে উঠতেই চায় না। বিলাস ঠিক করল মদনদা একটু সুস্থ হলেই সে কেটে পড়বে।

বিকেলে সুখলতা বউদি তাকে ডেকে ঘুম ভাঙাল, 'এই যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, এখানে এসে ঘুমুলেই চলবে ? হাসপাতালে যেতে হবে না ?'

তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে নিল বিলাস। তারপর সুখলতা বউদির সঙ্গে বেরুল। রাস্তায় সে আগে আগে যায়, সুখলতা বউদি অনেকটা পেছনে। হাসপাতালে গিয়ে খবরটা পেয়েই থমকে গেল বিলাস। মদনদার অবস্থা নাকি খুব খারাপ। দুপুরে তারা চলে যাওয়ার পরই নাকি কষ্ট বাড়ে। এখন ওকে এমন একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখানে ভিজিটারদের যাওয়া নিষেধ। নার্স বলল, বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে বলা যাচ্ছে না কিছু। সুখলতা বউদি হাঁউমাউ করে

উঠলেন। নার্স ধমকে উঠলেন, 'অমন করে কাঁদবেন না। আপনার স্বামী এখনও মারা যায় নি। মনে জোর না থাকলে হাসপাতালে আসেন কেন? এই তো আমরা দুবেলা কত লোককে মরতে দেখি, কই আমাদের চোখে জল আসে না তো!'
সঙ্গে সঙ্গে বিলাস বলল, 'আপনি অনেক মরতে দেখেছেন না?'
নার্স তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে চলে গেল। সুখলতা বউদিকে ওরা মদনদার কাছে যেতে দিল না, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও। তবে মদনদার অবস্থা খারাপ, খুব খারাপ।
বাইরে বেরিয়ে এসে সুখলতা বউদি বলল, 'কালিবাড়ি যাব।'
বিলাস আপত্তি করল না।
রাত্রে নিজের বিছানায় শুয়ে ভাবছিল বিলাস। সুখলতা বউদি মুখরা বটে কিন্তু মদনদাকে সত্যি ভালবাসে। কালিবাড়িতে একজন তান্ত্রিক আছেন। তিনি সুখলতা বউদিকে বলেছেন মদনদাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন। দু হাজার টাকা লাগবে যজ্ঞ করতে। তাহলেই বেঁচে যাবে মদনদা। সুখলতা বউদি রাজী হয়েছেন। কাল সকালে যাবেন ব্যবস্থা করতে। স্বামীর প্রতি টান না থাকলে এটা হতো না।
আজ কিছুতেই ঘুম আসছিল না। এই ঘরে গুমোট গরম, জানলা দিয়ে কোনো হাওয়া ঢুকছে না। এখন মধ্যরাত। বিলাস তাকিয়ে দেখল গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত কাঁপছে না। এই সময় ওরা যদি তাকে মদনদার পাশে থাকতে দিত! মদনদাকে সে জিজ্ঞাসা করত, কেমন লাগছে মদনদা। জীবনটা ভালো না মরণ।
এবং ঠিক সেই সময় কান্নার শব্দ শুনতে পেল। বিলাস দেখল কালকের জায়গায় সুখলতা বউদি বসে কাঁদছে। আজ কিছু তারা নেই আকাশে কিন্তু আবছা আদলে বোঝা যায় কে বসে ওখানে। এই সময় ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল আর বিদ্যুৎ চমকে উঠল আকাশে। মানুষ যখন মরে তখন নাকি প্রকৃতিতে এমন হয়। বিলাসের বুক ছাঁত করে উঠল। তবে কি মদনদা? সে দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। তারপর তুলসীতলায় পৌঁছে ডাকল, 'বউদি, আপনি—।'
সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল সুখলতা। তার ফাঁপা খোলা চুল পিঠে সাপের মতো দুলতে লাগল। বিলাস আবার বলল, 'বৃষ্টি আসছে। আপনি কাঁদবেন না।'
সুখলতা উঠল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। তার শরীর কাঁপছিল।
দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি নামল। আর সুখলতা বউদি, ডুকরে উঠলেন, 'আমি কি নিয়ে থাকব, ও চলে গেলে আমার বেঁচে থাকার কি দরকার।'
এ প্রশ্নের উত্তরে বিলাস কি বলবে? সে শুধু বলতে পারল, 'বৃষ্টি পড়ছে, আপনি ঘরে যান বউদি।'
তার কথায় কাজ হলো। সুখলতা বউদি উঠে দাঁড়াচ্ছে দেখে বিলাস দৌড়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো। এই ছিল গুমোট গরম আবার এই মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস। বিলাস গেঞ্জিটা খুলে ফেলে খাটে বসতে যেতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। এবং তখনই তার ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো সুখলতা। হ্যারিকেন নেভান।

কিন্তু অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝতে পারল বিলাস। সে উঠে দাঁড়াল, 'কি ব্যাপার ?'
'আমার ঘরে যেতে গেলে ভিজে যেতাম তাই তোমার ঘরে এলাম।'
'ও। বসুন দাঁড়িয়ে কেন ?'
'আজ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলে বিলাস ?'
প্রশ্নটা শুনেই ঢোঁক গিলল সে। মায়ের কড়া নিষেধ ছিল সে যেন কখনও গণেশকাকার বাড়িতে না যায়। সত্যি, যাওয়ার পর তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গণেশকাকার মেয়ের কথা বলেছে ঠেস দিয়ে। যে গ্রামে বাস করে তার মধ্যে সভ্যতা বলে কিছু দেখা যাচ্ছে না। বড় মেয়েটা ঠাট্টা করে বলল, 'কি করে থাকেন ওখানে!' আর এসব কথা হলো গণেশকাকার সামনে। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'আহা, অমন করে বলে না। বিলাস আমাদের ভালো ছেলে। কয়েকবার শহরে এলেই তোদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।' ফেরার সময় গণেশকাকা বললেন,'কদিন এখানে আছ তো ? ভালো। তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। তোমার বাপ শহরে এলেই সেখানে যেত। আমিও মাঝে মধ্যে মন খারাপ হলে যাই। সে তোমাকে দেখতে চেয়েছে, তোমার বাপকে খুব ভালবাসতো তো!'
'কে ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল বিলাস।
'গেলেই বুঝতে পারবে।' রহস্যটা আর ভাঙে নি গণেশকাকা।
সুখলতার প্রশ্নের জবাব দিল বিলাস। শুধু শেষটুকু ছাড়া। সঙ্গে সঙ্গে খপ করে তার হাত ধরল সুখলতা, 'খবরদার যাবে না। গণেশের মেয়েরা মানুষখেকো। তোমাকে ছিবড়ে করে দেবে।'
'যাঃ, কি বলছেন ?'
'মিথ্যে বলছি ? তোমার মাকে আমি বলে এসেছি তোমাকে ভালো রাখব। তুমি ওখানে যাবে না।'
'কি হবে গেলে ?'
'ও। খুব শখ ? কি আছে ওই মেয়েগুলোর শরীরে। চিমসে, কাঠি কাঠি, ঢঙ ছাড়া কিছু জানে না। এরকম বুক আছে, এরকম ?' ধরে থাকা হাতটা নিজের শরীরে চেপে ধরল সুখলতা।
সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেল বিলাস। একতাল নরম মাখন যেন তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরল। সেই বৃষ্টিস্নাত ঝড়ের মধ্যরাতে সুখলতা বউদি বাঘিনীর মতো তার শরীরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা আর একটা অজানা শরীরকে টেনে বের করতে লাগল ততক্ষণ যতক্ষণ তার নিশ্বাস ক্লান্ত না হয়।
দ্রুত খাট থেকে নেমে জামাকাপড় সংযত করল সুখলতা। তারপর চাপা গলায় বলল, 'কেউ যেন জানতে না পারে। তোমার দাদা আমাকে জীবন দিতে পারে নি। এখন থেকে সবাই জানবে যে সে যাওয়ার আগে আমায় জীবন দিয়ে গেছে।'
'জীবন।'
'হুঁ। আমার শরীরে এইমাত্র যেটা এল।' খোলা দরজা হা হা করছে, সুখলতা

বৃষ্টির মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

চিৎ হয়ে পড়ে রইল বিলাস। তার সমস্ত শক্তি হরণ হয়ে গেছে। নির্জেকে একটি মৃতদেহের মতো মনে হচ্ছে। বাকি জীবনটা তাকে বেঁচে থাকতে হবে একটা দায় মাথায় নিয়ে। দায়টা নিজের কাছে। মদনদা বেঁচে গেলে সেটা যতটা বড় না হবে মরে গেলেও একবিন্দু কমবে না।

এই মুহূর্তে নিজের মৃত্যুদৃশ্য দেখছিল বিলাস।

কপাল ভালো না হলে এরকম ফ্ল্যাট পাওয়া মুশ্কিল। তিনটে বড় বড় ঘর, ডাইনিং স্পেশ এবং উপরি একটা টেলিফোনও রয়েছে। আগের ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যাওয়ায় ওই সুবিধেটুকু পাওয়া গেল। ভদ্রমহিলা টেলিফোন ফিরিয়ে দিয়ে যান নি। বলেছিলেন, 'আমার স্বামীর নাম টেলিফোনের বই-এ থাক, আপনি ব্যবহার করুন।' মুকুন্দর অফিসের এক সহকর্মীর পরিচিত ওই ভদ্রমহিলার তাই ফ্ল্যাটের দখল পেতে অসুবিধে হয় নি। বাড়িওয়ালাও আপত্তি করে নি শুধু একশ টাকা ভাড়া বাড়িয়েছেন। তা এই বাজারে পাঁচশো টাকায় এত সুবিধে কজনের ভাগ্যে জোটে।

সব চেয়ে যেটা উপকারে লাগছে তা হলো নতুন ফ্ল্যাট থেকে ছেলের কলেজ হাঁটা পথে মিনিট দশেকের, মেয়ের স্কুল খুব দূরে নয়। অঞ্জলি অবশ্য মেয়ের স্কুলবাস ছাড়িয়ে দেবার বিপক্ষে। মুকুন্দও পাঁচ মিনিট হাঁটলেই মিনিবাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে যেতে পারে। দমদমে থাকলে যেসব ঝামেলা তা সহজেই এড়ানো গেল এখানে এসে। পাড়াটাও খুব ভদ্র। উত্তর কলকাতায় এই অঞ্চলের বাসিন্দারা বেশির ভাগই পুরনো। দুদিন সকালে এসে মুকুন্দরা ফ্ল্যাটটা দেখে গেছে। বাড়িটার সামনে অবশ্য একচিলতে বস্তি আছে, তা থাক, এত বড় বড় বাড়ির তুলনায় সেটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

কদিন ধরে দিনে দিনে জিনিসপত্র আসছিল। ফ্ল্যাটটা সাজানো হয়ে গেলে অঞ্জলিরা এলো। টানাপোড়েনের এই কটা দিন মুকুন্দরা শখ করে হোটেলে ছিল। এও এক ধরনের মজা, কলকাতায় থেকেও হোটেলে রয়েছে। আসলে নতুন জায়গায় গিয়ে অঞ্জলিরা কোনো অসুবিধেয় পড়ুক, অথবা পুরনো জায়গায় ছন্নছাড়া হয়ে থাকুক তা চায় নি মুকুন্দ। সব কিছু সাজানো হয়ে গেলে ওরা দুপুরে এসে হাজির হলো নতুন ফ্ল্যাটে। বরুণ এবং কেয়ার মোটেই ইচ্ছে ছিল না তাদের বাবা উত্তর কলকাতায় ফ্ল্যাট নিক। তারা অনেক জপিয়েছিল যাতে মুকুন্দ সাদার্ন এভিনুার ধারে কাছে ফ্ল্যাট খোঁজ করে। কেয়া যে ইংরেজি স্কুলে পড়ে তার অনেক মেয়েই থাকে সেদিকে। ইদানিং বরুণের বন্ধুবান্ধব ওদিকেই বেশি হয়েছে। মুকুন্দ রাজি হয় নি। সওদাগরি অফিসে প্রায় তিন হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছে বলে তা ফ্ল্যাটের পেছনে উড়িয়ে দেওয়ার যুক্তি নেই। তাছাড়া তার উত্তর কলকতাই ভালো লাগে, নিজের জায়গা বলে মনে হয়।

বিছানায় শুয়ে আকাশ দেখছিল মুকুন্দ। অঞ্জলি চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে ট্রামবাসের শব্দ আসে না এই একটা বাঁচোয়া। কিন্তু তোমার নতুন কাজের লোক কি বলছে জান?'

অঞ্জলির এইটেই স্বভাব। একটু খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে যেন ওর সুখ নেই।

তোমার কাজের লোক, যেন ওই মধ্যবয়সিনী কর্মীটি মুকুন্দর লোক। উদারতায় অগ্রাহ্য করল খোঁচাটা মুকুন্দ, 'কি বলছে ?'
কাপটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে অঞ্জলি বলল, 'সামনের বস্তিটা নাকি ভালো নয়।'
'তাতে আমাদের কি এসে গেল। আট-দশ ঘর নিয়ে একটা বস্তি, এতবড় ভদ্রলোকের পাড়ায় আর কি খারাপ করতে পারে। অন্তত কেয়াকে নিয়ে তো তোমার দুশ্চিন্তা এখানে থাকবে না।' মুকুন্দ চায়ে চুমুক দিল।
অঞ্জলি মাথা নাড়ল। কেয়া ষোলতে পা দেওয়া মাত্র পুরনো পাড়ার ছেলের দল অতিষ্ঠ করে মারছিল। মেয়ের স্বাস্থ্য ভালো, মুখ চোখ সুন্দর। বরুণের বন্ধুরাই বা কম কি। কারণে অকারণে বাড়ি আসা, জল চাওয়া। আর মেয়েটাও যেন এসব বেশ উপভোগ করত। এখানে এসে অন্তত সে ঝামেলা থেকে বাঁচা গেছে।
চা শেষ করামাত্র টেলিফোনটা বেজে উঠল। আর তখনই ছুটতে ছুটতে এলো বরুণ আর ওপাশ থেকে কেয়া। অঞ্জলি বলল, 'দাঁড়া, আমি ধরছি।'
'কেয়া বলল, 'মা, প্রথম টেলিফোনটা আমি ধরি।'
মুকুন্দ হাসল, 'ওকেই দাও না ধরতে।' অঞ্জলি একটু ইতস্তত করে থেমে যেতে কেয়া দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলল। 'হ্যালো। হ্যাঁ, কাকে চাই ?'
ঘরের তিনজোড়া চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল কেয়া। মুকুন্দর মনে হলো মেয়েটা সত্যি বড় হয়েছে, এবার শাড়ি পরা উচিত। কেয়া তখন বলছে, 'আমরা দুপুরে এসেছি। পাড়াটা ভালো। হ্যাঁ, কাল থেকে স্কুলে যাব।' তারপরে কিছুক্ষণ চুপ, 'কিরে কেমন আছিস ? তোরাই আমাদের প্রথম টেলিফোন করলি। ইস্, নর্থ হলে হবে কি, আমাদের ফ্ল্যাটটা গ্র্যান্ড। কি ? ও, না, ফোনটা বাবার ঘরে। আচ্ছা, ঠিক আছে। রাখছি।' রিসিভার নামিয়ে রেখে কেয়া সরল গলায় হাসল, 'জয়া ফোন করেছিল।'
অঞ্জলির মুখ তখন থমথমে, 'জয়াটা কে ?'
'বাঃ, আমার বন্ধু। সল্ট লেকে থাকে। তুমি ত ওর নাম শুনেছ।'
'এ বাড়ির ফোন নাম্বার পেল কি করে ?'
'আমি দিয়েছিলাম। এর আগে যেদিন এসেছিলাম দেখে গিয়েছিলাম। তুমি এমন করে প্রশ্ন করছ যেন আমি খুব অন্যায় করেছি।' কেয়া মুখ ফেরালো।
মুকুন্দ ব্যাপারটা সহজ করার জন্যে বলল, 'কেয়া আমাকে হারিয়ে দিল। আমি ভেবেছিলাম আমার টেলিফোন আগে আসবে।'
ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে যাওয়ার পর অঞ্জলি বলল, 'এ আর এক জ্বালা হলো '
'কি ?'
'ঘনঘন টেলিফোন আসবে আর বললেই মুখ হাঁড়ি হয়ে যাবে। ওপাড়ায় ছেলেগুলোকে নম্বর দিয়ে এসেছে কিনা কে জানে!' অঞ্জলি সত্যি সত্যি চিন্তিত।
'তুমি তোমার মেয়েকে সন্দেহ করছ ?'
'ওই বয়সটাকে বিশ্বাস করা যায় না।'
'তোমার নিজেরও ওই বয়স একদিন ছিল।'
'ছিল বলেই জানি। সেই বয়সেই তুমি এসেছিলে।'

মুকুন্দ আর কথা বাড়ায় না। বলল, 'মিছিমিছি চিন্তা করছ। আমার ছেলে-মেয়েকে আমি একটা জিনিস শিখিয়েছি, ওরা কখনও কুরুচিকর কিছু করবে না।'
আর ঠিক তখনই কানের ভেতরে যেন গরম সীসে ঢুকল। একটা জড়ানো গলা অকথ্য শব্দ উচ্চারণ করছে অনায়াসে। সেই নোংরা দুর্গন্ধ যুক্ত শব্দগুলো ছিটকে ঢুকে পড়ছে এই ফ্ল্যাটের সর্বত্র। মুকুন্দ সচকিত হয়ে অঞ্জলির দিকে তাকাল। অঞ্জলি হতভম্ব, মুখ লাল। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল মুকুন্দর। ওই মুহূর্তেই তার মনে হচ্ছিল এই শব্দগুলো কেয়া এবং বরুণ শুনেছে। গলাটা স্তব্ধ হয়েছে কিন্তু এই বাড়িতে যেন নোংরা গন্ধটা এখনও ভাসছে। অঞ্জলি কোনোরকমে বলল, 'ছি!'
মুকুন্দ দ্রুত হাতে একটা পাঞ্জাবি গলিয়ে নিল, 'আমি দেখছি।'
চকিতে বাধা দিল অঞ্জলি, 'না, নতুন পাড়া, কাউকে জান না, হুট করে কোনো ঝামেলায় যেও না।'
মুকুন্দ বলল, 'কিন্তু ছেলেমেয়েকে নিয়ে এই খিস্তি শুনতে হবে?'
অঞ্জলি আড়চোখে তাকাল, 'ছেলেমেয়ে না থাকলে শুনলে আপত্তি নেই?'
মুকুন্দ কোনো কথা না বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসে দরজা খুলল। সবে সন্ধ্যের আলো জ্বলেছে। দরজার গায়েই রাস্তা। ছোট্ট পিচ বাঁধানো লেন। ব্লাইন্ড লেন। তার ওপাশে বস্তির ঘরের দরজা খোলা। সেখানে দুটো লোক দাঁড়িয়ে গ্লাস হাতে টলছে। একটি স্ত্রীলোক দরজায় দাঁড়িয়ে পয়সা গুনছিল। মুকুন্দ হতভম্ব হয়ে গেল। প্রকাশ্যে বাংলা মদ বিক্রি এবং খাওয়া হচ্ছে। ঠিক তার দরজার সামনেই চোলাই-এর দোকান।
বাড়িটা ভাড়া নেওয়ার আগে কখনও সন্ধ্যের পর মুকুন্দ এখানে আসে নি। দিনের বেলায় যখনই এসেছে দেখেছে বস্তির ওই ঘরটা নিরীহ ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে। ওই স্ত্রীলোকটিকেও সে কুটনো কুটতে দেখেছে। অথচ। বাড়িওয়ালা কিংবা আগের ভদ্রমহিলা বলেন নি যে দরজার সামনেই এই কান্ড হয়। এই সময় পানরত একজন জড়ানো গলায় কিছু বলে উঠতেই মুকুন্দ চিনতে পারল। এই লোকটাই তখন চেঁচিয়ে খিস্তি করছিল। রোগা লিকলিকে চেহারা বছর চল্লিশেক বয়স। একটা চড় মারলেই উল্টে পড়বে। কিন্তু এখন কিভাবে লোকটাকে শাসানো যায় তা ঠিক করতে পারছিল না মুকুন্দ। নতুন জায়গা—অঞ্জলির সাবধানবাণী মনে পড়ছিল। এইসময় ছায়ার মতো চুপিসারে চারটে ছেলে উদয় হলো। কুড়ি বাইশের বেশি বয়স নয়, চোয়াড়ে চেহারা, চাহনিতে ছুরির ধার। এদের দেখা মাত্র আগের মাতাল দুটো সামান্য সরে দাঁড়াল। স্ত্রীলোকটি চাপা গলায় বলল, 'সামনের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে, ওদের সিঁড়িতে বসবে না।'
চারটে ছেলে এক সঙ্গে ঘুরে মুকুন্দকে দেখল, সিঁড়িটা। ওদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'মালটা কে?'
'ভাড়াটে।' স্ত্রীলোকটি না তাকিয়ে জবাব দিল।

'পাহারা দিচ্ছে নাকি, হ্যা হ্যা হ্যা।' হায়নার চেয়েও শিরশিরে হাসি হাসল ছেলেটা। তারপর বলল, 'কোথায় বসব বলে দাও।'

মুকুন্দ আর দাঁড়াল না। মাথার ভেতরটায় কিলবিলে চিন্তা পাক খাচ্ছিল। এবং তখনই সে লক্ষ্য করল তাদের বাড়িগুলোর সামনে রাস্তার আলো জ্বলছে না। ফলে আবছা হয়ে আছে গলিটা। আশেপাশের বাড়ির আলো নিভে গেলে চমৎকার হবে। চুপচাপ গলিটা থেকে হেঁটে বেরিয়ে আসতেই আলোর মধ্যে চলে এলো সে। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে এপাশ ওপাশে তাকাল। সন্ধ্যে হতে না হতেই যদি বিক্রি শুরু হয়ে যায় তাহলে রাত গভীরে কি দশা হবে কে জানে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা একটা বেআইনী কারবার। অথচ পাড়ার লোকজন এই ব্যবস্থা মেনে নিচ্ছে কি করে ?

মুকুন্দ দেখল বাড়িওয়ালা সুভাষবাবু ফিরছেন। ওকে দেখে হেসে বললেন, 'কি ব্যাপার, এখানে ? কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো ?'

মুকুন্দ বলতে গিয়ে মত পাল্টালো, 'এমনি দাঁড়িয়ে আছি।'

'এই এলাকা এখনও বেশ পিসফুল। নকশাল টাইমেও এখানে বোম ফাটে নি। অথচ পাশের পাড়ায় দিনদুপুরে খুন হয়েছে। আছেন যখন তখন প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে, বুঝতে পারবেন।' সুভাষবাবু বলে যাচ্ছিলেন। এবং তখন মুকুন্দ ফস করে বলে ফেলল, 'কিন্তু একটা কথা। আপনার বাড়ির সামনে যে কাণ্ডটা সন্ধ্যের পর ঘটছে সেটা তো মারাত্মক।'

'ও, মদ বিক্রির কথা বলছেন ? ওইটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে। মনে করুন, আপনি কিছু দ্যাখেন নি। ওই দিকের জানলা বন্ধ রাখবেন। ব্যাস।'

'একি বলছেন। ওরা যে অশ্রাব্য চিৎকার করে সেটার কি হবে ?'

'চিৎকার চেঁচামেচি তো সচরাচর হয় না। আর হলেও মনে করবেন শোনেন নি। বললাম তো উপেক্ষা করতে হবে।'

মুকুন্দ হতভম্ব হয়ে গেল, 'আপনি কি বলছেন। এরকম একটা জঘন্য ব্যাপার পাড়ার মধ্যে চলতে দেওয়া আপনাদের উচিত হচ্ছে না।'

সুভাষবাবু বললেন, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না।' চলতে দেবার না দেবার আমরা কেউ না। ব্যাপারটা উপেক্ষা করুন দেখবেন কোনো ঝামেলায় পড়বেন না।

সুভাষবাবু চলে গেলেন। মুকুন্দর শরীর যেন জ্বলছিল। এইসব ক্লীব মানুষ-গুলোর জন্যে সমাজবিরোধীরা মাথায় উঠে বসে। ওর মনে হলো এখনই থানায় গিয়ে নালিশ করা উচিত। তারপরেই মনে হল অঞ্জলির কথা, নতুন জায়গা।' দ্বিধাগ্রস্ত মুকুন্দ ঠিক করল কাল সকালে একটা কিছু বিহিত করতে হবে। বাড়ির সামনে এসে দেখল বেশ আসর বসে গেছে। বোতল এবং গ্লাস নিয়ে জনা দশেক রাস্তায় রকে বসে গেছে। ওদের মধ্যে একজন গুনগুন করে গাইছিল 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়।' গলাটি ভালো, গাইবার ভঙ্গিও। কিন্তু তবু অসহ্য মনে হলো মুকুন্দর। কিন্তু সে লক্ষ্য করল তাদের সিঁড়িটা ফাঁকা। স্ত্রীলোকটির অনুরোধ মাতালগুলো রেখেছে।

দরজা খুলতে দেরি হচ্ছিল। তাদের ঢোকার মুখ বাড়িওয়ালার থেকে পৃথক। বেশ কিছুক্ষণ বাদে বরুণ দরজা খুলতেই মুকুন্দ চেঁচিয়ে উঠল, 'ঘুমচ্ছিলি নাকি তোরা ?' চিৎকারটা শুনে বরুণ যেমন চমকে উঠল আশেপাশের মাতাল-গুলোও। কারণ চট করে গুঞ্জনটা থেমে গেল, গান বন্ধ হলো। মুকুন্দ বেশ গোঁয়ার ভঙ্গিতে বরুণের পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। অঞ্জলি নেই। পাশেরটা বরুণের, ওপাশেরটা কেয়ার। সে অঞ্জলির খোঁজে কেয়ার ঘরে ঢুকেই মুখ নামাল। মেয়েটা বড় হয়েছে কিন্তু কাপড়চোপড়ের হুঁশ হয় নি। চট করে বেরিয়ে আসতে সে অঞ্জলিকে দেখতে পেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকছে। মুকুন্দ ঘরে আসামাত্র বলল, 'অমন অসভ্যের মতো চেঁচাচ্ছিলে কেন ?'

মুকুন্দ হঠাৎ আবিষ্কার করল অঞ্জলিকে বলার মতো কিছু নেই। তবু সে ওকে খুঁজছিল কেন ? রাগত ভাবে সে বলল, 'দরজায় শব্দ করছি কিন্তু সবাই কালা হয়ে বসে রয়েছে।'

'তুমি মাত্র তিনবার নক করেছ, পরপর।'

'শোন, তোমার মেয়েকে বলবে অসভ্যের মতো ঘরে যেন শুয়ে না থাকে। এত বড় হয়েছে সব একটু সভ্য ভব্য হলো না, কি যে শিক্ষা দিচ্ছ তুমি কে জানে।' মুকুন্দ কথাটা শেষ করে চেয়ারে গিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে বসল। ওর শরীরটায় কেমন ঝিমুনি আসছে অথচ কি করা যায় বুঝতে পারছিল না।

পরদিন অফিসে গিয়ে সহকর্মী অফিসারকে ব্যাপারটা বলল মুকুন্দ। ভদ্রলোক বললেন, 'থানায় না গিয়ে তুমি ভালো করেছ। এরকম একটা ব্যাপার পাড়ায় চলেছে তা পুলিশ জানে না এ তো হতে পারে না। ওই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে নিশ্চয়ই থানার যোগাযোগ আছে।'

'তাহলে ?' মুকুন্দ এই ব্যাপারটা চিন্তা করেছিল। কিন্তু কূল পায় নি।

'এক কাজ কর। আমার পরিচিত একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আছেন। তাকে বলা যেতে পারে। কিন্তু আন অফিসিয়ালি।'

লাঞ্চের সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করল মুকুন্দ সহকর্মীর সঙ্গে গিয়ে। সব শুনে এ সি বললেন, 'বোঝাই যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই বেআইনী। পুলিশ নিশ্চয়ই রেইড করেছে কিন্তু—। দাঁড়ান।' টেলিফোন তুলে সেই থানার ও সিকে চাইলেন ভদ্রলোক। কানেকশন পেলে কিছুক্ষণ হুঁ হা করে শেষ পর্যন্ত রি সভার রেখে বললেন, 'আজ পর্যন্ত আটবার পুলিশ ওখানে রেইড করেছে কিন্তু কারো বিরুদ্ধে কেস ফাইল করতে পারে নি।'

'কেন ?'

'বড় বড় মাতব্বররা উমেদারি করে ছাড়িয়ে নিয়েছে এবং তাদের ঘাঁটাতে পুলিশ সাহস পায় না। কোনো বিশেষ দলের নেতা নয়, এক এক সময়ে এক একজন।'

মুকুন্দ অনুনয় করল, 'আপনি একটা বিহিত করুন। ওখানে ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকা যাচ্ছে না। এত খারাপ গালাগালি শুনতে হচ্ছে।'

অফিসার বললেন, 'তা তো হবেই। ওখানে যারা মদ খেতে যায় তারা নিচু ক্লাসের লোক, মদ পেটে পড়লে আর কন্ট্রোল করতে পারে না। আপনি বরং এক কাজ করুন। ব্যাপারটা পুলিশের লেভেলে করে লাভ নেই। আমি ধরে নিয়ে আসব এবং কাল চাপে পড়ে ছেড়ে দেব। আপনি বরং লোক্যাল রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে কথা বলুন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একমাত্র ওঁরাই পারেন এসব কাজ।'

পরের দিন মুকুন্দর ছুটি। সকাল বেলায় বাজার সেরে কাগজ নিয়ে বসেছিল এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। এখনও আত্মীয়-স্বজনেরাও নম্বর জানে না তবু টেলিফোন বাজছে। রিসিভার তুলতেই মনে হলো ওপাশে জোর বাজনা বাজছে। হ্যালো বলা মাত্র শুনল, 'হা-ই। কাল এলে না কেন?'
মুকুন্দ চমকে উঠল। বেশ পরিশীলিত বাঁকা ইংরেজি বলা গলা। মেয়েটির বয়স কত মালুম হলো না। নিশ্চয়ই ভুল জায়গায় কানেকশন এসেছে। একটু মজা করার ইচ্ছে হলো মুকুন্দর। গলাটা নরম করে বলল, 'এমনি।'
'এমনি? তুমি জানো না কি মিস করেছ। হ্যারি কাল যা এনেছিল না, রিয়েল হট স্টাফ। পাঁচ মিনিট টানলে দু ঘণ্টা ব্ল্যাঙ্ক। আমি তো রাত দশটার আগে বাড়িতে ফিরতে পারিনি। ওঃ বরুণ, য়ু শুড শেয়ার ইট। হ্যারি বলেছে হি ইজ ট্রাইং ফর মোর হট।'
মুকুন্দর মাথা ঝিমঝিম করছিল। মেয়েটি কি ব্যাপারে কথা বলছে? রঙ নাম্বার হয় নি কারণ ও ভাবছে বরুণই টেলিফোন ধরেছে। হট স্টাফ, ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাওয়া—! ওরা কি নেশার কথা বলছে। অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে মুকুন্দ নিঃশব্দে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। বরুণ কি নেশা করে। এই বয়সে লুকিয়ে চুরিয়ে সিগারেট খেতে পারে কিন্তু ওরকম একটা ট্যাঁস মেয়ের সঙ্গে বড় নেশা কি করতে পারে? গাঁজা? এল এস-ডি? কোনোদিন ছেলের সম্পর্কে এমন কোনো অভিযোগ পায় নি মুকুন্দ, আচরণে কিছু দ্যাখে নি। চিৎকার করে বরুণকে ডাকতেই টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল। মেয়েটি নিশ্চয়ই আবার ফোন করছে। দরজায় ততক্ষণে বরুণ, 'বাবা, ডাকছ?'
'মুকুন্দ, কিছু বলার আগেই সে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলল, 'হ্যাঁলো, হ্যাঁ, ধরুন, বাবা তোমার ফোন।'
যা আশা করেছিল তা হলো না বলে চুপসে গেল মুকুন্দ। উঠে রিসিভারটা তুলে বরুণকে বলল, 'ঠিক আছে, যাও।' তারপর বলল 'হ্যালো'।
মুকুন্দর সহকর্মী টেলিফোন করছেন। তিনি ওই পাড়ার একজন এম এল এর সঙ্গে কথা বলেছেন। আজ সকালেই যেন দেখা করে মুকুন্দ।
বরুণের ব্যাপারটা মনের মধ্যে খচখচ করছিল। জলখাবারের টেবিলে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না সে নেশা করে। মুখে এখনও সরলতা। অবশ্য বিয়ের আগে এবং পরে বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে মুকুন্দ এক দু পেগ হুইস্কি খেয়েছে। কিন্তু পানটান খেয়ে যখন বাড়িতে

ফিরেছে তখন কেউ টের পান নি। সেরকম নয়তো। তাছাড়া ওই রকম মেয়ের সঙ্গেই বা ওর কি করে আলাপ হলো ? না, এখনই ঘটনাটা অঞ্জলিকে বলা উচিত হবে না। সময় ও সুযোগ বুঝে অঞ্জলিকে সাবধান করে দিতে হবে।
দশটা নাগাদ এম এল এর বাড়িতে পেঁাছে দেখল বেশ ভিড়। অনেকেই অনেক অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত। একবার ভাবল ফিরে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেদ চেপে গেল ওর। প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ ভদ্রলোক ডাকলেন। ঈশ্বরের মতো মুখ করে বললেন, 'বলুন।'
মুকুন্দ দেখল ঘরে আরও তিনজন বসে আছেন ! এদের সামনে কথাগুলো বলা ঠিক হবে কিনা সে বুঝতে পারছিল না। এম এল এ বললেন, 'বলুন বলুন, গণতন্ত্রে কোনো লুকোচুরি নেই। কি হয়েছে ?'
মুকুন্দ মুখ খুলল, 'আমার ফ্ল্যাটের ঠিক সামনে চোলাই মদ বিক্রি হয়।'
'এঁ্যা ? চোলাই মদ ? কেউ খেয়ে মারা গিয়েছে ?'
'না মারা যায় নি কিন্তু।'
'যাক, মারা না গেলেই হলো। সাধারণ মানুষের গড় আয় এত কম যে তাদের পক্ষে চোলাই না খেয়ে অন্য কিছু খাওয়ার তো উপায় নেই। তারপর ?'
'কিন্তু দোকানটা বেআইনী।'
'ইজ ইট ? আপনি থানায় যান, আইনের রক্ষক ওরা।'
'থানা থেকে ধরে নিয়ে গেলেও ছেড়ে দিতে হয়।'
'হবেই তো, পাবলিক ডিম্যান্ড, সেটাই বড় কথা। তা আপনার ফ্ল্যাট কোথায় ? কে বিক্রি করে চোলাই ?'
মুকুন্দ এবার ফাঁপরে পড়ল। ঠিকানাটা বলে দেওয়া যে তার নিজের পক্ষে বিপদজনক এতক্ষণের কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এম এল এ বোধহয় সেটা বুঝতে পারলেন, 'ঠিক আছে। আপনারা অফিসার, আপনার বন্ধু আমাকে বলেছে, তাই সমাজের নিচের তলার প্রবলেম জানেন না। ওই দোকানটি বন্ধ হলে একটি পরিবার না খেয়ে মরবে। যারা ওর খদ্দের তারাই বা যাবে কোথায় ? চোলাই ওদের জীবনীশক্তি। সন্ধ্যে বেলায় খেয়ে পরদিন প্রচন্ড পরিশ্রম করে। হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন।'
মুকুন্দ শেষবার চেষ্টা করল, 'কিন্তু মদ খেয়ে এত খারাপ কথা বলে যে বাড়িতে থাকা যায় না। ছেলেমেয়ে নিয়ে আছি।'
এম এল এ সোজা হয়ে বসলেন, 'হ্যাঁ, এইটেই প্রবলেম। ওরা যাতে খিস্তি না করতে পারে তার জন্যে জনমত গঠন করুন। পাড়ার সব শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে একটা খিস্তি প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলুন। তারপর আমাদের জানান, আমরা ওই কমিটির পেছনে থাকব। আপনারা ওদের গিয়ে বলুন চোলাই খেতে পার কিন্তু খিস্তি করা চলবে না। আপনাদের সম্মিলিত আন্দোলনে দেখবেন পূর্ণ শান্তি বিরাজ করবে। আসলে মানুষের বিবেকবোধকে জাগ্রত করতে হবে। দেখুন আজ কলকাতার ষাটভাগ মানুষ মদ খায়। কেউ হুইস্কি কেউ চোলাই। তবে সবাই অসভ্য ব্যবহার করে না। আপনি কখনও খান নি ?'

মুকুন্দ চুপ করে থাকল, কি জবাব দেবে ? এম এল এ শেষ করলেন, লজ্জার কিছু নেই। আমরা বুঝি তাই কণ্ট্রোল করতে পারি, ওরা পারে না। কিন্তু ওদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আপনি অফিসার বলে, দূরে সরে থাকবেন না। ঐক্য স্থাপন করুন বাক্য বলে তবেই মাণিক্য পাবেন।'

গলির মুখে ফিরে এসে মুকুন্দ দাঁড়াল। কিছুই করার নেই। হয় ওই ফ্ল্যাট ছেড়ে উঠে যেতে হয় নয় এই ব্যাপারটা সহ্য করতে হবে। কিন্তু জনমত সংগঠিত করে কিভাবে খিস্তি বন্ধ করা যায় তা তার মাথায় ঢুকছিল না।

'কি খবর মুকুন্দবাবু ?'

মুকুন্দ দেখল দূরের একটা রকে বসে সুভাষবাবু তাকে ডাকছেন। উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে ছুটির দিনে বয়স্করা রকে বসে গল্প করেন। ব্যাপারটার মধ্যে যেন বনেদিয়ানা আছে এমন ভঙ্গী। সুভাষবাবুর পাশে আরও চারজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। সে এগিয়ে বলল, 'এই একটু বেরিয়েছিলাম।'

সুভাষবাবু বললেন, 'ইনি নতুন এসেছেন আমাদের নিচের ফ্ল্যাটে। সঙ্গীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর মুকুন্দ জানতে পারল এরা প্রত্যেকেই ভালো চাকরি করেন। ছুটির দিন দেড়টা অবধি এখানে মিলিত হন। সুভাষবাবু বললেন, 'মুকুন্দবাবু বিস্তির চোলাই নিয়ে খুব বিব্রত। আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। আমি তাই বললাম ওটা নিয়ে ভাববেন না।'

এক ভদ্রলোক বললেন, 'কোনো লাভ নেই ভেবে। ভাবতে গেলেই ছকার দল ছুরি চালাবে।'

'ছকার দল ?' মুকুন্দ অবাক হলো।

'এ পাড়ার সেরা মাস্তান। বিস্তির কাছ থেকে মাসে তিনশ টাকা পায়। বন্ধ হলে ছকার ইনকাম কমে যাবে। সেটা ও বরদাস্ত করবে না। ছেলেমেয়েদের বলবেন সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফিরতে, তাহলেই হবে।'

মুকুন্দ আরও খানিকটা সময় কাটিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো। এখন পাড়াটা চুপচাপ। কি শান্ত। স্ত্রীলোকটির নাম বিস্তি। সে দরজায় কড়া নাড়ার আগে ওপাশে তাকাল। একটা বাচ্চা খেলা করছে। বিস্তি দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে পেয়ে হেসে নমস্কার করল। মুকুন্দ ঘাড় নেড়ে কড়া নাড়তে যাবে এমন সময় বিস্তি কথা বলল, 'বাবু, আপনি রাগ করেছেন ?'

মুকুন্দ থতমত হয়ে গেল। সে রাগ করেছে এ জানল কি করে। সঙ্গে সঙ্গে ছকার কথা মনে পড়ল। শিউরে উঠে সে না বলতে যাচ্ছে তখনই বিস্তি বলল, 'মাঝে মাঝে দু-একটা খারাপ লোক আসে তা ওদের বলে দিয়েছি যেন আপনার সিঁড়িতে না বসে। গরিব মানুষ, কোনমতে পেট চালাই। একটু আগে গিন্নিমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, উনি বলছিলেন আপনি রাগ করেছেন।'

'না না ঠিক আছে।' মুকুন্দ কড়া নাড়ল।

'ওহো, একটু দাঁড়ান বাবু।' বিস্তি ছুটে গেল ঘরে। তারপর দুটো খালি বড় বোতল এনে এগিয়ে ধরল, 'আপনাদের ফ্রিজে জল রাখার বোতল নেই, গিন্নিমা বলছিলেন, এই দুটো নিন। আমি ধুয়ে মুছে দিয়েছি।'

বিস্ফারিত চোখে বোতল দুটো দেখল মুকুন্দ। বাংলা বা চোলাই নয়, খাস বিলিতি হুইস্কির বোতল। অঞ্জলির সঙ্গে এর এতো কথা হয়েছে আজ সকালে। প্রচণ্ড ক্রোধে শরীর শিহরিত হতে হতেও নিজেকে সামলে নিল সে। ফ্রিজে জল রাখার বোতলের দরকার ছিল।

এই সময় দরজা খুলল বরুণ। চট করে বোতলদুটো বিশিতর হাত থেকে নিয়ে মুকুন্দ বলল, 'কত দিতে হবে?'

এক হাত জিভ বের করল বিশিত, 'ছি ছি, পাড়া প্রতিবেশী বলে কথা, বিপদে-আপদে যদি না দেখি তো আর—পয়সার কথা তুলবেন না বাবু।'

দুটো বোতল দুহাতে ঝুলিয়ে বাড়িতে ঢুকল মুকুন্দ।

রাজার খেলা

হিপ পকেট থেকে ছোট্ট হলদে বইটা বের করল সুজয়। ফন্ কোম্পানীর রেস-বুক। একটা ঘোড়ার মুখ মলাটে আঁকা। ছবিটাকে দেখলেই কানু মিত্তিরের মুখ মনে পড়ে যায় ওর। কানু মিত্তির বলত, 'রেসের আগে এটাকে দেখায় টপমোস্টের মতো আর রেস শেষ হয়ে গেলে এ শালা হয়ে যায় পাউসিকি।' প্রথমটা ভারতবর্ষের সব সেরা ঘোড়ার নাম, দ্বিতীয়টা ছ্যাকড়া গাড়ি টানবার বদলে ছিটকে ঢুকেছে রেস মাঠে। কানু মিত্তির বলত, 'বেশী দিন ঘোড়া খেললে মানুষের মুখ বুঝলে ঘোড়ার শেপ নিয়ে নেয়। পাকা রেসুড়ে যে সে তখন মুখ দেখেই চিনবে।' হেরে গেলে মুখ চোখ কেমন হয়ে যেত কানু মিত্তিরের, বলত 'আমি শালা পাউসিকি হয়ে গেছি।' সেই কানু মিত্তিরকে আজকাল দেখাই যায় না মাঠে। কলকাতায় সিজন যখন থাকতো না তখন ব্যাঙ্গালোর বোম্বাই করত কানু মিত্তির। মাঠে না থাকলে কেমন ফাঁকা লাগে। সেই কানু মিত্তির এখন একদম ডুব। মাঠের আলাপে বাড়ির ঠিকানা দেয় না কেউ। কানু মিত্তির অবশ্য বলত, যেদিন দেখবে আমি অ্যাবসেন্ট জানবে আমি টেঁসেছি।'

প্রথম পাতা খুলল সুজয়। কেমন একটা আদুরে গন্ধ। আজ ন'টা রেস। বাপ্স। নয় নয়বার আজ তুমি চান্স পাবে টাকা বানাবার। লুটে নাও—শালা কোলকাতার হাওয়ায় টাকা উড়ছে। নয় নয়বার। প্রথম রেস একটা তিরিশে, আটটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। সুজয় নামগুলো পড়ল। অদ্ভুত সব নাম। নিজের ছেলের নামও এত যত্নে কেউ রাখে না। এক নম্বর ঘোড়ার নাম 'ব্ল্যাক প্রিন্স', ওজন ষাট কেজি, জকি ই জেনিংস। খাস অস্ট্রেলিয়ার লোক, দারুণ রাইড করে। দু নম্বর—'মাই ফরচুন', ওজন সাতান্ন কেজি, জকি পি লয়েড। লয়েড সবে এসেছে বিলেত থেকে এখনও কোলকাতার মাটি চেনে নি। যে ঘোড়া যত ভালো দৌড়ায় তাকে তত বাড়তি ওজন বইতে হয়। ফলে অন্য ঘোড়াগুলো পাল্লা দিতে পারে সমানে। যদিও এটা বি ক্লাসেব বাজি, তবু সুজয়ের মনে হলো ব্ল্যাক প্রিন্সই জিতবে।

মাঠে এখনও তেমন ভিড় হয় নি। ঘড়ি দেখল সুজয় এখনও পঁচিশ মিনিট বাকী রেস শুরু হতে। বুকিদের কাউন্টারের পাশ দিয়ে বারের ভিতর চলে এলো ও। সুন্দর করে সাজানো টেবিলগুলো এখনও ফাঁকা। দুটো ফিরিঙ্গী মেয়ে কোকাকোলার বোতল নিয়ে চুপচাপ ভেজা কাকের মতো বসে। কোণার দিকের একটা চেয়ার টেনে সুজয় বসল। এখান থেকে বেটিং গ্রাউন্ডটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘাড় ঘোরাতেই বারের আয়নায় চোখ পড়ল। না, এখনও হর্সফেস হয় নি তার। এই নিয়ে তিনটে সিজন চলে গেল। টোটাল লস্ তিন হাজার। ভাবাই যায় না। একসঙ্গে টাকাটার কথা মনে হলেই বুকের মধ্যে বল ড্রপ

খেতে শুরু করে। প্রথম দিন ওকে যে নিয়ে এসেছিল সেই নরেন চাকলাদার রেস ছেড়েছে কবে—কিন্তু আসব না আসব না করেও সুজয়ের তিন সিজন চলে গেল। এত লস্—চোয়াল শক্ত করে আয়নার দিকে তাকাল সুজয়—আজকে জিততেই হবে।

টাকার দরকার, ভীষণ টাকার দরকার হেসে ফেলল সুজয়, টাকার দরকার নেই এমন রামকেষ্ট কে আছে আজ। কিন্তু মুশকিলটা হলো, চারদিকের পৃথিবীটায় অনেক সুখকর জিনিস আছে যা কিছু মানুষ চুটিয়ে ভোগ করছে। মোটামুটি হিসেব করেছে সে একটা লোকের হাত পা খেলিয়ে থাকতে হলে মাসে পাঁচ হাজার দরকার। কেউ দেবে না তাকে মুখ দেখে। ওর মাইনের দশ গুণ। এক পেগ ব্ল্যাক-নাইটের দাম আট টাকা। অথচ সুজয় জানে, জানে বলেই অবাক লাগে ওর সহকর্মীরা কেমন ওই সামান্য টাকায় বেঁচে বর্তে আছে। ওরা কেউ সুজয়ের মতো তিন প্যাকেট ক্যাপস্টেন ডেইলি কেনে না, আকাশে রোদ জমলে ট্যাকসি চড়ে না, মেয়েছেলের কথা ভাবতেই পারে না ওরা। রেসবুকটার দিকে তাকাল ও, এই বইটা কোনো বাঙালীর ড্রইংরুমে গো-মাংসের মতো নিষিদ্ধ। ওই যে মেয়েটা তার পাশ দিয়ে চলে গেল ওর গায়ের ইন্টিমেটের গন্ধটার দাম চল্লিশ টাকা। বেলবটমের কাপড়টা জাহাজী। এসব দেখে শুনে আপস করতে ইচ্ছে হয় কারো? অথচ কোনো রাস্তা নেই—গ্যাম্বলিং ছাড়া। সুন্দর রাস্তা টুবি বড়লোক। কানু মিত্তির বলত।

পর পর দু' দিন দারুণ হেরে গেছে সুজয়। একদম দেউলিয়া হয়ে যাবার মতো অবস্থা। মাসের মাঝামাঝি অথচ পকেটে শেষ সম্বল একশ টাকার একটা নোট। বাকী ক'দিন চালানোই মুশকিল। প্রভিডেন্ড ফান্ড নিল, কো-অপারেটিভে ধার—শালা ভাবাই যায় না। এই রেস মাঠে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছে সুজয়। একটার পর একটা রেসে হেরে গিয়ে মানুষের মনে দারুণ জেদ চেপে যায়। তার পর হারতে হারতে রেস শেষ হয়ে গেলে চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে বাড়ি ফেরার পথে নিজেকে কেমন ক্লান্ত লাগে, ফিনিশ শব্দটা একটা আঁটো গেঞ্জির মতো বুকটাকে জড়িয়ে ধরে।

এই কদিন ও ক্যালকুলেশন করে খেলেছে, ঘোড়ার ঠিকুজি দেখেছে, একদম গোপন সূত্রের খবরে টাকা লাগিয়েছে—কিন্তু কিছুই হয় নি। সুজয়ের ঘোড়াগুলো জিততে জিততে উইনিং পোস্টের কাছে মার খেয়ে যায়। রেসে বোধ হয় কেউ জিততে পারে না—এরকম ধারণা ও যখন প্রায় করে ফেলেছিল ঠিক তখনই নজরে পড়ল মেয়েটাকে। ঠিক মেয়ে বললে ভুল হবে। অবশ্য মেয়ে এবং মহিলার পার্থক্য এখন লাইন টেনে করা যায় না। বিশেষ করে এই সব বিয়ার-বাটারে বেড়ে ওঠা মেয়েদের। চল্লিশ আর চব্বিশ রুপোর টাকার এপিঠ ওপিঠ। লক্ষ্য করেছিল কদিন ধরে। মেয়েটি রেস দেখতে গ্যালারির দিকে যায় না। চুপচাপ বারের চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসে থাকে। বিরাট গোগো চশমার রঙিন কাঁচে মুখের অর্ধেক ঢাকা। এমন কিছু আহা-মরি নয় সে মুখ কিন্তু শরীরের

দিকে তাকালে বুকের ভেতরটায় কি যেন গড়িয়ে গড়িয়ে যায়। তারপর, সারাদিনে দুবার ওকে চেয়ার ছেড়ে বুকিদের কাউন্টারে উঠে যেতে দেখেছে সুজয়। একবার বললে ভুল হবে, দুবার মেয়েটি চেয়ার ছাড়ে। দ্বিতীয়বার ও যায় টাকা আনতে। টাকার বান্ডিলটা প্রায় না গুনে সাপের চামড়ার বাহারী ব্যাগটায় পুরে কোনো দিকে না তাকিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যায় তৎক্ষণাৎ। তারপরের রেসগুলোর জন্যে বসে থাকে না। একটাই রেস খেলতে আসে ও, খেলে, জেতে এবং চলে যায়। এই গ্রান্ড এনক্লোজারে ওর চেয়ে সুন্দর বা অসুন্দর বিচিত্র পোশাকের অনেক মেয়ে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে যাদের সঙ্গে এক বা একাধিক সঙ্গীকে দেখা যাবেই—কিন্তু এর সঙ্গে কাউকে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না সুজয়। অতএব রেসে কেউ কেউ জেতে। চুপচাপ জিতে চলে যায়। আজ তাই কোনো রকম প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে আসে নি সুজয়। এমন কি ঘোড়ার নামগুলো অবধি আগে থেকে ও দ্যাখে নি। আজ ওকে জিততেই হবে। সতর্ক চোখে মেয়েটিকে খুঁজতে লাগল ও। টাকার দরকার, ভীষণ টাকার দরকার।

একটু একটু করে লোক জমছে। বুকিদের কাউন্টারের সামনে ছোট ছোট জটলা। বেশ একটা উৎসবের মেজাজ এখন। বিকেলে এটা হয়ে যাবে শ্মশানের মতো। অজস্র বাতিল টিকিটে ছেয়ে যাবে মাঠ। মানুষের হাড়ের মতো। শুধু বুকিরা দাঁত বের করে হাসবে। তবু লোকে টাকা নিয়ে ঢুকছে মাঠে। টাকায় টাকা আনে।

প্যাডকের দিকে তাকাল ও। সহিসরা এক একটা নম্বর দেওয়া ঘোড়ার লাগাম ধরে প্যাডকে ঘুরছে। দৌড় শুরু হবার আগে দেখিয়ে দেওয়া হয় ঘোড়াগুলোকে। জহুরী যে সে ঠিক চিনে নেবে কোন্ ঘোড়াটা ফিট্। হুমড়ি খেয়ে দেখছে সবাই। সুজয় প্যাডকে গেল না আজ। ঘোড়া দেখে কিছু বোঝে না ও।

বারের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো সুজয়। মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে। এবার ঘোড়াগুলো স্টার্টিং পয়েন্টে যাবে। কেতাদুরস্ত নিয়মকানুন। রাজার খেলা। বুকিদের কাউন্টারে উত্তাপ বাড়ছে। টোটে এক নম্বর ফেবারিট। বোর্ডে কাঁটা প্রায় ইভন মানি ছাড়িয়ে গেছে। অথচ বুকিদের কাউন্টারে দু নম্বর হট ফেবারিট। দশ টাকায় ন' টাকা প্লাস ট্যাক্স। মরিয়া হয়ে লোকে মারামারি করে একশ হাজার লাগাচ্ছে। ক্রমশ বোর্ডে দু নম্বর ফেবারিট হয়ে গেল। নিশ্চয়ই টালা টু টালিগঞ্জ খবর হয়ে গিয়েছে ঘোড়াটার মৃত্যু নেই। জকি-ওনার-ট্রেনার অল কনসার্ন লাগাই হচ্ছে নিশ্চয়ই। একজন সিনেমা স্টারকে নিতম্ব দুলিয়ে চলে যেতে দেখল সুজয়। কিন্তু না, সেই মেয়েটি কোথাও নেই। মেইন গেট দিয়ে জনস্রোতের মতো যারা ঢুকছে তাদের মধ্যেও মেয়েটিকে পেল না ও। এখনও এলো না কেন? পকেট থেকে রুমালটা বের করে কপালের ঘাম মুছল সুজয়। একটা কুইনেলা খেললে কেমন হয়। দশ টাকা মাত্র রিস্ক। এক-দুই। এ দুটোর মধ্যেই রেস। কিন্তু না নিজেকে সতর্ক করল ও, আজ আর হারতে আস নি তুমি। মেয়েটাকে দেখার আগে কোনো রিস্ক নয়। এই রকম ভেবে নিয়ে

না খেলে বেশ হালকা লাগল ওর। তিন বছরে এই প্রথম ও মাঠে আছে এবং একটা রেস হতে যাচ্ছে অথচ ও টাকা লাগাচ্ছে না। আঃ।

সারা মাঠ জুড়ে চিৎকার, প্রথম বাজি শুরু হয়েছে। যে যার পছন্দমতো ঘোড়ার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে। ঘোড়াগুলো এখন বাঁক নিচ্ছে। জকিরা টান-টান। এখনও প্রায় দশ গজ দূরে ওরা। দু নম্বর ঘোড়ার নাম শুনতে পেল সুজয়। মাইকে রিলে হচ্ছে। একটা হেঁড়ে গলা চেঁচিয়ে উঠল, মাই ফরচুন ইন এ ও-য়া-ক্। কিন্তু হঠাৎ সব স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? ঘোড়াগুলো প্রায় এসে গিয়েছে। মাইক স্তব্ধ। গোড়ালি উঁচু করে সুজয় দেখলে একটা ঘোড়া সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তেজনায় জকি প্রায় শুয়ে পড়েছে ঘোড়ার ওপর। আশ্চর্য, কেউ ঘোড়াটার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে না। উল্লাস নেই কোথাও। সমর্থন ছাড়াই ঘোড়াটা জিতে গেল। আট নম্বর ঘোড়া। বই খুলে ঘোড়াটার নাম দেখতে গিয়ে চমকে উঠল সুজয়। পাউসিকি, থার্টি টু ওয়ান বোর্ডে। কে যেন বলল, চুরি—এ নির্ঘাৎ চুরি। শালা বি ক্লাসের বাজি খেলাই মুশকিল। কানু মিত্তিরের কথা মনে পড়ে গেল ওর। পাউসিকিও বাজি জেতে—রেসে কি না হয় কানুদা। তুমি দেখলে না।

এখন একটা আলস্য চারধারে। কেমন একটা থিতিয়ে যাওয়া ভাব। যে যার হেরে যাওয়া টিকিট কার্ড দুমড়ে মুচড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে মাঠে। এক একটা দশ-টাকা একশ-টাকার কাগজ সব। হঠাৎ বাতিল হয়ে গেছে যেন। ঘোড়া জিতলে এর মূল্য হয়ে যেত অনেক গুণ। এই মুহূর্তেই দাম কেমন পাল্টে যায়।

আবার বারের কাছে ফিরে এলো ও। না, এখনও সেই মেয়েটি আসে নি। পাড়ার এক বয়স্কজন সুজয়কে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। রেসের মাঠে কেউ সহজে ধরা দিতে চায় না।

পায়চারি করতে করতে গ্যালারির দিকে এলো সুজয়। ঠাসবোনা সোয়েটারের মতো গ্যালারি। কিন্তু মেয়েটা কোথাও নেই। ও অবশ্য গ্যালারিতে আসে না—তবু। তা হলে কি আজ আসবে না? নাকি অসুখ বিসুখ হলো কিছু। ভাবাই যায় না। একটা মেয়ে, একদম চকচকে তরতাজা একটা মেয়ের অসুখ করেছে, বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে ভাবাই যায় না। সুজয়ের ধারণা সুন্দরী মেয়েদের অসুখ কম করে, করেই না বলা যায়। আর যদি একবার করে তবে তাকে ফিরে পাওয়া বড় মুশকিল।

একটা বুড়ো নিগ্রোর ওপর চোখ পড়ল। সাদা গ্যালারির নিচের দিকে বসে ঝকঝকে দাঁতে হাসছে। নিগ্রোটার কোল ঘেঁষে একটা ফিরিঙ্গী যুবতী যার পরনে মিনি-স্কার্ট আর নাইলনের স্লিভলেশ আঁটো গেঞ্জি ঝুঁকে পড়ে রেস-বুকে আঙুল দিয়ে কি যেন দেখাচ্ছে। বয়স হলেও নিগ্রোটি খুব স্মার্ট, সাদা ধবধবে কোঁকড়া চুলগুলো অলঙ্কারের মতো। পকেট থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করে আকাশের দিকে মুখ করে চুমু খেল। সুজয় দেখল মেয়েটা হেসে টাকাটা নিয়ে তরতর করে গ্যালারি থেকে নেমে প্যাসেজ দিয়ে বুকিদের কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গোয়েন্দার মতো পা চালাল সুজয়। নিশ্চয়

কোনো খবর পেয়েছে মেয়েটা। এইসব বিলাসিনীদের ঘরে জকিদের টাউটরা যাওয়া আসা করে। মেয়েটির পেছন পেছন সুজয় চলে এলো। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়েটি টোট কাউন্টার বা বুকিদের কাছে না গিয়ে একটু ঘুরে প্যাডকের পাশে বড় গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। সুজয় দেখল একটা এ্যাংলো ছোকরা এগিয়ে এলো চোরের মতো মেয়েটির কাছে।

'হুইচ ওয়ান য়ু টোল্ড ? নাম্বার টেন ?'

সুরেলা গলায় মেয়েটি জবাব দিল, 'ইয়েস।'

'গুড।' প্রফুল্ল মুখে পকেট থেকে একটা বেটিং কার্ড বের করে কি লিখল ছেলেটি। নাউ শো হিম দি কার্ড। টেন টু ওয়ান প্রাইজ।'

সুজয়ের মনে হলো মেয়েটি দারুণরকম নার্ভাস হয়ে পড়েছে। কার্ডটা হাতে নিয়ে বলল, 'বাট ডার্লিং।'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে দাঁত বার করে বলল ছেলেটি, 'ওঃ বি স্টেডি, উই মাস্ট টেক দি চান্স।'

একটা জাল বেটিং কার্ড নিয়ে ফিরে যেতে দেখল মেয়েটাকে ও। ভীষণ অবাক হয়ে গেল সুজয়। বুড়ো নিগ্রোটার জন্যে কেমন দুঃখ হলো ওর। আচ্ছা দশ নম্বর এই বাজিতে যদি জিতে যায় তাহলে মেয়েটি কি করবে। নিগ্রোটা নিশ্চয়ই টাকা আনতে বলবে ওকে। কিন্তু তা হলো না, দ্বিতীয় বাজিতে দশ নম্বরকে খুঁজেই পেল না সুজয়। জিতল হট ফেবারিট চার নম্বর।

উই মাস্ট টেক দি চান্স। সবাই চান্স নিচ্ছে। হয় হেড নয় টেল। চান্স না নিলে বেঁচে থাকাই যায় না। হয় তোমার পকেটের একশ টাকা খতম নয় টেন টু ওয়ানে হাজার, হাজার থেকে লক্ষ, তারপর অনেক লক্ষ চেকগুলো পকেটে পুরে যখন তুমি বাইরে পা রাখবে তখন খিদিরপুর রোডে দশ ইঞ্চি পুরু গালচে বিছানো, লন্ডন প্যারিসে কোলকাতার খুশী ঘরগুলোর মালিক তোমাকে বো করছে—উই আর এ্যাট ইওর সার্ভিস স্যার।

বারের টেবিলে ফিরে এলো সুজয়। গমগম করছে বার। তিল ধারণের জায়গা নেই কোথাও। একটা চেয়ার খালি হতেই সুড়ুৎ করে সুজয় বসে পড়ল। তিনটে পার্শি বুড়ি বসে গুলতানি করছে টেবিলে। সুজয়ের ডান দিকে একটা মাদ্রাজী বুড়ো, চোখ মুখ গলায় বয়স বাচ্চা ছেলের সিকনির মতো ঝুলে আছে। চোখের পাতা সাদা হয় এই প্রথম দেখল সে। ওকে দেখে খুকখুক করে কাশল বুড়োটা। তারপর দক্ষিণী সুরে ইংরেজি বলল, 'লস অর গেইন ?'

সুজয় ঘাড় নাড়ল। কি বুঝল কে জানে, ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'আই অ্যাম ফিনিশড। বেইট ফাইভ হান্ড্রেড—নো ডিভিডেন্ড'। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের থুতু মুছল লোকটা, 'ইউ উইল নেভার উইন।'

মুখ ঘুরিয়ে নিল সুজয়। শালা ঘাটের মড়া আর দিব্যজ্ঞান ছড়াবার জায়গা পেলে না।

ঠিক সেই সময় সুজয়ের বুক টইটুম্বুর হয়ে গেল। বুকিদের কাউন্টারের পাশ দিয়ে একটা স্বপ্নের মতো মেয়ে আসছে। প্রথমটায় একটু ধন্দ লেগেছিল

সুজয়ের। না, আজ বেলবটম বা স্কার্ট পরে নি ও। হালকা ঘিয়ে রঙা একটা শাড়ি লতানো গাছের মতো ওর শরীর আঁকড়ে আছে। মেয়েটি ক্রমশ সামনে এগিয়ে এলো। যেন চোখ আড়াল করা সমুদ্র তার অনেক ঢেউ নিয়ে দুলছে। সুজয়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে বারের মধ্যিখানে দাঁড়াল সে। একটা মিষ্টি ঝিমঝিমে গন্ধ নাকে এলো সুজয়ের। বারের সবাই দেখছে মেয়েটাকে। অনেকের চোখ চকচক করছে এখন। সুজয় হঠাৎ উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটি ঘুরে ওর দিকে তাকাল। সুজয়ের মনে হলো ওর পায়ের পাতা সিরসির করছে, 'প্লিজ বি সিটেড।'

মেয়েটি আলতো পায়ে এগিয়ে এলো, যেন এই চেয়ারটা ওর জন্যেই ছিল এমন ভঙ্গী। টেবিলের ওপর সুদৃশ্য সাপের চামড়ার ব্যাগটা রাখতেই মাদ্রাজী বুড়ো নাক কোঁচকাল একবার। বোধ হয় ঝিমঝিমে গন্ধ সহ্য হয় না বুড়োর। চেয়ারের পাশ থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে উঠে পড়ল বুড়ো। যাবার সময় সুজয়কে খসখসে গলায় বলে গেল, 'প্লিজ বি সিটেড।'

পারলে একটা চুমু খেয়ে ফেলত সুজয় মাদ্রাজীটাকে, কিন্তু ও মুখ চোখ স্বাভাবিক করে বসে পড়ল। আর তখনই সেই ঠান্ডা বরফের মতো একটা ধারালো গন্ধ ওর সমস্ত সত্তায় ছড়িয়ে পড়ল। সুজয় দেখল মেয়েটি সামান্য মুখ তুলে বারের দেওয়ালে রাখা টেলিভিসন সেট দেখছে। কয়েকটা ঘোড়াকে পর্দায় দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটি বসেছে ঈষৎ ঝুঁকে। সুজয় মেয়েটির খোলা পেটের দিকে চোখ রাখল। অনেকখানি, একটা মুখ চেপে ধরলেও অনেকখানি জায়গা পড়ে থাকবে এমনি এমনি। পালিশ করা চামড়ায় কি মোলায়েম ভাব ছড়ানো। কিন্তু একটা দুটো মৃদু ঢেউ ছাড়া সেখানে কোনো আলোড়ন নেই। বুকের দিকে তাকিয়ে একটু থতমত হয়ে গেল সুজয়। এরকম গলাঢাকা ব্লাউজ আজকাল কেউ পরে!

মেয়েটি সাপের চামড়ার মুখ খুললো। একটা ছোট্ট ডায়েরীর পাতায় কি দেখল। নিশ্চয়ই ঘোড়ার নাম। সেই বিশেষ ঘোড়াটি যে হারবে না। সুজয়ের ইচ্ছে হলো ডায়েরীটা কেড়ে নেয়—নামটা দ্যাখো। মেয়েটা ঘুরে সুজয়ের দিকে তাকাতেই ও হেসে ফেলল। সেই পরিষ্কার মাপা হাসি, 'য়্যু আর লেট টুডে।'

মেয়েটার ঠোঁটের কোণে একটু ভাঁজ পড়ল, বিরক্তির? তারপর খুব পরিষ্কার এবং প্রতিটি শব্দ যেন বাস্কেটবল খেলছে এমন ভঙ্গিমায় উচ্চারণ করল, আপনি আমাকে চেনেন?'

গলার কাছে কি একটা হয়ে গেল যেন, সুজয় কথা না বলে ঘাড় নাড়ল। মেয়েটি বাঙালী! আশ্চর্য! অথচ অ্যাংলো সিন্ধী, গুজরাটী যা কিছু ভাবা যায় মেয়েটিকে। তারপর বলল, 'আজ আপনার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি।'

'কারণ? আপনাকে তো আমি চিনি না।' কৌতুক না কৌতুহল বোঝা গেল না।

'আমিও না। তবে—কিছু খাবেন?' সুজয় এখন প্রস্তুত।

'না।' ঘাড় ঘুরিয়ে বলল মেয়েটি। তারপর বুকিদের কাউন্টারের ওপর চোখ রাখল। হঠাৎ বাইরে প্রচন্ড চিৎকার, বুকিদের ছোটাছুটি। বারের কিছু লোক দৌড়ে গ্যালারির দিকে চলে গেল। আর একটা রেস হচ্ছে। কে জিতল উদ্‌গ্রীব

হলো সুজয়। কিন্তু মেয়েটি নির্লিপ্ত যেন তেতলা বাড়ির জানলা থেকে রাস্তা দেখছে।
'মাফ করবেন, রেসের মাঠে বসে আমি কারো সঙ্গে কথা বলি না।' মেয়েটি মুখ ঘোরাল।
'জানি, সব জানি।' সুজয় হাসল।
তৃতীয় রেস শেষ হয়েছে। সুজয় দেখল একটা ছেলে খুব চেঁচাচ্ছে। জিতেছে বোধহয়! জিতলেই পায়ের তলায় মাটি শক্ত হয়।
খুব অবাক মেয়েটি এমন ভঙ্গী, 'তবে ?'
'ইচ্ছে হলো। এক একটা ইচ্ছে হয় যার কোনো মানে থাকে না। কিন্তু ইচ্ছে হলে ভালো লাগে, তাই।' কথাটা বলে সুজয় ডায়েরীর দিকে তাকাল।
মেয়েটি হাসল, 'আপনার কথা শুনে আমার ভালো লাগছে। কিন্তু এখানে আমার ওপর অনেক নজর আছে। বুঝলেন ?'
নজর আছে? ঠিক বুঝল না সুজয়। ওর ইচ্ছে হলো মেয়েটির দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে বাঁচান, আমি আজ হারতে চাই না।
সুজয় বলল, আজ নিজে খেলবেন না ?'
মেয়েটি হাসল। চোখ বন্ধ করে কি ভাবল। তারপর ডায়েরীর পাতাটা সমান করে ধরল। সুজয় দেখল সেখানে নম্বর লেখা। সাদামাটা তিন। প্রায় ছিটকে পড়ল সুজয়। আঃ। তিন নম্বর। চোখের সামনে অনেক টাকা উড়ে যেতে দেখল ও। কত দর থাকবে তিন নম্বরের ?
মেয়েটি কি একটা বলল। সুজয় আর অপেক্ষা করতে পারছে না। প্রায় দৌড়ে নেমে এলো ও বুকিদের কাউন্টারে।
তিন নম্বর ঘোড়ার সবচেয়ে বেশী দর সিক্স-টু-ওয়ান। আপসেটই বলা যায়। দর, আরো বাড়বে। ছয় নম্বর হট ফেবারিট। খুব খাচ্ছে বুকিরা। ওপেন বোর্ডে তিন নম্বর সেভেন টু ওয়ান। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল সুজয়। পকেটের একশ টাকা এখন ওর হাতের মুঠোয়। ঘাম জমছে হাতে। হঠাৎ চমকে উঠল ও। একটা বুকি তিন নম্বরকে ফাইভ টু ওয়ান করে দিল। প্রায় পড়িমড়ি করে সিক্স-টু-ওয়ানে পুরো টাকা লাগিয়ে দিল ও। আশী টাকা প্লাস ট্যাক্স। জিতলে পাঁচশো ষাট। ভীষণ আফসোসে মাথা ঝাঁকাল ও। আজ যদি পকেটে হাজার টাকা থাকত ছ হাজার কে আটকায়।
বেটিং কার্ডটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাঠেই আলাপ। ভালো ক্যালকুশেন করেন। সুজয় একগাল হেসে বলল, 'তিন নম্বর খেলুন।'
উৎসুক গলায় ভদ্রলোক বললেন, তিন নম্বর কোন্ ঘোড়া।'
সুজয়ের এতক্ষণে মনে পড়ল তিন নম্বরের নামটাই সে জানে না। ওকে বই খুলতে দেখে ভদ্রলোক হেসে ফেললেন, 'কি মশাই, ঘোড়ার নামই জানেন না অথচ খেলতে বলছেন, বাঃ।' চলে গেলেন ভদ্রলোক। সুজয় নামটা পড়ল 'লাকি স্টার', ওজন সাতান্ন, জকি ইভান্স। ওর ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে ভদ্রলোককে

ডাকে। ডেকে কার্ডটা দেখিয়ে বলে এই দেখুন মশাই আমি খেলেছি—আপনাকে ব্লাফ দিইনি।

গ্যালারির একটা ভালো জায়গা দেখে বসল সুজয়। এখান থেকে পুরো মাঠটা দেখা যায়। ও ভালো সাইজের মাঠ। প্রচুর লোক হয়েছে আজ। জ্যাকপটের প্রথম লেগ। সারা মাঠ জুড়ে উত্তেজনা। ঘোড়াগুলো যাচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে। ঐ যে তিন নম্বর যাচ্ছে। দুধের মতো সাদা। এটা আট ফার্লং-এর রেস। ওপেন বোর্ডের দিকে তাকাল সুজয়। তিন নম্বরের কাঁটা নেমে এসেছে টেন-টু-ওয়ানে। বুকের মধ্যে হাঁপ ধরল সুজয়ের। নন্ ট্রাই 'নাকি ঘোড়াটা। কিন্তু অসম্ভব—এ ঘোড়া জিতবেই। মেয়েটিকে কখনো হারতে দ্যাখে নি সে। তারপরই হঠাৎ মনে হলো ব্যাপারটা। মেয়েটা ওকে তিন নম্বর বলেছে, সেটা তো এই রেসে নাও হতে পারে। এর পরের বাজির তিন নম্বর যদি হয়। মেয়েটি যেন কি বলছিল ওকে। কেমন ঠান্ডা একটা স্রোত ওর সারা শরীরে ভেসে বেড়াতে লাগল। শেষ সম্বল একশ টাকা। হতেই 'পারে না। মেয়েটি এই তিন নম্বরই বলেছে। নিজেকে বোঝাল ও। এই তিন নম্বরই।

বাঁ দিকে যে ভদ্রলোক বসে আছে তার মুখ দেখে চমকে গেল সে। লোকটার ছবি প্রায়ই কাগজে বের হয়। প্রচুর বড়লোক। স্যুটটা কি বিলেতের তৈরি? টাই পিনটা আলবত হীরের। ভদ্রলোকের হাতে ধরা কার্ডটার দিকে তাকাল ও। ইভ্‌ন মানিতে পাঁচ হাজার লাগিয়েছেন ছয় নম্বর ঘোড়ায়। ডাবল ফাইভ ফাইভের প্যাকেটের সঙ্গে আলতো ভঙ্গিতে ধরে রেখেছেন ভাবী দশ হাজারের প্রতিশ্রুতিপত্র। সুজয় হাসল, গেল তোমার টাকা। তিন নম্বর মাস্ট উইন।

রেস শুরু হলো। মাইকে রিলে হচ্ছে। এক নম্বর লিড করছে। ছয় নম্বর খুব ভালো সেকেন্ড পজিশনে আছে। তিন নম্বরের নাম শুনতে পেল না সুজয়। উত্তেজনায় সমস্ত মাঠ দাঁড়িয়ে। কে যেন চেঁচাল—নাম্বার সিক্স ইন এ ওয়াক। শালা। সুজয়ের মেরুদণ্ড টনটন করছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না ও। বাঁক ঘুরল ঘোড়াগুলো। ছয় নম্বর এগিয়ে আসছে মেজাজে। পাশের ভদ্রলোক ডাবল ফাইভ ফাইভ ধরালেন। জ্যাকপটের প্রথম লেগের ফেবারিট ঘোড়ার কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না। সুজয় দেখল একদম পেছন থেকে একটা কালো তীর সাঁ করে বেরিয়ে আসছে। আউট সাইট দিয়ে বিদ্যুতগতিতে সে ছয় নম্বরকে ছুঁয়ে ফেলল। সমস্ত মাঠ বোবা হয়ে গেল। পাশের ভদ্রলোক বললেন, 'অ্যানাদার আপসেট।' সুজয়ের শরীর থরথর করে কাঁপছে, সাত নম্বর ঘোড়া জিতে গেল।

মুহূর্তেই একটা সামুদ্রিক গর্জন শুরু হয়ে গেল মাঠে। কী ভীষণ ক্লান্তিতে সুজয় বসে পড়েছিল বেঞ্চিতে, এখন দেখল সমস্ত মাঠ আহত পশুর মতো চিৎকার করছে। শালা চুরি—চুরি ছাড়া আর কিছু নয়। যে ঘোড়া আজ অবধি প্লেসে আসে নি সে জেতে কি করে। মানিনা, সাত নম্বরকে জেতানো চলবে না। মেম্বার এনক্লোজারের ওপর ঢিল পড়ছে। সমস্ত মাঠ জুড়ে অস্থিরতা।

সেকেন্ড আর গ্রান্ড এনক্লোজার এক হয়ে গেল। কেউ কোনো বাধা মানছে না। সুজয় দেখল পুলিস এসে গেল ঢাল নিয়ে। তাড়া করছে পুলিস। একদল লোক রেসিং ট্র্যাকের ওপর শুয়ে পড়ল। আর রেস হতে দেবে না। মাইকে শান্ত করার চেষ্টা চলছে। বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত। প্রচুর টিকিট হাওয়ায় উড়ছে। কোথাও ফায়ারিং-এর শব্দ হলো—নাকি টিয়ার গ্যাস ? মেয়েরা ভয়ে কাদা। হামলা হচ্ছে স্টুয়ার্টদের ওপর। ওরাই সিদ্ধান্ত নেবার মালিক। বাতাসে চোখ জ্বালা করছে। সুজয় শুনল পাশের ভদ্রলোক বিড়বিড় করে বললেন, 'যাক এ্যাদ্দিনে রাজার খেলা জনতার হয়ে গেল।' ভীষণ বিরক্তিতে হাতের কার্ড মুচড়ে ফেলে দিয়ে নেমে গেলেন ভদ্রলোক।

হুড়মুড় করে মানুষজন ছুটছে গেটের দিকে। পালাচ্ছে সবাই। কয়েকটি উৎসাহী ছেলে বাঁশ নিয়ে তাড়া করছে বুকে ব্যাজ ঝোলানো মেম্বারদের। এক-জন চেঁচিয়ে বক্তৃতা করছে আমাদের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না, চলবে না। শেষ পর্যন্ত পুলিস অ্যারেস্ট আরম্ভ করল। ক্ষেপে গেল জনতা।

নির্লিপ্তের মতো বসে বসে দেখল সুজয়। চোখ বন্ধ করে মেয়েটার মুখটা মনে করতে চাইল। তুমি আমাকে জয়ের খবর দিলে মেয়ে—এ—আমি কি জিতলাম! শেষ সম্বল একশ টাকা—সুজয়ের ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে।

এমন সময় মাইকে ঘোষণা হলো, 'স্টুয়ার্টরা ভীষণ দুঃখের সঙ্গে মাঠের বর্তমান পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আজকের মতো রেস ক্যানসেল করে দিচ্ছেন।'

কোথায় কি। চীৎকার সমানে চলেছে। কাঠের গ্যালারির এক পাশে ধোঁয়া বের হচ্ছে। আগুন লাগল বুঝি। জনতা চেঁচাচ্ছে—শুধু আজকের রেস নয়, ওই হয়ে যাওয়া রেস, ক্যানসেল করতে হবে। হবে হবে হবে।

আবার কিছুক্ষণ কোলাহল। তারপর শেষ পর্যন্ত মাইকে ঘোষণা হলো, সব-রকম দিক বিচার করে রেস ক্যানসেল করে দেওয়া হচ্ছে। যারা যে টিকিট ওই রেসে কেটেছেন, লাইনে দাঁড়ান টিকিট বা কার্ড দেখিয়ে দাম ফেরত নিয়ে নিন।

মুহূর্তে একটা উল্লাস—খুশীর একটা ঢেউ গড়িয়ে গেল মাঠে। সুজয়ের হঠাৎ মনে হলো তার একশ টাকা যায় নি—এটা সে ফেরত পাবে। ভাগ্যিস কার্ডটা সে ফেলে দেয় নি। সুজয়ের চোখে পড়ল সারা মাঠ জুড়ে মানুষ উবু হয়ে বসে ফেলে দেওয়া এই রেসের টিকিট খুঁজছে। যারা হেরে গিয়েছে ভেবে টিকিট ফেলে দিয়েছিল তারা পাগলের মতো মাঠ হাতড়াচ্ছে। সুজয়ের চোখে পড়ল পাশের ভদ্রলোকের ফেলে দেওয়া কার্ডখানা। ভিখিরীর মতো ছোঁ মেরে তুলে নিল সে। হাত দিয়ে কোঁচকানো কার্ডটা সমান করল। পাঁচ হাজার। সুজয়ের মাথা ঘুরতে লাগল। কাউন্টারে এটা দেখালেই সে পাঁচ হাজার পেয়ে যাবে। আর একটা একশ টাকার টিকিট পেল সুজয়। ক্রমশ সুজয় মাঠের হাজার হাজার মানুষের মতো হাঁটু গেড়ে ধুলো ঘেঁটে বাতিল টিকিট খুঁজতে শুরু করে দিল। কলকাতার মাটিতে কত টাকা—খুঁজে নিলেই হলো। ওই তো একটা দশ টাকার টিকিট। বাঃ। সুজয় দেখল তার পাশে বসা ভদ্রলোক উবু হয়ে

কার্ড খুঁজতে খুঁজতে ওপরে আসছেন। সরে এলো সে। সরতেই মাথা ঠোকা-ঠুকি হয়ে গেল একটা ছোকরার সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে একটা থাপ্পড় কষালো সুজয়। রেস মাঠের নোংরা পরিষ্কার করা ছেলের দলের একটা।
হাত দিয়ে অনুভব করছিল সুজয় পকেটের ওজন বাড়ছে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে দেখতে মাথা দোলাল। হাজার হাজার কোট টাই ধুতি শাড়ি মাটিতে গড়াগড়ি করে ছুটে বেড়াচ্ছে। মানুষ বলে মনে হচ্ছে না কাউকেই। হাত প্রসারিত, পিঠ আকাশের দিকে ধনুকের মতো বাঁকানো। কেমন একটা ঘোঁতঘোঁত শব্দ হচ্ছে। মেরুদণ্ড কি সহজে গোল হয়ে গেছে সবার। শুয়োরের মতো দেখতে লাগছে আচমকা। কিন্তু তবু সুজয়ের মনে হলো, মেরুদণ্ডের এমন চমৎকার খেলা আর কেউ খেলতে পারে না।

সম্পর্ক

টেলিফোনটা বাজতেই ঘুম ভাঙল সুধাময়ের। অমলা ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, 'জ্বালালো। ছুটির দিনে ঘুমুবো তার উপায় নেই। ধরো না।'

শীতটা এবার জব্বর পড়েছে। কম্বল ছেড়ে বেরুতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু এই আবছা অন্ধকারে যন্ত্রটার শব্দ ক্রমশ কর্কশ হচ্ছে। উঠে বসে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলল সুধাময়।

'হ্যালো স্যার, হ্যালো, আমি জু থেকে বলছি।'

'কে বলছ ?'

'আমি জনার্দন স্যার। একটু আগে ভোরের রাউণ্ডে বেরিয়ে দেখতে পেলাম শিম্পাঞ্জির বাচ্চাটা বাইরে পড়ে আছে, রক্ত বের হচ্ছে।'

'শিম্পাঞ্জির বাচ্চা ?' সুধাময় চিন্তিত হলো, 'কোন্ বাচ্চাটা ?'

'যেটা গতকাল জন্মেছিল।'

'মরে গেছে ?'

'না স্যার, তবে মরে যাবে মনে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে। ডাক্তার মিত্রকে খবর দাও। আমি যাচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে তড়াক করে নিচে নামতেই অমলা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল! কার ফোন ?'

'একটা শিম্পাঞ্জি অল্প বয়সে মা হয়েছিল কাল। বাচ্চাটাকে উণ্ডেড অবস্থায় পাওয়া গেছে। আমি যাচ্ছি।'

'উফ। পারো বটে।' অমলা পাশ ফিরে শুলো।

সুধাময় পাশের ঘরে এলো। নিনি আর টিনি আরামসে ঘুমুচ্ছে। ছয় আর চার বছরের দুটো বাচ্চা ঘুমন্ত অবস্থায় পরস্পরকে জড়িয়েধরেছে। ওদের শোওয়ার ব্যবস্থা আলাদা। অমলাই এটা করেছে। সরে যাওয়া কম্বল ঠিক করে দিয়ে সুধাময় দ্রুত তৈরী হয়ে নিল। একটু চা পেলে হতো। এই ভোরে চা না খেয়ে বেরুনো—! তারপরই চিন্তাটাকে বাদ দিল সে। দেরী করা ঠিক নয়। শিম্পাঞ্জির বাচ্চাটাকে নিয়ে তারা চিন্তিত ছিল। ডাক্তার মিত্র বলেছিলেন, 'এতো অল্প বয়সে প্রেগনেন্সি ভাল নয়।' কিন্তু ভালোয় ভালোয় বাচ্চাটা তো হয়েছিল। আবার কি ঝঞ্ঝাট বাধল কে জানে ? তার এই চিড়িয়াখানায় আজ অবধি কোনো শিশু মারা যায়নি।

নিচে নেমে বকুলকে ডাকতে হলো না তিন বার। বাচ্চা মেয়েটা চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসতেই অস্বস্তি হল সুধাময়ের, 'কি রে তোর গরম জামা নেই ?'

'কেচেছিলাম, শুকোয়নি।'

দরজাটা বন্ধ করতে বলে গাড়ি বের করল সুধাময়। অমলার উচিত ছিল ওকে আর একটা চাদর-ফাদর দেওয়া। মাঝে মাঝে এমন ময়লা জামা পরে থাকে যে মেজাজ গরম হয়ে যায় সুধাময়ের। কিন্তু ইদানীং, প্রশ্ন করা ছেড়েই দিয়েছিল। কারণ উত্তরটা অমলার দিকেই ফিরে যায়। আজ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বলে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। সুধাময় ঠিক করেছে সাংসারিক শাসনব্যবস্থায় সে নাক গলাবে না। ওটা অমলার অধিকারেই থাকুক।

রাস্তায় আলো নেই। আবার সূর্য ওঠার সময়ও হয়নি। পাতলা অন্ধকারে গাড়ি চালিয়ে চিড়িয়াখানায় চলে এলো সুধাময়। তার পর সোজা হাজির হলো শিম্পাঞ্জিদের খাঁচার সামনে। সেখানে দুজন নাইটগার্ড আর ডাক্তার মিত্র ঝুঁকে দেখছেন। ওকে দেখে নাইট গার্ড ডাক্তারকে জানাতেই ডাক্তার ওর দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'সুপ্রভাত। এরকম স্ট্রেঞ্জ কেস-এর আগে আমাকে ফেস করতে হয় নি।'

'কি ব্যাপার?' প্রশ্নটা করেই সুধাময় দেখতে গেল। রক্তাক্ত শিম্পাঞ্জিটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার হাত পায়ের আঙুল থেকে রক্ত বের হচ্ছে এখনও। মাত্র দুদিন বয়স বেচারার। এই শীতে কুঁকড়ে পড়ে আছে। বোধহয় কুঁই কুঁই করার শক্তিটুকু অবশিষ্ট নেই। সুধাময় বলল, 'কি করে এমন হল?'

ডাক্তার বলল, 'সম্ভবত ওর মা হাত পা কামড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে বাইরে। প্রসব যন্ত্রণার জন্যে বোধহয় বাচ্চাটাকে দায়ী করছে ওর মা।'

'ওর বাবাটা কিছু করেনি তো?'

'অসম্ভব নয়। তবে আমার ধারণা, মায়ের কাজ এটা। বেচারার বুকে দুধও জমেনি যে বাচ্চাটাকে খাওয়াবে। মাদারলি ফিলিংস তৈরি হয় নি এখনও। এটাকে বাঁচাতে হলে ইমিডিয়েটলি আমার ওখানে নিয়ে যাওয়া দরকার।' ডাক্তার একজন গার্ডকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সুধাময় হাত বাড়িয়ে ওটাকে তুলল। নরম কাদার ডেলা যেন। যদিও শরীরে উত্তাপ আছে কিন্তু নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ নেই।

একটা ইঞ্জেকশন দিলেন ডাক্তার। তারপর অ্যানাসথেসিয়া। সুধাময়ের চোখের সামনে একটা একটা করে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে স্টিচ্ করলেন মিত্র। তারপর নরম বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললেন, 'বুঝতে পারছি না এর মধ্যে ঠাণ্ডা বসে গেছে কি না। যদি তাই হয় তাহলে—।'

'ওষুধ-টষুধ দিন না।' সুধাময় ব্যগ্র গলায় বলল।

'যা দেবার দিয়েছি। মানুষের বাচ্চা হলে এতো সুযোগ পেতাম না। কিন্তু প্রব্লেম হলো ও যদি বেঁচে যায় তাহলে কি হবে?'

'কেন?'

'ওকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে না। আবার এই দশা হওয়া বিচিত্র নয়। ইনফ্যাক্ট জন্মাবার পর ওর পেটে কিছু পড়েছে কি না সন্দেহ। আবার ওকে যে-যত্নে ফিড করা দরকার তাতো আমার এখানে সম্ভব নয়। হার্ট বিট ঠিক আছে।' ডাক্তার নিজের মনে বলে যাচ্ছিলেন।

ডাক্তারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলে বাড়ি ফিরে এলো সুধাময়। অমলা তখনও

'বিছানা ছাড়েনি। বকুল দরজা খুলতেই নিনি ছুটে এলো, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে বাবা ? আমি ঘুম থেকে উঠে দেখতে পাইনি কেন ?'

'চিড়িয়াখানায় মা।'

'আমাকে ডাকনি কেন ?'

'বাইরে বড্ড ঠাণ্ডা। ভাই উঠেছে ?'

'উ-তে-ছে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে সুধাময় দেখল টিনি আপাদমস্তক গরমজামায় মুড়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ফরসা গালে বাচ্চাটাকে ঠিক পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। বকুলই ওদের সাজগোজ করিয়ে দেয়। সুধাময় সেই দূরত্বে হাঁটু মুড়ে বসল। তারপর আদুরে গলায় বলল, 'এটা কে লে ? আমার বাবা না ?'

সঙ্গে সঙ্গে গুটগুট করে ছুটে এল টিনি। এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলে। সুধাময় ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে ঘ্রাণ নিল। মোলায়েম মিষ্টি গন্ধ। সে আর এক হাত বাড়িয়ে নিনিকে কাছে টানল। তারপর বলল, জানো আজ একটা ঘটনা ঘটেছে ?'

নিনি আদরটা পেয়ে খুশি হল। বলল, 'কি ঘটনা ?'

'একটা বাচ্চা শিম্পাঞ্জি, এই এতটুকু, পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। ওর মা ওকে খেতে দেয়নি। খুব অসুখ বেচারার।'

'আমি ওকে খেতে দেব।' টিনি কচি গলায় জানাল।

সঙ্গে সঙ্গে বায়না ধরল নিনি, 'তুমি ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসো বাবা। আমরা খুব যত্ন করব দেখো, ওর অসুখ সেরে যাবে।'

'দাঁড়াও তোমাদের মায়ের সঙ্গে কথা বলি আগে।'

বকুলের হাতে ওদের ছেড়ে দিয়ে সুধাময় দেখল অমলা কাছে-পিঠে নেই। সে শোওয়ার ঘরের দরজা খুলে অমলার দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো। ঘুম ভাঙার পর আলস্যের মেজাজে রয়েছে সে, 'তোমার নতুন সন্তানকে দেখা হল ?'

ঠোঁট কামড়াল সুধাময়। অমলার এটা চলতি ঠাট্টা। চিড়িয়াখানা নিয়ে তার মাথাব্যথা কর্তব্যের সীমায় আটকে নেই আর সেটাতেই অমলার আপত্তি। অমলা সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। এখন আলস্য তার শরীরে এবং পোশাকে।

সুধাময় বিছানার পাশে টুল নিয়ে বসল, অদ্ভুত ব্যাপার অমলা। মা কখনও নবজাত সন্তানকে আঘাত করে এমন কথা শুনিনি। বিশেষ করে বনমানুষ-শ্রেণীতে।'

'টারজানের সঙ্গী একটা শিম্পাজি ছিল ?'

'হঠাৎ এই প্রশ্ন ?' হেসে ফেলল সুধাময়।

'শিম্পাঞ্জিকে দিয়ে কাজকর্ম করানো যায় ?'

সুধাময় উত্তর দিল না প্রথমে। একটু চুপ করে থেকে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলল, 'চেষ্টা করতে পার।'

ডাক্তার মিত্র বললেন, 'খুব ইমপ্রুভ করেছে বাচ্চাটা। কিন্তু আমার এখানে তো ওকে রাখা সম্ভব নয়। সময়মত ফিডিং বোতল মুখে ধরার লোক নেই। তাছাড়া

ঠিক ভালবাসা দিয়ে যত্ন না করলে— !'
সুধাময় জিজ্ঞাসা করল, 'ওর বিপদ কি কেটে গিয়েছে ?'
'হ্যাঁ। আঘাতজনিত বিপদ আর নেই।'
'ঠিক আছে, আজ বাড়ি ফেরার সময় নিয়ে যাব আপনার ওখান থেকে।'
'খুব ভালো হয়। আপনার বাচ্চাদের সঙ্গে ও বেশ খুশিতে থাকবে। তবে মনে রাখবেন ওদের বোধ এবং বুদ্ধি খুব শার্প। তাই মানুষের জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হবার আগেই ওকে ওদের জীবনে ফিরিয়ে দিতে হবে।'
ডাক্তার মিত্রের কথা মন দিয়ে শুনল সুধাময়। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে কুকুরের পোষ মানার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। বোধহয় ঘোড়া তারপরেই পড়ে। কিন্তু বনমানুষশ্রেণীর মধ্যে ওরাংওটাং আর শিম্পাঞ্জি অত্যন্ত দ্রুত মানুষের স্বভাব গ্রহণ করে। মাঝে মাঝে সেইটাই ওদের পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়ায়। সুধাময় তার চাকরিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পশুপাখিদের মানসিকতা ভালই জানে। কিন্তু আপাতত বাচ্চাটাকে চিড়িয়াখানার কোনো ঘরে আলাদা রাখা যায়। লোক দিয়ে তার পরিচর্যার ব্যবস্থা হয়তো করা সম্ভব কিন্তু তার কেবলই মনে হচ্ছিল ওকে বাড়িতে নিয়ে গেলে নিনি টিনি খুশি হবে এবং বাচ্চাটাও আনন্দে থাকবে। মানুষের সংস্পর্শে এসে ও নিশ্চয়ই অমানবিক হবে না।
সাদা নরম তোয়ালেতে শিম্পাঞ্জিটাকে জড়িয়ে গাড়িতে উঠল সুধাময়। চুপচাপ নেতিয়ে পড়ে আছে বেচারা। আঙুলগুলোয় এখনও ব্যান্ডেজ। গায়ে লোম ওঠেনি তেমন। পাশ ফিরে শুয়ে পিট পিট করে দেখছে। পাশের আসনে ওকে ভাল করে শুইয়ে দিয়ে ইঞ্জিন চালু করতে যে শব্দ হল তাতেই বাচ্চাটা মুখ ফেরাল। হেসে ফেলল সুধাময়, 'উঁহু কোনো ভয় নেই। চুপচাপ শুয়ে থাক। শিম্পাঞ্জিটা কিছুক্ষণ সুধাময়কে পর্যবেক্ষণ করল তারপর তার চোখ বন্ধ হল। বেচারা নির্ঘাৎ খুব কাহিল হয়ে পড়েছে।
আজ দরজায় অমলা। সেজেগুজে তৈরি, 'তোমার অফিসে ফোন করেছিলাম। শুনলাম— হোয়াটস্ দ্যাট ?' সুধাময়ের হাতের দিকে তাকিয়ে ঝটপট প্রতিক্রিয়া হলো তার। সুধাময় হাসল, 'বাচ্চারা কোথায় ? সেই প্রাণীটিকে নিয়ে এলাম। খুব শান্ত, দ্যাখো।'
তোয়ালে শুদ্ধ শিম্পাঞ্জিটাকে অমলার কাছে নিয়ে যেতেই সে মুখ বিকৃত করল, 'ইস, এ যে দেখছি ছাল ছাড়ানো। তুমি শেষ পর্যন্ত এটাকে বাড়িতে নিয়ে এলে? এ তো যে কোনো মুহূর্তেই মরে যেতে পারে।'
সুধাময় বলল, 'ডাক্তার মিত্র বলেছেন আর কোনো ভয় নেই।
অমলা জানাল, 'কিন্তু আমার পক্ষে ওর তদারকি করা সম্ভব নয়। দুটোকে নিয়ে আমি হিমসিম খাচ্ছি—তুমি কি বেরুবে ?'
'পাঁচ মিনিট দাঁড়াও। এটার একটা ব্যবস্থা করেই আমি যাচ্ছি।'
এইসময় নিনি এসে দরজায় দাঁড়িয়েই চিৎকার করে উঠল, 'ওটা কি বাবা ?'
'শিম্পাঞ্জির বাচ্চা।'
'সত্যি? দেখি দেখি, নিচে নামাও না।' ছুটে এলো নিনি, উত্তেজনা তার মুখে।

সুধাময় মাথা নাড়ল, 'উহুঁ, তোমার মায়ের দেরি হয়ে যাচ্ছে। চল, টিনির কটটায় ওকে শুইয়ে দিই, ওটা তো আর এখন ব্যবহার করা হয় না।' পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই ঝটপট শব্দ হলো। সুধাময় দেখল টিনি ছুটে যাচ্ছে। সে যে কাছে-পিঠেই ছিল সেটা বোঝা যায়নি। এখন তাদের এগিয়ে যেতে দেখে পড়ি কি মরি করে সেই বাতিল বেবিকটে উঠে শুয়ে পড়ল। যদিও তার শরীরের পক্ষে বেবিকটটা অনেক ছোট হয়ে গেছে। সুধাময়ের বেশ মজা লাগছিল। সে শিম্পাঞ্জিটাকে যথাসম্ভব ওপরে তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

টিনি গম্ভীর গলায় বলল, 'এটা আমাল কট্।'

'তাহলে এ শোবে কোথায় ?'

'ও কে ?'

'বাঃ, তখন বললাম না, একটা বনমানুষের বাচ্চার খুব অসুখ।'

'তুমি ওকে দেখালে, মাকে দেখালে, আমাকে দেখালে না কেন ?'

কচি গালদুটো ফুলে উঠল, অভিমান বড্ড প্রকট।

সুধাময় বলল, 'অন্যায় হয়ে গিয়েছে, আর হবে না। তুমি যদি না নামো তাহলে ওকে মাটিতে শোয়াতে হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে উঠে বসল টিনি, বলল, 'দেখি !'

সুধাময় নিচু করল হাত। দেখতে পেয়ে চিৎকার করল হাততালির সঙ্গে টিনি, 'এম্মা, আমাল চেয়েও ছোট, কি ভালো।'

বেবিকটে শুইয়ে দিতেই বাচ্চাটা পাশ ফিরল। তার চোখ খোলা এবং দৃষ্টি টিনির ওপর নিস্তব্ধ। নিনি জিজ্ঞাসা করল, 'এর নাম কি বাবা ?'

'নাম ?' সুধাময় থতমত হলো। তারপর বলল, 'তোমরাই একটা দাও না।'

নিনি বলল, 'আমি একটা ভেবেছি। বিনি। আমরা নিনি টিনি আর ও হলো বিনি। কিন্তু ওর টাইটেল কি হবে ?'

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল চাপল সুধাময়। এইসময় অমলার গলা পাওয়া গেল, 'যাদের টেল থাকে তাদের টাইটেলের দরকার হয় না। তোমরা বাচ্চাটাকে একদম জ্বালাবে না। যা করবার বকুলই করবে। তুমি পরে বকুলকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিও। এখন চল।'

টিনি বলল, 'মা, আমিও যাব।'

'নো। বড়দের সঙ্গে বাচ্চাদের সবসময় যেতে নেই। স্টে হোম। চল।' অমলা এগিয়ে গেলে সুধাময় টিনির গালে আঙুল বোলাল, 'উঁহু কান্না নয়। এই বিনিকে বড় করতে হবে। তাই ওর জন্যে জিনিসপত্র আনতে যাচ্ছি। ও কে ?'

বেরিয়ে যাওয়ার সময় সুধাময় লক্ষ্য করল বকুল ওপাশের ঘরে দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে। তার পা দুটো দেখা যাচ্ছে। সুধাময় দাঁড়াল, 'বকুল।' কালো মেয়েটা এগিয়ে এল।

সুধাময় বলল, 'ওই বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াতে পারবি ? টিনির ফিডিং বটল এখনও বাড়িতে আছে ?'

বকুল নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ আছে। খুশি হলো সুধাময়, 'বেশ, তুই দুধ

খুব পাতলা করে গুলে বোতলে ভরে ওর মুখে ধরবি। যদি খেতে চায় তো ভালো। নইলে আবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।'

নিনি বলল, 'ও কলা খাবে না ?'

সুধাময় মাথা নাড়ল, 'খাবে তবে আর কিছুদিন পরে।'

টিনি ঘোষণা করল, 'ও দুধ খাবে না। আমি খাই না, বকুল খাওয়ায়।'

বাচ্চাটা, যার নাম এখন বিনি এত দ্রুত শক্তি ফিরে পাবে কল্পনা করা যায়নি। এখন সে স্বচ্ছন্দে বেবিকট থেকে নিচে নামতে পারে। টাল-মাটাল পায়ে হাঁটাটাও কব্জা করে ফেলেছে এর মধ্যে। কদিনেই বেশ লোম হয়েছে গায়ে, ওজন বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। আর চমৎকার ভাব হয়ে গেছে ওর সঙ্গে নিনি টিনির।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে একটু অবাক হলো সুধাময়। অমলা সোফায় বসে টি ভি দেখছে। আর ওর কোলের ওপর বিনি বসে। এবং বিনির গায়ে, চেক জামা, পরনেপাজামা টাইপের কিছু। দেখতে জব্বর লাগছে। সুধাময়কে অবাক হতে দেখে অমলা বলল, 'ওকে ভদ্র করে দিলাম। বেশ মানিয়েছে, না ?'

ব্যাপারটা ভালো লাগল না। সুধাময় বলল, 'কি দরকার ছিল ?'

'ছিল ?' অমলার মুখ কঠিন হলো, 'দেখলেই মনে হতো মানুষের মতো জন্তুটা উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া নিনি টিনির মনে ওর সেক্স সম্পর্কে কৌতূহল দেখা দিতে দেরি হতো না। এসব তুমি বুঝবে না।'

'বুঝব না ?'

'জন্তু-জানোয়ার নিয়ে পড়াশুনো করেছ, তাদের নিয়ে চাকরি করছ, তুমি কি করে বুঝবে মানুষের মানসিকতা। তাহলে তো বর্তে যেতাম।'

'তা অবশ্য। মানুষের ব্যাপারটা খুব জটিল।' সুবিনয় ভেতরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল এইসময় বিনি নেমে এলো সোফা থেকে। অমলা ডাকল, 'এই বিনি, যাবি না। নো, ইউ মাস্ট স্টে হেয়ার।'

বিনি মুখ ফিরিয়ে একবার দেখল, মুখে অদ্ভুত শব্দ বের করল, তারপর সুধাময়ের পায়ের কাছে উপস্থিত হলো। অমলা রেগে গেল, 'দেখলে, কি বেআদব! কথা বললে শুনতে চায় না। কুকুরের বাচ্চাকে বললে সে কখনও অবাধ্য হয় না।'

কোলে তুলে নিল সুধাময়, 'ওর হয়তো টিভির সামনে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। ওসব প্রোগ্রাম তো এদের জন্যে নয়।'

'হোয়াট ডু য়ু মিন ?'

'কিছু না।' সুধাময় আর দাঁড়াল না। নিনিদের ঘরে উঁকি মারল সুধাময়। খাটের ওপর বসে টিনি তার নতুন কেনা পুতুলকে শাড়ি পরাচ্ছে। চোখ তুলে বলল, 'এ ঘরে এসো না ?'

'কেন ?' সুধাময় অবাক।

'বিনি আমাকে কাজ কলতে দেবে না। খুব দুষ্টু।'

'তাই ?'

'হুঁ। এই পুতুলটাকে ও খুব হিংসে করে। এই, আসবি ?'

প্রশ্ন করা মাত্র বিনি ছটফট করতে লাগল। সুধাময় তাকে ছেড়ে দিতেই সে দ্রুত খাটে উঠে গেল। তারপর শাড়ি পরানো পুতুলটাকে আলতো করে তুলে দূরে সরিয়ে দিয়ে টিনির কোলে গিয়ে বসল। পাকা গিন্নির মতো গাল ফুলালো টিনি, 'দেখলে! এখন আমি কি করি?'

'ও তোমাকে খুব ভালবাসে।'

'মোটেই না। ও ভালবাসে বকুলকে।'

'কি রকম?'

'বকুল ছাড়া কালও হাতে ও খায় না।'

এবার সুধাময়ের নজর পড়ল নিনির ওপর। ছোট টেবিলটায় বসে একমনে কি করে যাচ্ছে। সুধাময়কে সবসময় ব্যালেন্স করে চলতে হয়। একতরফা টিনির সংগে কথা বলে চলে যাওয়া চলবে না। সুধাময় ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল নিনির হাত দ্রুত চলছে। ড্রইং শিটের ওপর একটা না শিম্পাঞ্জি না মানুষের ছবি, ফুটে উঠেছে। সে বলল, বাঃ।'

নিনি মাথা নাড়ল, 'এখনও শেষ হয়নি আর তুমি বাঃ বলছ।'

'শেষ হলে নিশ্চয়ই আরও ভালো হবে।'

'তখন বাঃ বলো। আসলে বিনিটা এত চঞ্চল যে একজায়গায় বসে থাকবে না। ওকে দেখে দেখে আঁকবো তার উপায় নেই। তাই টিনিকে দেখে বিনির ছবি আঁকছি।' নিনি মিষ্টি করে হাসল।

টিনি তৎক্ষণাৎ চেঁচাল, 'এই, দেখি, ছবিটা দেখি।'

'না দেখতে হবে না, তুমি যা করছ তাই কর।' নিনি ধমক দিল। সংগে সংগে বিনিকে কোল থেকে নামিয়ে দিল টিনি, 'তুই যা, আমাকে কাজ করতে দে। ঝামেলা।'

বেচারা বিনি ফিরে এল সুধাময়ের কাছে।

কদিন থেকে সুধাময় বিনিকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করছে। কোনো জিনিসের নাম বারংবার বললে বিনি সেটাকে মনে রাখতে পারে কি না। শুনতে শুনতে ছোটখাটো কথার মানে বুঝতে পারে কি না। কদিন ধরে সুধাময় লক্ষ্য করছে ওই সময় বিনির চোখের মণি স্থির থাকে। বোঝা যায় সে মনে রাখার খুব চেষ্টা করছে।

নিজের টেবিলে বসল সুধাময়। বিনিকে টেবিলের একপাশে রেখে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করার ভান করল। এবং সেই অবস্থায় থেকে বলল, 'সিগারেট।' তারপর ঈষৎ চোখের পাতা ফাঁক করে দেখল বিনি একবার তার মুখের দিকে আর একবার টেবিলের ওপর তাকাচ্ছে। টেবিলের এক পাশে তার সিগারেটের প্যাকেট. লাইটার রয়েছে। ওই শব্দ দুটো কদিন থেকেই সে উচ্চারণ করছে বিনির সামনে। জিনিসগুলো তুলে তুলে নাম বলেছে। সে দ্বিতীয়বার বলল, 'সিগারেট দাও বিনি।'

এইবার বিনি নড়ল। হাত বাড়িয়ে লাইটারটাকে ধরল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, তারপর উঁচিয়ে ধরল সুধাময়ের সামনে। সুধাময় মাথা নাড়ল। তারপর বলল,

'এটা লাইটার। সিগারেট। সিগারেট।'
একটু হতভম্ব মনে হলো প্রাণীটিকে। তারপর লাইটারটাকে শব্দ করে ফেলে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে আনল। এবার খুব খুশি হলো সুধাময়। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে প্যাকেটটা নিতেই একলাফে সুধাময়ের কাঁধে চেপে বসল। তারপর চুলে হাত ঢুকিয়ে দিল। সুধাময় চাপা গলায় ধমকাল, 'নো, এটা বাঁদরের হ্যাবিট, তোমাকে মানায় না বিনি।'
বিনি এখন সুস্থ। ডাক্তার মিত্র এসেছিলেন। তিনি খুব অবাক হলেন। তার মতে বিনি একটু বেশিমাত্রায় সুস্থ। ওই বয়সের শিম্পাঞ্জির যতটা বড় হওয়া উচিত বিনি তার অনেক বেশি বেড়েছে। তিনি ওর ওজন বেড়েছে বলে চিন্তিত হলেন। অমলাকে বললেন, 'ওর খাওয়া-দাওয়া এবার কন্ট্রোল করা উচিত। চর্বি-জাতীয় খাবার একদম দেবেন না, মিষ্টি কিছু নয়ই।'
টিনি সামনে ছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'ক্যাডবেরি ?'
'উহুঁ, ওরা তো বনেজঙ্গলে এসব পায় না। ওরা যা খায় তাই দেওয়া উচিত।'
অমলা বলল, 'যা বলবার ওকে বলুন। শিম্পাঞ্জিটা আমার কথা মোটেই শুনতে চায় না শুধু একটা কাজ ছাড়া।'
ডাক্তার মিত্র অবাক হয়ে বললেন, 'কি কাজ ?'
'দেখবেন ?' বিনি বসেছিল নিনির কোলে। অমলা তাকে ডাকল 'বিনি, এদিকে এসো।' বিনি নড়ল না। মুখ ঘুরিয়ে রইল।
অমলা রুষ্ট হলো 'দেখলেন কি অবাধ্য। কিন্তু দেখুন এবার। বিনি, যাও তো, টি ভি খুলে দাও। টি-ভি।'
সঙ্গে সঙ্গে কোল থেকে নেমে পড়ল বিনি। টিভির কাছে পৌঁছে নব ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে পিছু হটে সুইচবোর্ডের দিকে আঙুল তুলে মুখে শব্দ করল। সুধাময় উঠে সুইচ অন করতে সে আবার খুশি মনে নিনির কাছে ফিরে এল। অমলা বলল, 'এই টিভি খুলতে বললে উনি কাজ দেখাবেন। বাঁদরদের আবার এই নেশা হয় জানতাম না।'
নিনি প্রতিবাদ করল, 'বিনিকে বাঁদর বলো না মা, ও তো শিম্পাঞ্জি।'
'ইটস অল দ্য সেম।' অমলা কাঁধ ঝাঁকালো।
টিভিতে এখন কোনো ভালো প্রোগ্রাম নেই। সুধাময় সেটাকে বন্ধ করে দিলে অমলা খাবার টেবিল সাজাতে উঠল। ডাক্তার আজ এখানে খেয়ে যাবেন। নিনি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, বিনি এখানে আছে বলে ওর মা কষ্ট পায় না ?'
ডাক্তার বললেন, 'না। অন্তত সেরকম কিছু দেখা যায়নি। অবশ্য শিম্পাঞ্জিরা অত্যন্ত পারিবারিক। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। ব্যতিক্রম তো নিয়ম নয়।'
খাওয়ার টেবিলে বসল ওরা। বিনির জন্যে আলাদা চেয়ার হয়েছে। লম্বা, যাতে সে টেবিলটায় স্বচ্ছন্দ হয়। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কি আপনাদের সঙ্গ খায় ?' অমলা হাসল, 'মেয়েদের ভালবাসে।'
খাবার নিয়ে সবাই বসে গেলে বিনির সামনে একটুকরো কেক দেওয়া হলো। ডাক্তার বললেন, 'আবার কেক দিচ্ছেন ?'

সুধাময় বলল, 'শেষবার। আসলে খুব ভালো কেক এসেছে, অমলা হয়তো শেয়ার দিতে চায় বিনিকে। বাড়িতে আছে, খাবে না।' বলে সে অমলার দিকে তাকাল। অমলা ঠোঁট টিপে হেসে ফোলা ফোলা চুল ঝাঁকাল।

বিনি কেকটাকে সামান্য সময় পর্যবেক্ষণ করল। তারপর প্লেটসুদ্ধ নেমে গেল নিচে। তাকে ব্যালেন্স রেখে চলতে খুব কসরৎ করতে হচ্ছিল। কিন্তু নিমেষে চোখের আড়ালে চলে গেল সে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হলো ?'

অমলা বলল, 'ওই এক কায়দা। খাবার টেবিলে বসবে। আমাদের কথাবার্তা গিলবে। কিন্তু কিছুতেই খাবে না। আমাদের মেইড সার্ভেন্টের হাতে না খেলে ওর খাওয়া হয় না। নেমকহারাম আর কাকে বলে।'

ডাক্তার বললেন, 'আপনি কিন্তু অহেতুক রাফ হচ্ছেন। আপনার মেইড-সার্ভেন্ট ওকে প্রথম ফিড করিয়েছিল এটা ও মনে রেখেছে।'

ডাক্তার চলে গেছেন অনেকক্ষণ। ঘুমুবার আগে প্রসাধন নিয়ে থাকে অমলা অনেকক্ষণ। বয়স যত বাড়ছে তত সময় বাড়ছে। জার্নাল পড়তে বসে মত পাল্টে সুধাময় বাচ্চাদের ঘরে এলো। বকুল ওদের বিছানা ঠিক করে দিচ্ছে। আর সেই সঙ্গে মুখ চলছিল। বিনি তো বটেই, ঘুমুবার সময় নিনির গল্প না শুনলে এখনও চলে না। তাকে ঢুকতে দ্যাখে নি কেউ। দেশজ বাংলায় বকুল এক ডাইনী আর রাজপুত্রের কথা বলছিল। সুধাময় অবাক হলো। নিনি আজকাল ইংরেজি রূপকথা পড়তে পারে। থিচু সিক্সটি সিক্স গুডনাইট স্টোরিস মুখস্থ। ও এরই মধ্যে মায়ের কাছ থেকে জেনে গেছে ডাইনী, রাক্ষস কিংবা রাজপুত্রের গল্পগুলো বানানো। ওগুলো শুনলে বোধবুদ্ধি সার্প হয় না। অথচ এখন তন্ময় হয়ে শুনছে সে। টিনি তো বিছানায় সিঁটিয়ে আছে গল্পের টানে। সুধাময় আরও অবাক হচ্ছিল একটা কারণে। মেয়েটিকে মাঝে মাঝে বাচ্চাদের গল্প বলতে দেখেছে সে। খুব একটা খেয়াল করে নি। এই বাচ্চা মেয়েটা এত গল্প শিখল কোত্থেকে ? এখনও বছর বারো বয়স হয় নি। অক্ষর চেনে না। এ বাড়িতে ওর মা দিয়ে গেছে তিন বছর আগে ফাইফরমাস খাটার জন্যে। অর্থাৎ তার আগের স্মৃতি থেকে বলে যাচ্ছে ও, নাকি নিজেই বানাচ্ছে! সুধাময় দেখল বিনি তার দিকে তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ তিনজন মানুষ নয়, শিম্পাঞ্জিটাই তাকে লক্ষ্য করেছে। বেবিকটে বসে বোধহয় সে-ও বকুলের গল্প শুনছিল, কিন্তু সুধা-ময়কে দেখামাত্র মনোযোগ ভেঙেছে। এই সময় মুখ ফেরাতেই বকুল তাকে দেখতে পেল। তৎক্ষণাৎ ঠোঁট বন্ধ হলো ওর। মুখ নিচে নামল। আর টিনি বলে উঠল, 'এ্যাই, থামলি কেন ? তার পল কি হলো ?'

সুধাময় এবার জানান দিল, 'ঠিক আছে, আর গল্প শুনতে হবে না। অনেক রাত হয়েছে, এবার ঘুমিয়ে পড় তোমরা। তুই খেয়েছিস ?'

মাথা নিচু করে তেমনি বসেছিল বকুল। নড়ল না। নিজের সিদ্ধান্তের কথা ভুলে গেল সুধাময়। একটু বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'উত্তর দিচ্ছিস না কেন ?'

এবার নীরবে মাথা নেড়ে উঠে গেল মেয়েটা। আর সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠল টিনি, 'তুমি কেন ওকে চলে যেতে বললে ? আমার যে গল্প শোনা হলো না।'

'কালকে শুনবে। তোমার কান্না দেখে বিনি পর্যন্ত হাসছে।'
'ও হাসবে না। ও শুনছিল। ও বকুলকে ভালবাসে।'
এই সময় অমলা দরজায় এসে দাঁড়াল। তার পরনে নাইটি। প্রসাধন চলায় বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাকে। বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'ব্যাপারটা কি ? মাঝ রাতে বাড়িটা বাজার হয়ে গেল নাকি ? তোমরা ঘুমোওনি কেন ?'
সুধাময় অমলাকে আশা করে নি। সহজ গলায় বলল, 'ওরা বকুলের কাছে গল্প শুনছিল। মাঝপথে বাধা পড়ায় মন খারাপ।'
'ওঃ, আবার সেই সব ট্র্যাস ! আমি বলে দিয়েছিলাম ওসব গল্প কখনও বলবি না, তবু শুনবে না মেয়েটা। এই বাড়িতে কেউ যদি আমার কথা শোনে। নিনি, ইউ নো, তুমি কেন ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছ ?'
নিনি উঠে বসল, 'আই লাইক দোজ স্টোরিস।'
এবার অমলার গলা উঠল, 'ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে এই শিক্ষা হচ্ছে তোমার ?'
ঘাড় শক্ত করে নিনি বলল, 'আমার ভালো লাগে।'
'লাগবেই তো ! বাপ-ঠাকুর্দার রক্ত কোথায় যাবে। যতই তোমাদের আধুনিক করার চেষ্টা করি তবু কুসংস্কার ঘুচবে না। আমি যেন ফের ওইসব শুনতে না দেখি।'
অমলা ফিরে গেল নিজের ঘরে। সুধাময় এক পলক সেদিকে তাকিয়ে মেয়েদের বিছানায় গিয়ে বসল, 'ঠিক আছে, এবার তোমরা ঘুমিয়ে পড়।'
টিনির কান্না থেমেছিল। নিনির গাল ফুলেছে। সুধাময় তাকে কাছে টানল, 'উঁহু, মায়ের কথায় রাগ করতে নেই।'
'আমার গুডনাইট স্টোরিস একদম ভালো লাগে না।'
'কেন ?'
'ওখানে শুধু পশুপাখি আর গাছেদের কথা থাকে।'
'ডাইনী রাক্ষসের গল্প কেন ভালো লাগে ?'
'বাঃ, ওখানে রাজপুত্র সবাইকে হারিয়ে কেমন শেষ পর্যন্ত জিতে যায় !'
নিনির কথা শেষ হওয়ামাত্র টিনি বলল, 'বিনিও বকুলের গল্প শোনে। চুপটি করে বসে থাকে।'
বিনির কথা উঠতেই প্রসঙ্গ পাল্টালো নিনি। বলল, 'জানো বাবা, বিনি আজও কেক খায় নি। বকুলকে দিয়ে দিয়েছে।'
'আজও মানে ?' সুধাময় খবরটায় অবাক হলো।
নিনি বলল, 'ওকে মা ভালো খাবার দিলেই ও বকুলকে দিয়ে দেয়।'
সুধাময়ের কপালে ভাঁজ পড়ল। সে উঠে দাঁড়াল, 'নাও, তোমরা এবার ঘুমিয়ে পড়। নিনি, কাল তোমাকে ভোরবেলায় স্কুলে যেতে হবে। গুড নাইট।'
পা বাড়াচ্ছিল সুধাময়। এই সময় বিনি শব্দ করল। সুধাময় ঘুরে দেখল বেবিকট থেকে নামবার চেষ্টা করছে বিনি। সে এগিয়ে গিয়ে মাথায় হাত রাখতে শান্ত হলো বিনি। সুধাময় বুঝল বিনির মনে ঈর্ষা জন্মেছে। তাকে উপেক্ষা করে চলে যাওয়া সে মোটেই পছন্দ করে না।

নিচে নেমে এলো সুধাময়। সিঁড়ির গায়ে এক চিলতে ঘরটা বকুলের। ওখানে ঢোকার প্রয়োজন হয় না সুধাময়ের। অমলাও ঢোকে কিনা সন্দেহ। আলো জেলে দরজায় দাঁড়িয়ে সুধাময় ডাকল, 'বকুল!'
ঘরে কেউ নেই। সুধাময়ের খেয়াল হলো, মেয়েটা নিশ্চয়ই ওপরে যাচ্ছে। সে আর অশান্তি চায় না। বকুলকে বলে দিতে হবে অমলা যেগুলো নিষেধ করে সেগুলো সে যেন কখনও না করে। সুধাময় দেখল বকুলের সামান্যই জিনিসপত্র পরিপাটি করে সাজানো। তোষকটাকে চিনতে পারল সে। ছাত্রজীবনে ওইটেই তার ব্যবহারে লাগত। এখন নানান জায়গায় ফেঁসে গিয়ে তুলো উড়ছে। চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে অনেক জায়গায়। সেটাকেই যত্ন করে গুটিয়ে রেখেছে মেয়েটা। তারপরেই নজরে এলো একটা কলাই করা বাটিতে কেক রাখা হয়েছে। সুধাময় বুঝতে পারছিল না নিনি ঠিক বলেছে কিনা। এই সময় পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফেরাতেই দেখল বকুল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ঘরে সাহেব আসবে এমনটা সে ভাবতেই পারে নি।
সুধাময় জিজ্ঞাসা করল, 'খেয়েছিস?'
একটু সময় নিয়ে মাথা নাড়ল মেয়েটা।
'কি খেয়েছিস?'
'রুটি তরকারি।'
ঠোঁট কামড়ে মাথা নেড়ে না বলল বকুল।
'মেমসাহেব তোকে দেয় নি?'
এবার পাথর হয়ে গেল বকুল। একটুও নড়ল না। প্রশ্ন করে জবাব না পেলে খুব রাগ হয় সুধাময়ের। সে উষ্ণ হয়ে প্রশ্ন করল, 'তোর ঘরে ওই কেক এলো কোত্থেকে? জবাব দিচ্ছিস না কেন?'
'বিনি এনেছে। আমি মানা করি তবু আনে।' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল বকুল।
সুধাময় কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত নিচু স্বরে প্রশ্ন করল, 'বিনি কেক খেয়েছে?'
'না।'
'তুই খেয়ে নে ওটা।' সুধাময় আর দাঁড়াল না। ভারী পা ফেলে ওপরে উঠে এলো। ঘুমুবার সময় মুখে একটা লোশন পুরু করে বুলিয়ে রাখে অমলা। ওতে পরের দিনটায় চামড়া টানটান থাকে, ভাঁজগুলো গাঢ় হয় না! এরকম লোশন থাকলে তাকে ছোঁওয়া বারণ। সুধাময়ের যদি কখনও ইচ্ছে হয় স্পর্শ করতে তাহলে আগে জানান দিতে হবে। লোশন লাগাবার পর কোনো রকম আদিখ্যেতা নয়। সুধাময় ঘরে ঢুকে বিরক্ত চোখে দেখল অমলার লোশনপর্ব শেষ হয়েছে। মাথার চুল নেটে আবদ্ধ করে সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে মদির হাসল অমলা। এখনও দুটো হাত মাথার পেছনে রেখে হাসলে অমলার শরীরে আকর্ষণ তৈরি হয়। সুধাময় সেটা দেখেও দেখল না।
অমলা বলল, 'আজকে লোশন লাগিয়ে ফেলেছি, শুয়ে পড়।'
সুধাময় সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'বকুলকে কেক দাওনি?'

'তোমার কাছে নালিশ করেছে বুঝি ! আস্পর্ধা বেড়ে গেছে দেখছি।'
'না, ও কিছু বলেনি। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করছি।'
'কেন ?'
'বাড়িতে কেক এসেছিল। সবাই খেল, ও খেয়েছে কিনা জানা দরকার।'
'হঠাৎ ঝি-চাকরদের জন্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছ, ব্যাপারটা কি ?'
'উদ্বিগ্ন ?'
'দেখছি তো তাই। আগে কখনও দেখিনি কোন্ ঝি কি খেল, কি জামা পরল তার খবর নিতে ! শোন, আমি বকুলকে কেক দিইনি।'
অমলা কথাগুলো বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল সাবধানে যাতে তার চুল নষ্ট না হয়ে যায়। তারপর বলল, 'আলো নিভিয়ে দাও, আমি টায়ার্ড ;'
ঘর অন্ধকার করে সুধাময় জিজ্ঞাসা করল, 'দাওনি কেন ?'
'বিকজ সি ইজ মেড-সার্ভেন্ট। দামী খাবার খাইয়ে ওর মুখ নষ্ট করে দেওয়া ইনহিউম্যান ব্যাপার, এটা তো সোজা কথা।'
হাঁ হয়ে গেল সুধাময়। অন্ধকারে যদিও তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু কথা বলতে সে সময় নিল, 'বুঝলাম না।'
'আঃ সুধাময়, দিনকে দিন তুমি ডাল হয়ে যাচ্ছ। বকুল যে পরিবার থেকে এসেছে সেখানে কেউ কেক, চাইনিজ কিংবা পুডিং খায় না। ওকে দুদিন বাদে সেই পরিবারে ফিরে যেতে হবে, বিয়ে হবে মানানসই ছেলের সঙ্গে। ওকে যদি আমি দামী খাবারে অভ্যস্ত করে দিই তাহলে কখনও স্বামীর সংসারে মানাতে পারবে ? ক্লিয়ার হয়েছে তোমার। নাউ স্টপ।' চুলের অযত্ন হবে বলে চিৎ হয়ে শুতে পারে না, বিউটি পার্লারের নির্দেশ।
'চমৎকার ! বাড়িতে ভালো খাবার আসে, সবাই আনন্দ করে খায় আর একটা বাচ্চা তাকিয়ে দ্যাখে অথচ তোমার ভবিষ্যৎ দেখার চোখ ভালা করতে চায়। বাট হোয়াট অ্যাবাউট বিনি ?'
'বিনিকে তো কেক দিয়েছি। তুমি দেখেছ !'
'বিনি যে প্রজাতি থেকে এসেছে তারা কেক খায়। দুদিন বাদে যখন বিনি তার স্বজাতির কাছে ফিরে যাবে তখন এই সব খাবার পাবে ?'
'ওয়েল, এটা ভাবিনি আমি। তা ছাড়া, বিনিকে তুমি ফিরিয়ে দেবে নাকি ?'
'তুমি কি চাও ?'
'ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে বাড়ির কাজের সুবিধে হয়।'
'শোন অমলা, তুমি নিশ্চয়ই খবর রাখ না, বিনি তোমার দেওয়া ভালো খাবার-গুলো পেয়ে বকুলকে দিয়ে আসে। আমার ধারণা, ও ফিল করেছে যে ওইসব জিনিস বকুলকে দেওয়া হয় না। এখন তো আমার বিনিকে মোর হিউম্যান বলে মনে হচ্ছে। গুড নাইট।'
বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল। পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বুঝতে পারল সুধাময়। নিনি স্কুলে গিয়েছে সাতসকালে। টিনিকে নিয়ে গাড়ি বের করে ওকে পেঁছে দেওয়া অভ্যাস ছিল সুধাময়ের। কিছুদিন আগে থেকে সঙ্গে টিনিকে

নিয়ে যেত সে। স্কুল চিনলে এবং অন্য বাচ্চাদের স্কুলে যেতে দেখলে ওর আগ্রহ বাড়বে, তাই। আজ বিনিও সঙ্গে জুটল। শুধু সঙ্গে যাওয়া নয়, সে নিনির ওয়াটার বটলটাকে গলায় ঝুলিয়ে গাড়িতে বসল। ওকে নিয়ে এই প্রথম তারা বাইরে বেরুল। সুধাময় দেখেছে টিনির চেয়ে বিনি অনেক কৌতূহলী হয়ে ভোরের শহরটাকে দেখেছে। জানলায় মুখ রেখে দেখতে দেখতে সে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। সেই সময় টিনি তাকে ধমকেছে, 'বিনি, চুপ কলো, অমন কলো না।'

স্কুলে নিনিকে পৌঁছে দিলে বিনি প্রথমে বোতলটাকে ছাড়ছিল না। সে-ও যাবে নিনির সঙ্গে। ওকে দেখতে বাচ্চাদের ভিড় জমে গিয়েছিল। কিন্তু একটুও ভয় পায় নি বিনি। অনেক কষ্টে যখন ওয়াটার বটলটা ওর কাছ ছাড়া করা গেল তখন সুধাময়কে অবাক করে নিনি বলল, 'হ্যান্ড শেক বিনি।'

সঙ্গে সঙ্গে বিনি হাত বাড়াল। অবশ্য নিনির হাত ছোঁওয়ামাত্র সে সরে এলো ভেতরে। বাড়িতে ফেরার সময় সুধাময় জিজ্ঞাসা করেছিল টিনিকে, 'ওকে হ্যান্ড শেক করতে কে শেখাল রে?' টিনি উত্তর দিয়েছিল 'বকুল।'

সুধাময় চমৎকৃত। বসিরহাটের একটা গাঁয়ের মেয়ে ইংরেজি না জেনেও সাহেবি—কায়দা শেখাচ্ছে। অমলা শুনলে খুশি হবে।

কিন্তু অমলা যে বাক্যালাপ বন্ধ করেছে তা টের পেল চায়ের টেবিলে বসে। টিনির দুধ, বিনির কলা আর সুধাময়ের চা এবং কাগজ রয়েছে, অমলা নেই। অভ্যেসে সুধাময় বলল, 'মা কোথায় গেল, বকুল, ডাক ওকে।'

বকুল চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল একপাশে। এখনও মাঝে মাঝে খেয়াল হলে টিনি তাকে খাইয়ে দিতে বলে। বকুল বলল, 'মেমসাহেব চা খেয়ে নিয়েছে।'

'সেকি! কেন?' প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারল ওকে জিজ্ঞাসা করা বোকামি। সে গলা তুলে ডাকল, 'অমলা, এদিকে এস। অমলা।'

ভেতর থেকে কোনো সাড়া এল না। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটল। বিনি কলা হাতে নিয়ে বসেছিল। হঠাৎ সেটাকে টেবিলে রেখে নিচে নেমে পড়ল। তারপর লাফাতে লাফাতে চলে গেল অমলার কাছে। আর তারপরেই সুধাময় চিৎকার শুনল, 'দূর হ, গেটআউট। কাপড় ধরে টানছে। এ সব একে শেখানো হচ্ছে নাকি! খুব, হিউম্যানদের স্বভাব নকল করছ। আর এমন করলে ঠাস করে চড় বসিয়ে দেব।'

চুপচাপ বসে রইল সুধাময়। আর টিনি তার কাঁচ গলায় ডাকল, 'বিনি, এই বিনি, কাম হিয়ার, এদিকে আয়। এই বকুল, দ্যাখ না—।

শিম্পাঞ্জিটা বেরিয়ে এলো। তারপর কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা বকুলের কাঁধে উঠে বসে মুখ গুঁজে রইল। টিনি বলল, 'বাবা, বিনি রাগ করেছে।'

সুধাময় এবার অন্য কারণে অবাক হলো। এতদিন বিনি বারংবার চিনিয়ে দিলে জিনিসপত্র চিনতে পারছিল। বকুলকে খাবার দেওয়াটা অবশ্যই অনুভূতির ব্যাপার কিন্তু ওটা আকস্মিক হতে পারে। কিন্তু বকুনি খেয়ে সেটা বুঝতে পেরে অভিমান করাটা রীতিমত চমকপ্রদ নয়? একদিন নিনি মায়ের কাছে বকুনি

খেয়ে অমন করেছিল। সেটাই নকল করছে না তো। অবশ্য ট্রেইন্ড কুকুরও বকলে বুঝতে পারে। কিন্তু আশ্রয় হিসেবে বিনি বকুলকে বেছে নিল কেন ? সে তো সুধাময় কিংবা টিনির কাছেও আসতে পারত।

সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে হকচকিয়ে গেল সুধাময়। বাইরের ঘরে জমাট আড্ডা বসেছে। অমলার দুজন বান্ধবী এসেছে। মিসেস দাস অত্যন্ত রাসভারী মহিলা। দেখলেই মনে হয়, কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন। ললিতা ঠিক উল্টো। মুখে কোনো কথা আটকায় না। ওদের সঙ্গে গল্প করছে অমলা। আর মাঝখানে একটা মোড়ায় বসে বই খুলে ধরে রয়েছে বিনি। তাকে দেখামাত্র ললিতা চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে স্যার, আপনি দারুণ জিনিস জোগাড় করেছেন। অবিকল মানুষ।'

'তাই ?' সুধাময় বলল। আর তখনই অমলা আলতো হাসি মাখিয়ে উচ্চারণ করল, 'অবিকল মানুষরা কিন্তু মানুষের চেয়ে ঢের ওবিডিয়েন্ট। তুমি এরকম একটা জোগাড় করে নাও ললিতা। সব কাজ করে দেবে।'

'গুড আইডিয়া। এরা কত বড় হয় সুধাময়দা ?' ললিতা জিজ্ঞাসা করল।

'লম্বায় না বয়সে ?'

'দুটোই। সঙ্গি হিসেবে খুব সেফ। ঝগড়াঝাঁটি অন্তত হবে না, কি বল ?' শেষ প্রশ্নটা অমলার উদ্দেশে। অমলার প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। সুধাময় দেখল ব্যাপারটা ললিতা অস্বস্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিয়ে থা করে নি, বাপের প্রচুর পয়সা, কোনো ছেলের গুণ দেখতে পায় না। সে প্রশ্নটা এড়িয়ে মিসেস দাসকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কেমন আছেন ? অনেকদিন বাদে দেখলাম।'

মিসেস দাস হাসবার চেষ্টা করলেন। সেটা হাসি কিনা বোঝা গেল না। এই সময় ললিতা বলল, 'এই বিনি, সিগারেট, সিগারেট ?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে বিনি সুধাময়কে দেখল। তারপর বইটাকে সোফায় রেখে এগিয়ে এসে সুধাময়ের প্যান্ট ধরে দাঁড়িয়ে হাত তুলল। ভঙ্গি দেখে একাই হাসির ঝড় তুলল ললিতা, 'ফাইন। আমাকে এরকম একটা বাচ্চা জোগাড় করে দেবেন ?' 'পেলে বলব।' সুধাময় আর দাঁড়াল না। বিনিকে তুলে নিয়ে ভেতরে চলে এলো। আর তখনই কানে এলো, টিনি বলছে, 'জানো বাবা, বিনি আজ মুখ ভেংচেছে। তিনবার।'

'কে শেখাল ওকে ?'

'নিনি।'

সঙ্গে সঙ্গে নিনি প্রতিবাদ করল, 'না বাবা, ও নিজেই ভেংচেছিল, তাই দেখে বিনি শিখেছে।'

'আর কখনও ওর সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করবে না।'

সুধাময় এবার ডাক্তার মিত্রকে টেলিফোন করল, 'বিনির বুদ্ধি খুব দ্রুত খুলছে।'

ডাক্তার বললেন, 'হুঁ। আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম।'

'বলুন।' সুধাময় ডাক্তারের গলায় অন্যরকম সুর টের পেল।

'ব্যাপারটা হচ্ছে, অনেকদিন তো হয়ে গেল। এখন আমাদের উচিত বিনিকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করা। ওকে ওর জীবন ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'
'হোয়াট ডু য়্যু মিন ? বিনি কি মরে আছে ?'
'ওর শিম্পাঞ্জিত্ব মরে যাচ্ছে। এইভাবে যদি ও মানুষের স্বভাব নকল করতে আরম্ভ করে তাহলে নিজের স্বভাব ভুলে যেতে দেরি হবে না। ও আর কোনোদিনই ওর জাতভাইকে গ্রহণ করতে পারবে না, তারাও ওকে নেবে না।'
'ওয়েল, আপনি কি করতে বলছেন ?'
'আমার মনে হয় এইবার ওকে ওর পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'
'ইম্পসিব্‌ল। আপনি জানেন না ও কিভাবে আমাদের সঙ্গে মিশে গেছে। প্রথম কথা, আমার মেয়েরা ওকে ছাড়তে পারবে না। দে আর ইমোশনালি ইনভলভড্‌। তাছাড়া, বিনিও এই নিরাপত্তায় যেভাবে মানুষ হয়েছে তার সঙ্গে চিড়িয়াখানার জীবনের কোনো মিল খুঁজে পাবে না। ও তো নিজেকে রক্ষা করতেই শেখে নি।'
'বুঝলাম। কিন্তু এখনও সময় আছে। আমার বিশ্বাস, বিনির ইনস্টিংট এখনও নষ্ট হয় নি। ঠিক আছে, পরীক্ষা করার জন্যে কাল থেকে যখন চিড়িয়াখানায় আসবেন তখন ওকে সঙ্গে নিয়ে আসুন না। বিকেলে আবার ফিরে যাবে। সারাদিন অন্য জন্তু-জানোয়ারদের দেখুক। অভ্যস্ত হোক। এসব কথা আপনাকে আমি আর কি বোঝাব বলুন। আফটার অল, ওকে আমাদের বাঁচানো উচিত।'
রাতের খাওয়ার টেবিলে অমলা এসেছিল। কিন্তু খেতে বসে নি। আজ একটা নতুন জিনিস দেখা গেল। অমলা দাঁড়িয়ে নিনি এবং টিনিকে কিছু বলে চলে যাওয়ার পর থেকেই বিনি আর ভদ্রভাবে বসল না। সে উঠে দাঁড়াল। নিনি টিনির অনেক অনুরোধ কানে গেল না। তাকে দেওয়া ফলমূল তুলে নিয়ে ঘরের এক কোণায় বসে খেতে লাগল। সেদিকে চেয়ে নিনি বলল, 'বিনি মায়ের মতো রাগ করে আলাদা খাচ্ছে বাবা।'
সুধাময় ঠিক করেছিল নিজে থেকে অমলার সঙ্গে কথা বলবে না। সে কথা বন্ধ করে নি, যে করেছে তারই শুরু করা উচিত। সে লক্ষ্য করল অমলা আজ প্রসাধন নিল না। হয় সব কিছুতেই তার নিস্পৃহতা এসে গেছে, নয়—! দ্বিতীয় চিন্তাটা মাথায় আসতেই সে শক্ত হলো। না, কিছুতেই নয়। শরীরকে অবলম্বন করে দুটো মনের সখ্যতা তৈরি হতে পারে না। সে দেখল অমলা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। বই নিয়ে বসল শুধাময়। আজ সে চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জিদের বুকে গিয়েছিল। বিনির বাবাকে খোঁড়াতে দেখেছে সে। হয়তো কোনো দর্শক খুঁচিয়েছে ওকে। এইটে কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে যাচ্ছে। বিনির মা এখনও পূর্ণ যুবতী। অকালে সন্তান শরীরে এসে যৌবনকে ত্বরান্বিত করেছে। ওদের হাবভাবের সঙ্গে বিনির মিল খুব সামান্য।
বই রেখে উঠল সে। টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে পাশের ঘরে এলো। নীল আলো

জ্বলছে। দুজন পাশাপাশি শুয়েছিল। ওকে দেখে নিনি উঠে বসল। সুধাময় জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুমোওনি ?'
'ঘুম আসছে না। টিনিও জেগে আছে।'
'ঘুমিয়ে পড়। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।' তারপরেই ওর নজরে পড়ল বেবি-কটটা খালি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'বিনি কোথায় গেল ?'
'বকুলের সঙ্গে গিয়েছে।' জবাবটা দিয়ে নিনি আবার শুয়ে পড়ল। এতরাত্রে বিনি আবার কোথায় গেল ? সে কি শোওয়ার জায়গা পাল্টালো ? সুধাময় বকুলকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। নিঃশব্দে নিচে নেমে এলো। মেয়েটাকে একটু ধমকানো দরকার। বিনির শোওয়ার ব্যবস্থা তাদের জিজ্ঞাসা না করে বদলানোর সাহস কেন হলো ? বকুলের দরজায় আসতেই সে গলা শুনতে পেল। কার সঙ্গে কথা বলছে বকুল ? পায়ে পায়ে সে দরজার পাশে এসে দাঁড়াতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। বকুলের বিছানায় চুপটি করে বসে আছে বিনি। আর তার সামনে হাঁটু মুড়ে কিছু একটা সেলাই করতে করতে গল্প বলে যাচ্ছে বকুল। ডাইনীকে মেরে ফেলল রাজকুমার। গল্পের নটে গাছটি মুড়োনো মাত্র মাথায় হাত দিয়ে শোয়ার চেষ্টা করল বিনি। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে মৃদু ধমক দিল বকুল, 'আহ্লাদ ! চল নিজের বিছানায় শোবে। অনেক গল্প শোনা হলো বাবুর।'
এইরকম গলায় কখনও কথা বলতে শোনে নি সুধাময়। এ যেন অন্য বকুল। দ্রুত ফিরে এলো সে ওপরে। শিম্পাঞ্জিও গল্প শুনে ঘুমুতে যাচ্ছে। তাজ্জব ব্যাপার। মনে মনে স্থির করল সুধাময়, বিনিকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতেই হবে। ও মানুষের সব বদ অভ্যেস রপ্ত করে নিচ্ছে। ব্যাপারটা মোটেই ভালো নয়। ঘরে ঢুকে সে ভুলে গেল সিদ্ধান্তের কথা। নিজেই কথা বলল, 'বিনিকে এবার চিড়িয়াখানায় ফিরিয়ে দিতে হয়।'
প্রস্তাবটা এমন আকস্মিক যে অমলা না বলে পারল না, 'কেন ?'
'বেশ বড় হয়ে গিয়েছে। এবার ওর যাওয়াই উচিত।'
অমলা কোনো জবাব দিল না, ওপাশ ফিরে শুল।
আজকাল গাড়ির হর্ন বাজলেই বিনি তড়াক করে জানলায় ছুটে যায়।
সুধাময় বকুলকে বলে রেখেছিল ওদের তৈরি করে রাখতে। হর্ন বাজাতেই নিনি ছুটে এলো, 'বাবা, তুমি আমাদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে ?'
'হুঁ, মা কোথায় ?'
'মা টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।'
'ও। তোমরা মাকে বলে এসো তাড়াতাড়ি।'
'মাকে বলেছি। আচ্ছা বাবা, বিনিকে যেতে বলেছ তুমি ?'
'হ্যাঁ।'
'ওমা, বিনি তো নিজেই পশু, ও আবার পশুদের দেখবে কি ?'
'পশুরাই তো পশুদের দ্যাখে। নাও, সবাইকে ডাক।'
এইসময় টিনি ছুটে এলো, 'বাবা, বিনি যদি চিড়িয়াখানায় থেকে যায়, ও যদি আর না আসতে চায় কি হবে ?'

কি, আর হবে, থাকবে। আমাদের বাড়িতে আনরা ওদের বাড়িতে ওরা, তাইতো নিয়ম।' সুধাময় কথাগুলো বলতে বলতে লক্ষ্য করল টিনির মুখের রঙ পাল্টে যাচ্ছে। সে তাই ফের হেসে জুড়ে দিল, 'বিনিকে আজ আমরা ফিরিয়ে আনবই, বুঝলে?' টিনি বাবার মুখের দিকে তাকাল। বিশ্বাস করার চেষ্টা করল। তরপর বলল, 'মিথ্যে কথা বলতে নেই, নালে নিনি।'
এইসময় বকুল বিনিকে নিয়ে এলো। পরিষ্কার ফতুয়া আর পাজামা বিনির পরনে। মুখচোখ যেন চকচক করছে। কোল থেকে নেমে সুড়ৎ করে গাড়িতে উঠে বসল। সুধাময় গাড়িতে উঠতে যাবে, এইসময় কানে এল নিনি বলছে, 'বাবা বলল বিনি ফিরে আসবে আজই! তুই মন খারাপ করিস না!'
সুধাময় চোখ তুলে দেখল বকুলের চোখে জল প্রায় উপচে আসছে, সে দেখছে জেনে মুখ ফিরিয়ে নিল। স্টিয়ারিংও ঘুরাতে ঘুরাতে সুধাময় স্থির করল তাকে নির্মম হওয়া চলবে না। ধীরে ধীরে সইয়ে দিতে হবে। এইসময় পেছনের সিট থেকে বিনি লাফিয়ে তার ঘাড়ের কাছে এসে বসল। সুধাময় নাক টেনে গন্ধ নেবার ভান করে বলল, 'তোমরা বিনির গায়ে সেণ্ট লাগিয়ে দিয়েছ নাকি?'
নিনি বলল, 'নাঃ। ও সেণ্টের শিশি দেখলেই ভয় পায়।'
গাড়ি চালাতে চালাতে সুধাময় দেখল বিনি তার পকেট হাতড়াচ্ছে। ফতুয়ার গায়ে দুটো পকেট করে দিয়েছে বকুল। কিন্তু পকেটের মুখটাই বেচারা খুঁজে পাচ্ছে না এখন। সুধাময়ের মজা লাগছিল। ওর পকেটে একটা কিছু আছে। শেষ-পর্যন্ত বস্তুটাকে টেনে নিজেই বের করল বিনি। তারপর সেটা সুধাময়ের দিকে এগিয়ে ধরল খুশি মুখে। হকচকিয়ে গেল সে। আজ অফিসে যাওয়ার সময় লাইটারটা ভুলে ফেলে গিয়েছিল সে। দেশলাই কেনার অভ্যেস নেই, সারাদিন অস্বস্তিতে কেটেছিল। অস্বস্তিটা, সে বাড়িতেই ওটা ফেলে এসেছে কিনা সেটা স্পষ্ট মনে না-পড়ায়।
হাত বাড়িয়ে লাইটারটা নিয়ে সে নিনিকে জিজ্ঞাসা করে, 'ওর পকেটে লাই-টারটা কে ঢোকাল রে, তুই না বকুল?'
'লাইটার? আমি জানি না তো? বকুল কিছু বলে নি।'
সুধাময় কৃতজ্ঞ চোখে বিনির দিকে তাকাল। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করতে হবে শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্ক এতটা সক্রিয় হতে পারে কিনা!
চিড়িয়াখানায় ঢোকার সময় বিনি ছিল সুধাময়ের কাঁধে। ওকে বাড়িতে বেঁধে রাখা হয় না। চেন কিংবা বকলসের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এই গাছপালা এবং খোলা জায়গায় বিনি চঞ্চল হতে পারে, পালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। যদি বিনি পালিয়ে যায় নিজে থেকেই তাহলে বাচ্চাদের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়াটা সহজ হবে তার পক্ষে।
চিড়িয়াখানায় ঢুকেই টিনি বলল, 'বুড়ির চুল খাব।'
নিনি গম্ভীর গলায় বলল, 'না, পেটে কেঁচো হবে। বিনির খাওয়া নিষেধ।'
টিনি কি বুঝল কে জানে, বাবাকে আড়াল করে বিনিকে ভেংচি কাটল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফিরিয়ে দিল বিনি। সুধাময় হঠাৎ শুনল কিছু মানুষ হো হো করে

হাসছে। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে পেছনে। এবং বিনি তাদের সমানে ভেংচে চলেছে। এবার সেটা সংক্রামিত হয়েছে জনতার মধ্যে। সে বলল, 'আপনারা এমন করবেন না। এদের টিজ করা ঠিক নয়। যান আপনারা, জন্তু-জানোয়ার দেখতে এসেছেন, দেখুন।' একজন চিৎকার করল, 'এটাকে কি সার্কাস থেকে আনলেন দাদা? খুব খচ্চর।' সুধাময়ের চোয়াল শক্ত হলো। সে ভাবল একবার গার্ডদের ডেকে এদের সরিয়ে দেয়। ঠিক তখনই টিনি জিজ্ঞাসা করল, 'খচ্চল, মানে কি বাবা?'

বিনি বোধহয় লোকগুলোকে সুধাময়ের সঙ্গে কথা বলতে এবং সুধাময়ের বলার ভঙ্গি থেকে কিছু আন্দাজ করেছিল। সে তার সব ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দু'চোখ বন্ধ রেখে ঘাড়ে মাথা রেখে পড়েছিল গলা আঁকড়ে। প্রশ্নটা শুনে সুধাময় আড়চোখে বিনিকে দেখে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'জন্তু। অনেকটা ঘোড়ার মতন দেখতে। চল, আগে পাখিদের কাছে যাই।'

'তাহলে বিনিকে ওলা খচ্চল বলল কেন? বিনিতো ঘোলা না!'

'ওরা সব ধেড়ে খোকা। কোথায় কি বলতে হবে জানে না।'

পাখির খাঁচার সামনে এসে জমে গেল বাচ্চারা। বিনি বেশ কৌতূহলি হয়ে পাখিদের দেখল। কিন্তু সুধাময়ের কাঁধ থেকে নামল না। সুধাময় পা ফেলতে একজন কর্মী তাকে নমস্কার করল। টিনি বলল, 'চিড়িয়াখানার সবাই তোমাকে সেলাম করে না বাবা? বাঘ, ভাল্লুক তোমাকে চেনে?'

'ওদের তো মানুষ চেনার ক্ষমতা নেই!'

'কেন নেই? বিনির তো আছে।'

'বিনি শিম্পাঞ্জি।'

সুধাময় বাঘের খাঁচার সামনে এসে দাঁড়াতেই টিনি তার পা জড়িয়ে ধরল। আর তখনই বিশাল বাঘটা ডেকে ওঠায় বিনির হাতের বাঁধন শক্ত হলো। এবং চিৎকার শুরু হলো। এখানে কিছুতেই থাকতে চাইছে না বিনি, সমস্ত শরীর ছটফট করছে তার। ব্যাপারটা অভিনব মনে হলো সুধাময়ের। জন্মাবার পর বিনি এই প্রথম বাঘ দেখল। কিন্তু বাঘ সম্পর্কে ভীতি কি ওই ডাক থেকেই ওর মনে জন্মাল?

বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বেলা একদম পড়ে এলে ওরা শিম্পাঞ্জিদের ব্লকের দিকে এগোল। সুধাময়ের হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল। জ্ঞান হবার পর এই প্রথম বিনি তার স্বজাতিদের দেখবে। সে সকালেই নির্দেশ দিয়েছিল ওদের ঘরের দরজাগুলো যেন বিকেলে এমনভাবে বন্ধ রাখা হয় যাতে প্রত্যেকে ঘরের বাইরে ঘেরা জায়গায় থাকতে বাধ্য হয়। সে ফিসফিস করে টিনিকে বলল, 'এইবার আমরা বিনির বাবা-মাকে দেখতে পাব। তোমরা দুজনে চুপ করে থাকবে।'

বাঁক ঘুরতেই শিম্পাঞ্জিদের দেখা গেল। তারা তার ধরে দোল খাচ্ছে। একটা শিম্পাঞ্জি গম্ভীর মুখে বেদির ওপর বসে আছে। সুধাময় দেখল বিনির ঘাড় লম্বা হলো। চোখ ঘুরছে। তারপর হঠাৎ সে দুটো হাত দিয়ে সুধাময়ের চোখ ঢেকে দিল। ব্যাপারটা এমন আচমকা, যে সে চমকে উঠল। বিনি কি চায় না

তার স্বজাতির সঙ্গে সুধাময় তাকে মিলিয়ে দেখুক। কোনোরকমে চোখ থেকে বিনির হাত সরিয়ে ওরা খাঁচার সামনে এলো। প্রতিক্রিয়া হলো শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে। তারা প্রত্যেকেই বিনিকে দেখল এমন চোখে, যেন ভূত দেখছে। এইসময় গম্ভীর শিম্পাঞ্জিটা নাকে একটা শব্দ করতেই বাকিরা সুড়সুড় করে চলে গেল তাদের ঘরের সামনে। নিনি জিজ্ঞাসা করল, 'ওই গম্ভীর শিম্পাঞ্জিই বিনির বাবা, তাই না?'

'বাবারা বুঝি গম্ভীর হয়?' সুধাময় হাসল, 'হ্যাঁ, ওইটেই এর বাবা।'

টিনি বলল, 'বাবা বিনিকে ডাকছে না কেন?'

'অনেকদিন দ্যাখে নি তো! চিনতে পারছে না।'

'তুমি চিনিয়ে দাও।'

'আমি তো ওদের ভাষা বুঝি না।'

'কিন্তু বিনি তো আমাদের কথা বোঝে!'

সুধাময় উত্তর দিল না। সে বিনিকে খাঁচার শিক ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে সুধাময়ের গলা ছাড়তে নারাজ। ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল নিনি। এবার সে বলল, 'বিনিও তো বাবার কথা বুঝতে পারছে না।'

বাড়িতে ফিরে ডাক্তারকে টেলিফোন করল সুধাময়। আজকের সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে রিপোর্ট করল। সব শুনে ডাক্তার বললেন, 'প্রথমবার এরকম হবেই। রোজ নিয়ে গিয়ে ওকে অভ্যস্ত করিয়ে দিতে হবে। আর হ্যাঁ, ওর পরনের জামাকাপড় খুলে রেখে যাবেন। নইলে ওর স্বজাতিদের মনে সংকোচ থেকেই যাবে। এছাড়া আর একটা কাজ করুন। চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জিদের যেসব খাবার দেওয়া হয় বিনিকে তাই দিন। ওর ফুড হ্যাবিট পাল্টে দিতে হবে।'

টেলিফোন নামিয়ে পাশের ঘরে আসতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল সে। বিনি ঘোমটা টেনে বসে আছে। সম্ভবত বকুলই তাকে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে। আঁচলের প্রান্ত এক হাতে চেপে ধরে আছে আর তারই ফাঁকে পিট পিট করে তাকাচ্ছে। সবাই হাসছে দেখে বেশ মজা পেয়ে গেছে ও। নাঃ, ব্যাপারটা বেশ বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এখনই রাস না টানলে কোনোদিন মিলতে পারবে না সে বাবা-মায়ের সঙ্গে। শিম্পাঞ্জিদের পরিবারের নিয়মকানুনগুলো বেশ কড়া। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পিতার বক্তব্যই শেষ কথা। কেউ যদি অন্যরকম আচরণ করে তাহলে সে পরিত্যক্ত হবেই। বিনি যদি মানুষের স্বভাব গ্রহণ করে তাহলে ওরা তো চিরকাল পর হয়ে থাকবে। কিন্তু এই মুহূর্তে বকাঝকা করে ওদের আনন্দ মাটি করে দিতে চাইল না সুধাময়। সে চুপচাপ ফিরে এলো।

ঘরে ঢুকতেই দেখল অমলা চেয়ারে বসে আছে। সুধাময় অবাক হলো। অমলার চুল খোলা, জম্বর ফেঁপেছে। মুখচোখ থমথম করছে! একটা ঝড় হয়ে গিয়েছে কিংবা হবে বলে আঁচ করল সে। নিজেকে প্রস্তুত করতে সময় পেল না সুধাময়। তার আগেই প্রশ্ন এলো, 'তুমি কি চাইছ?'

'আমি? কিছুই না।'

'তাহলে আমার স্বাধীনতায় তুমি চোরের মতো নাক গলাচ্ছ কেন ?'
'কি বলছ ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'
'ন্যাকামি করো না। তুমি জয়কে পছন্দ করো না, সে আমাকে ফোন করুক তা চাও না। কিন্তু আই অ্যাম নট ইওর স্লেভ।'
'আমি ব্যাপারটা বুঝতেই পারছি না।'
'সকালে আমি যখন বাথরুমে ছিলাম তখন তুমি জয়ের টেলিফোন ধরোনি ? ছি ছি ! না ডেকে দেবে নাই দিলে, ভদ্রতা করে তো দুটো কথা বলতেও পারতে। সে তিনবার রিং করেছে আর তিনবার তুমি রিসিভার তুলে নামিয়ে রেখেছ। তুমি কি ভাব আমি জয়ের সঙ্গে প্রেম করছি ? ফুঁসে উঠল অমলা। ওর মুখ থমথম করছিল।
'আস্তে কথা বল। ও ঘরে বাচ্চারা আছে। অমলা, তুমি ভুল করেছ। আমি কারো ফোন রিসিভ করিনি। জয়ের টেলিফোন অন্য জায়গায় যেতে পারে। টেলিফোনে তো এইসব বিভ্রাট লেগেই আছে।'
'থাকুক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। আমি বাথরুমে থাকার সময় দুবার রিঙ হয়েছিল। দ্যাটস ট্রু। তুমি জয়কে দেখতে পার না। জয়ের সব কিছুই তোমার কাছে খারাপ।'
'ঠিক। আই ডোণ্ট লাইক হিম। একটা ব্যাচেলার ছেলে দিনের পর দিন একটার পর একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে যাচ্ছে, এটা আমি পছন্দ করি না। তুমি বলবে জয় তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে কারণ সে ললিতা সম্পর্কে ইণ্টারেস্টেড। বেশ, তাহলে সে আমার সঙ্গে কথা বলে না কেন ? আমাকে এ্যাভয়েড করে কেন ? অমলা, যেদিন তুমি জয়ের জন্য বিপদে পড়বে সেদিন এইসব কথার মর্ম বুঝতে পারবে।'
'চমৎকার। আমার ভালো আমি বুঝতে পারব। কিন্তু তুমি স্বীকার করবে না টেলিফোনের ব্যাপারটা ?' সরাসরি তাকাল অমলা।
'প্রশ্ন ওঠে না। কারণ আমি জানি না।'
'তাহলে আই মাস্ট আস্ক টিনি অ্যাণ্ড বকুল। নিনি তখন স্কুলে।'
'বকুল তো টেলিফোন ধরে না।'
'তাই ? গরিব মেয়ে দেখলেই তোমার হৃদয় বিশাল হয়ে যায়। টেবিল থেকে প্রায়ই আমার রাখা খুচরো পয়সা সরে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই নিনি টিনি নিচ্ছে না। সুধাময় হাসল, 'গতকাল আমি একটা আধুলি নিয়েছিলাম। তোমাকে বলার কথা খেয়াল ছিল না। ওয়েল, কথাটা উঠল বলেই বলছি। জয়কে তুমি বিশ্বাস করো না।' সুধাময় বাথরুমে ঢুকে গেল।
কথা এখন বন্ধ নয়। কিন্তু সম্পর্কের মধ্যে শ্যাওলা জমেছে মারাত্মক। সুধাময় বিশ্বাস করে অন্য পুরুষ সম্পর্কে অমলার তেমন আসক্তির প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার অভ্যাস আছে ওর। বিশেষ করে কেউ যদি মন ভেজাতে পারে তাহলে পরোপকারের নেশা চেপে যায় ওর মাথায়। সেইটাই শেষপর্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়। অমলা যতক্ষণ একটা ধাক্কা না খায় ততক্ষণ তাকে

অপেক্ষা করতেই হবে। এখন ধাক্কাটা কি ধরনের হবে সেইটেই কথা। জোর করে অমলার ওপর কিছু চাপাতে চায় না সে।

রোজ অফিসে যাওয়ার সময় বিনিকে নিয়ে বের হচ্ছে সুধাময়। বেরুবার সময় বিনির পরনে পোশাক থাকে। চিড়িয়াখানায় ঢোকার আগে সেটা খুলে নেয় সুধাময়। প্রথম প্রথম বিনি আপত্তি করত। এখন মেনে নিয়েছে। সুধাময়ের অফিসে কিছুক্ষণ সময় কাটায় বিনি। তারপর চিড়িয়াখানার কর্মীদের সঙ্গে চারধারে টহল মারে। ওর ব্যবহারে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে সে। কর্মীরা তো বটেই, দর্শকরা বিনিকে দেখে উল্লসিত। মানুষের নানান ভঙ্গি নকল করে তাদের মজা দেয় সে। বাঘ সিংহ সম্পর্কে তার প্রাথমিক ভয় একটু একটু করে দূরে হয়েছে। হরিণদের ঝকে গেলে খুব খুশি হয় বিনি। ধপ করে রেলিং টপকে একটা বাচ্চা হরিণের পিঠে উঠে বসে। বাচ্চাটা ওকে নিয়ে ছোটে আর প্রাণপণে আঁকড়ে থাকে বিনি তাকে। এইটে ওর নিত্যকার খেলা। মাঝে মাঝে শিম্পাঞ্জি-দের ডেরায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। এখন তাকে দেখে শিম্পাঞ্জিরা সরে যায় না বরং কৌতূহলভরে দেখে। ওর বাবা অবশ্য নির্লিপ্ত। বিনির দিকে ফিরেও তাকায় না।

এর মধ্যে বাড়িতে একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটেছে। অমলা আবিষ্কার করেছিল নিনি এবং টিনির গালে মুখ ঘষে বিনি। এবং বিনির মুখে প্রাকৃতিক গন্ধ থাকায় সেটা কারো পছন্দ হবার কথা নয়। অমলা একটা টুথব্রাশ আনিয়ে বকুলকে বলেছিল ওর দাঁত মেজে দিতে। বিনি রোজ নিনি টিনিকে ব্রাশ করতে দেখে দুবেলা। খুব দ্রুত সে পোক্ত হয়ে গেল এই অভ্যাসে। ঘটনাটা জানত না সুধাময়। রবিবারে বেসিনের ওপর বসে বিনি ব্রাশ করছে দেখতে পেয়ে চোখ চড়কগাছ হয়েছিল তার। বকুলকে ডেকে বকাবকি করার পর ঘটনাটা জানতে পেরেছিল। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আর দেরি নয়, বিনিকে জলদি ফিরিয়ে দিতে হবে খাঁচায়।

নিনি টিনি জানছে বিনি বাবার সঙ্গে রোজ তার মাকে দেখতে যায় এবং বিকেলে ফিরে আসে। শুধু শনি-রবিবার ওকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায় না সুধাময়। ওই দুটো দিন বাচ্চাদের সঙ্গে ইচ্ছে করেই থাকতে দেয় সে। এর মধ্যে মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছে বিনির। সেদিন কাউকেই ঘর থেকে বেরুতে দেয় নি সুধাময়। বিনিকে নিয়ে গিয়ে ওর মায়ের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ দূরত্ব রেখে দুজন দুজনকে দেখেছিল। সুধাময়ের ভয় ছিল বিনি যদি আক্রান্ত হয় তাহলে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। কিন্তু মা শিম্পাঞ্জিটা কোনোরকম বদমেজাজ দেখাল না। প্রথম ফাঁড়া কাটল।

এখন প্রতিদিন বিনিকে শিম্পাঞ্জিদের ডেরায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, শুধু ওর বাবাকে ওইসময় পৃথক রাখা হয়। সুধাময় জানে না সে বিনিকে দেখলে কি রকম ব্যবহার করবে। মানুষের খাবার খেয়ে এবং মানুষের সংসারে মানুষ হয়ে বিনি দ্রুত বড় হয়ে উঠেছে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের কর্তা এখন তাকে দেখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হতে পারে। অতএব এই শেষ ধাপটুকু যদি বিনি

স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে যায় তাহলে আর সুধাময়ের কোনো দুশ্চিন্তা থাকছে না। যদিও সুধাময় লক্ষ্য করেছে ডেরায় ঢুকে বিনি অন্য পাঁচটা শিম্পাঞ্জির মতো আচরণ করছে না। খেয়াল হলে কিছু ধরে দোল খায়, বাকি সময় সঙ্গিদের হাবভাব লক্ষ্য করে। ওই সময় তাকেই একজন দর্শক বলে মনে হয়। এই অপরিচয়ের আড়াল দূর হতে সময় লাগবে। বিকেলে যখন ফেরার সময় হয় তখন একবার ডাকলেই বিনি ছুটে চলে আসে এবং তার আসাটা অন্যদের মনে হয় অপছন্দ। বাড়িতে ফিরলেই দামাল হয়ে ওঠে বিনি। যেন এতকাল বিদেশে ছিল, ঘরে এল। টিনির সঙ্গে ছুটোছুটি, বারংবার বকুলের ঘরে যাওয়া এবং যে কোনো উপায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পালা চলে বেশ কিছুক্ষণ। এইটে কিছুতেই কমাতে পারছে না সুধময়। বিনির যে এই বাড়ির প্রতি মায়া পড়ে গেছে, সে নিজেকে আলদা ভাবতে পারে না তার একটা উদাহরণ গত রবিবারে ঘটেছে। বাহিরের দরজাটা খোলা রেখে সুধাময় ছাদে গিয়েছিল এ্যান্টেনা ঠিক করতে। আগের রাত্রের ঝড়ে সেটা ঘুরে গিয়েছিল। এইসময় একটি লোক ঘরে ঢোকে। লোকটিকে পাঠিয়েছিল খবরের কাগজওয়ালা। সে নিজে না এসে লোকটার হাতে বিল দিয়েছিল। বাইরে থেকে ডাকাডাকি না করে লোকটি ঘরে ঢুকে ডাকতেই বিনি বেরিয়ে এসেছিল। বিনিকে দেখে সে ভয় পেয়ে পেছন ফিরতেই সে লাফিয়ে লোকটিকে আঁকড়ে ধরে হাঁ করে। কামড় খাওয়ার ভয়ে লোকটি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অমলা না-বেরুনো পর্যন্ত তাকে ছাড়ে না বিনি। অমলা লোকটিকে খুব ধমক দিয়েছে না বলে ঘরে ঢোকার জন্যে। বিনি যে না কামড়ে শুধু ভয় দেখিয়ে ধরে রেখেছিল এতে তার খাতির বেড়ে গিয়েছে অমলার কাছে। সুধাময় অনেকক্ষণ বিনির দিকে তাকিয়েছিল। তাকে বাড়ি পাহারা দেবার শিক্ষা কখনও দেওয়া হয় নি। অথচ কি করে আপনপর পার্থক্য ঠিক করে সে পাহারা দেবার কাজটা করল। অমলা গজগজ করেছিল, 'দরজা খুলে হুট করে চলে যাওয়া হলো। মতলববাজ লোক এলে বিনি না থাকলে যে কি হত!'

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে সুধাময় ঠিক করল আগামী সোমবার বিনিকে তার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। তার মা বিনিকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না তার কারণ ডাক্তারের মতে, বিনির মায়ের শরীরে সন্তান এসেছে। প্রথমবারের অভিজ্ঞতা তার কাছে করুণ। এখন তার শরীরে যৌবন পূর্ণমাত্রায়। অতএব মাতৃত্ব যাতে সুষ্ঠুভাবে অর্জন হয় এই নিয়েই সে বুঁদ হয়ে আছে। বিনিকে সে চিনতে পেরেছে কি পারে নি সেটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু বিনি তার কোনো ক্ষতি করবে না টের পাওয়ার পর আর তাকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না সে। বিনির বাবা যদি একটু সহনশীল হয় তো রক্ষে।

শনিবার বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখল টিনি নিনি আর বিনি চুপচাপ বসে আছে। নিনির চোখমুখ গম্ভীর। তাকে দেখে ওরা যেভাবে উচ্ছ্বাস দেখায় আজ তা হলো না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, রামগড়ুরের ছানা কেন আজ সবাই ?

নিনি মুখ ফুলিয়ে বলল, 'মা খুব বকেছে। বকুলকে মেরেছে।'

'মেরেছে কেন ?' সুধাময় অবাক। অমলা বকাবকি করে বটে কিন্তু কখনও

গায়ে হাত তোলে না। টিনি বলল, 'জয় আঙ্কল এসেছিল। তাল পলেই মা লেগে গেল?'
সুধাময় আর ওদের সঙ্গে কথা না বলে ভেতরে ঢুকল। এখন বিকালের ছায়া ঘন। শোওয়ার ঘরের জানলা বন্ধ থাকায় সেখানে পাতলা আঁধার নেমেছে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিল অমলা। সুধাময় আলো জ্বালতেই বলল, 'পুলিশে ফোন কর।'
'পুলিশ কেন?' সুধাময় হকচকিয়ে গেল।
'পাঁচ হাজার টাকা বকুল আজ বাড়ি থেকে সরিয়েছে।'
'পাঁচ হাজার টাকা! পাঁচ হাজার টাকা ও কোত্থেকে পেল?'
'আমি তুলে এনেছিলাম সকালে ব্যাঙ্ক থেকে।'
'তুলে এনেছিলে মানে? খামোকা অত টাকা তুলতে যাবে কেন?'
'টাকাটা আমার, আমি যা খুশি করতে পারি।' উত্তেজিত হলো অমলা, কিন্তু সেই টাকাটা বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে। এটা বকুল ছাড়া আর কারও কাজ নয়।'
সুধাময় স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'কোথায় ছিল টাকাটা?'
'বলছি তো বাড়িতেই।'
'পুলিশকে তো বলতে হবে। কোথায় রেখেছিলে?'
'আমি একটা লম্বা খামে একশ টাকার নোটগুলো ভরে জয়কে দিয়েছিলাম। জয় সেটা সোফায় ওর পাশে রেখেছিল। মাঝখানে টেলিফোন করতে আমি উঠে-ছিলাম। আর জয় সেই সময় বাথরুমে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে খামটা নেই।' বলতে বলতে এবার কেঁদে ফেলল অমলা।
'বকুল কি করে জানবে ওই খামে টাকা আছে?'
'আমি যখন নোটগুলো গুনে খামে ঢোকাচ্ছিলাম তখন বকুল চা দিতে এসেছিল। অত্যন্ত বদমাস মেয়ে। মেরেছি, ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছি তবু মুখ খুলছে না। জয়ের কাছে আমার মুখ দেখানোর উপায় রইল না।'
'বকুলের জিনিসপত্র দেখেছ?'
'হ্যাঁ। কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। যারা চুপ করে থাকে, মুখ গুঁজে কাজ করে তারাই হাড়ে হাড়ে শয়তান হয়। তুমি থানায় ফোন কর।'
সুধাময় এবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল, 'জয় কি টাকা নিতেই এসেছিল?'
'হ্যাঁ। গতকাল হঠাৎ আমাকে ফোন করে টাকাটার কথা বলে।'
'আর তুমি টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনলে। কি জন্যে টাকা চাইছিল জয়? ধার?' সুধাময়ের গলায় একটু ঝাঁঝের মিশেল।
'জয় আমার কাছে ধার চাইবে, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?'
'কিন্তু আমি জানতে চাইছি তুমি জয়কে কেন টাকা দিচ্ছিলে?'
'আমি বলব না। ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'
'অমলা তুমি খুব বাড়াবাড়ি করছ। আফটার অল আমরা স্বামী-স্ত্রী। আমাকে লুকিয়ে তুমি বাইরের লোকের সঙ্গে রিলেশন বিল্ড করতে পার না। সেটা

অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকতা। এরকম হলে উই কান্ট স্টে টুগেদার।'

'কি বললে? বিশ্বাসঘাতকতা? ললিতা যখন তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলে তখন আমি তোমার জবাবদিহি চাই? ছিঃ তুমি এত নীচ? জয় আমার বন্ধু বলে তুমি সন্দেহ করছ! ঠিক আছে, যা ভালো বোঝ তাই কর।'

'বন্ধু! চমৎকার।'

'ইয়েস? আমি স্ত্রী সেটাই শেষ কথা নয়, আমি মানুষ, এটাই শেষ কথা।'

'বেশ তুমি মানুষ হয়েই থাক, আমাকে জ্বালিও না।'

সুধাময় দ্রুত পা ফেলে নিচে নেমে এলো। বকুলের ঘরের দরজা বাইরে থেকে শেকল টানা। এক ঝটকায় সেটাকে খুলে ঘরে পা দিতেই দেখল বকুল দুহাতে মুখ ঢেকে উবু হয়ে বসে ফোঁপাচ্ছে। একটু উষ্ণ গলায় সুধাময় জিজ্ঞাসা করল, 'তুই টাকাটা নিয়েছিস? সত্যি কথা বল।'

খুব দ্রুত মাথা নাড়ল বকুল ওই অবস্থায়। এরপর আর কি করতে পারে সে। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে ও ভারি বুকে সিঁড়ি ভাঙছিল। তার রোজগার ভালো কিন্তু তাই বলে পাঁচ হাজার টাকা হারাবার সংগতি তার নেই। অমলা বলছে এটা তার টাকা। কিছু টাকা অবশ্য ওর বাবা ওকে দিয়েছিলেন। এটা যদি সেই টাকাও হয় তবু তারই বাড়ি থেকে ওটা উধাও হওয়া কখনই কাম্য নয়। অমলার সঙ্গে ধীরে একটা ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। কেন এটা হচ্ছে সেটা তার বোধগম্য হচ্ছে না। অমলা অবশ্য কারো সঙ্গে মানসিক সম্পর্কে সম্পর্কিত, এটাও সে কল্পনা করতে পারে না। অথচ তারা একমত হতে পারছে না। অমলার অতি-আধুনিকতাই হয়তো এর কারণ।

সুধাময় ঠিক করল থানায় ফোন করবে। পুলিশ যা করার তাই করুক। সে শোওয়ার ঘরে ঢুকতে যেতেই বিনিকে দেখতে পেল। বিনি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখেই ছুটে গেল ভেতরে। ভঙ্গিটা অস্বাভাবিক। সুধাময় বাচ্চাদের ঘরে ঢুকে দেখল বিনি ততক্ষণে বেবিকটে উঠে বসেছে। তাকে দেখা-মাত্র বিনি মুখে বিচিত্র শব্দ করতে লাগল। সুধাময় বেবিকটের কাছে এগিয়ে যেতেই বিনি খামটা উঁচিয়ে ধরল। সুধাময় পাথর হয়ে গেল। এটা কি অমলার খোয়া যাওয়া খাম?

হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে মুখ খুলতেই টাকাগুলো দেখতে পেল। ততক্ষণে বিনি তার কাঁধে উঠতে দেরি করে নি এবং ক্রমাগত মুখে আওয়াজ করে তুলেছে। সুধাময় একটু রাগত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা তুই চুরি করেছিলি?'

শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। সুধাময় ভেবে পাচ্ছিল না বিনি কি করে এই খামটা সরাল। ধরা যাক, ঘরে যখন কেউ ছিল না তখন সে এটাকে সরিয়েছে। কিন্তু এত জিনিস থাকতে সে খামটাকে সরাবে কেন? আজ অবধি তাকে কোনো জিনিস লুকিয়ে রাখতে দেখা যায় নি। বিনির পক্ষে নিশ্চয়ই টাকার মূল্য বোঝা সম্ভব নয়।

খামটাকে পকেটে নিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকতেই টেলিফোন বাজল। সুধাময়ের মনে পড়ল অমলার সেই অভিযোগের কথা। তার মাথায় আর একটা চিন্তা

চলকে উঠল। সে দ্রুত বিনিকে মাটিতে নামিয়ে টেলিফোনের দিকে হাত তুলে ইশারা করল। বিনি খুব খুশি হলো হুকুম পেয়ে। নাচতে নাচতে টেবিলটার কাছে গিয়ে রিসিভার তুলল বিনি। এবং সুধাময় কিছু বলার আগেই ওটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখল। বোঝা গেল শব্দটাকে থেমে যাওয়া বিনি পছন্দ করছে না। ওটা নিস্তব্ধ হতেই বিনি বোকার মতো তাকাতেই হো হো করে হেসে উঠল সুধাময়। অমলা অপলক দৃষ্টিতে দেখছিল ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হচ্ছে ?'

চেয়ারে বসে হাসি থামাল সুধাময়, 'সেদিন তোমার টেলিফোনের রহস্য আজ সমাধান হলো। ওটা বিনিই করেছিল।'

'কি কাণ্ড! জরুরি কোনো ফোন এলে আমরা পাব না।' শিউরে উঠল অমলা।

'তা অবশ্য। তবে এক্ষেত্রে ওর ক্রিয়াকাণ্ডের শিকার হচ্ছে জয়।'

'মানে।'

'আমি বলছি না বিনি জয়কে অপছন্দ করে। তবে কেউ এ বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে যায় সেটা বোধহয় ও চায় না। তাই কাগজওয়ালার লোকটাকে ভয় দেখিয়েছিল—।' কথা বলতে বলতে আবার টেলিফোনটা বেজে উঠল। সুধাময় উঠে রিসিভার তুলতে যেন বিনি হতাশ হলো। সুধাময় হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে ললিতার গলা পেল, 'আপনাদের ফোনটা কি খারাপ ?

'কেন ?'

'রিঙ হয়েই কেটে গেল। অমলা কোথায় ?'

'দিচ্ছি।' সুধাময় রিসিভার রেখে বলল, 'তোমার ফোন।'

অমলা উৎসুক চোখে তাকাল। রসিকতা করতে গিয়ে সামলে নিল সুধাময়।

'কে ? ও কি ব্যাপার ? না, কিছু শুনিনি। সত্যি ? জয়কে অ্যারেস্ট করেছে ? উঃ। পাঁচ হাজার।' রিসিভার নামিয়ে রেখে পাথর হয়ে গেল অমলা। লক্ষ্য করছিল সুধাময়, জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে।'

'জয়কে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। ও একটা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নামে অনেক টাকা তুলেছিল যার কোনো অস্তিত্ব নেই। ললিতার দশ হাজার গেছে।' এই মুহূর্তে অমলাকে রক্তশূন্য মনে হচ্ছিল। সে নিজের মনে বলল, 'জয় মিথ্যে কথা বলেছে আমাকে। ওর কাছেই টাকাটা ছিল। চুরি হয়ে গেছে বলে আমাকে ধাপ্পা দিয়েছে।'

সুধাময় বলল, 'তাই ? সেটা করবে কেন ? ট্রাস্টের নাম করেই তো টাকাটা মেরে দিতে পারত সে। অন্য লোকের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল।'

অমলা এগিয়ে এলো, 'আমি একটুও লোক চিনতে পারিনি। তুমি কিছু মনে করো না। আমি খামোকা রেগে গিয়ে তোমার সঙ্গে রাফ ব্যবহার করেছি।'

'দ্যাটস নাথিং, ঠিক আছে।'

'আমার খারাপ লাগছে বাবার টাকাটা নষ্ট করলাম বলে। ভেবেছিলাম, ভালো কাজে লাগবে।' অমলা ঠোঁট কামড়ে ঘুরে দাঁড়াতেই সুধাময় তাকে ডাকল।

'দাঁড়াও।'

অমলার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছে।

'এই নাও তোমার খাম। ওতে কত টাকা আছে গুনে দ্যাখ।' বিছানার ওপর খামটা ছুঁড়ে দিল সুধাময়। আর চমকে উঠল অমলা। হাত বাড়িয়ে খামটা তুলে দেখল। তারপর অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় পেলে ?'

'বকুল নেয় নি। এটাই জানো।'

কথাটা শেষ হওয়ামাত্র অমলা এগিয়ে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল। তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। সুধাময় কিছুক্ষণ ওকে সময় দিল শান্ত হবার। তারপর বলল, 'অমলা, কখনও আমাকে ভুল বুঝতে যেও না। আমি তোমার বন্ধু।'

'ক্ষমা কর। আমি অন্যায় বলেছি।'

'ঠিক আছে। বিনি আমাদের দেখছে। খামটা ওই সরিয়ে বেডিকটে রেখেছিল। এ বাড়ি থেকে ওটা বেরিয়ে যাক, তা বোধহয় বিনি চায় নি।'

সুধাময়ের কথা শেষ হওয়ামাত্র অমলা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর দৌড়ে বিনিকে তুলে জড়িয়ে ধরল, 'বদমাইস, পেটে পেটে এত বুদ্ধি। ইস্, দাঁত মাজসনি।'

সুধাময় হাসল, 'গন্ধটা থাক অমলা। ওর জাতভাই তাই পছন্দ করে।'

আজ বিনির এই বাড়িতে শেষদিন। নিনি এবং টিনি অনেক বায়না ধরেছিল যাতে ওকে রাখা যায়। সুধাময় ওদের বুঝিয়েছে এতে বিনির ক্ষতি হবে। ও আর শিম্পাঞ্জি থাকবে না, মানুষও হবে না। ঈশ্বর যাকে যেমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন তাকে তেমনই থাকতে দেওয়া উচিত। আর বিনিতো বেশিদূর যাচ্ছে না। মন খারাপ হলেই ওকে চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখে আসা যাবে। তাতে ভোলেনি দুইজন। বকুলকে জানেনা সুধাময়। তার কাছে অমলা অনেকরকম-ভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে। একটু স্পেশ্যাল খাতির করছে এখন। মেয়েটাও সব ভুলে বিনির সঙ্গে লেপ্টে আছে। এমনকি অমলাও চাইছিল বিনি থেকে যাক। এতবড় উপকার বোধহয় সে ভুলতে পারছিল না। রাত্রে আজ অমলা তার বুকে মাথা রেখেছিল, তখন সুধাময় ঠাট্টা করে বলেছিল, 'বিনি বোধহয় আমাদের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিল।'

মেয়েরা মচকায় কিন্তু ভাঙে না। অমলা বলেছিল, 'তুমিই দূরে সরেছিলে, আমি না।'

আজ সবাই মিলে চিড়িয়াখানায় এল। টিনি ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আর বিনি বকুলকে জড়িয়ে বসেছিল চুপটি করে গাড়িতে। জামাকাপড় ছাড়িয়ে বিনিকে আজ ওর বাবার ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। তখন সুধাময়ের বুকে উত্তেজনা। বিনির বাবা মুখ তুলে ছেলেকে দেখল। তারপর একটু সরে বসল। ঢোকার আগে বিনিকে একটা কলা খাইয়েছিল নিনি। আর একটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল অমলা। দেখা গেল নিরাসক্ত বাবার হাতে বিনি কলা তুলে দিচ্ছে। শিম্পাঞ্জি এবার মুখ তুলে বিনিকে দেখল। তারপর কলার খোসা ছাড়াল। সুধাময় বুঝল বিনি গৃহীত হলো।

চিড়িয়াখানা থেকে বাচ্চাদের ফিরিয়ে আনতে অনেক বোঝাতে হলো। বাড়িটা আজ খুব ফাঁকা লাগছে। রাত্রে খাওয়ার পর টিনির কান্না শুরু হলো। বিনি এখন কি করছে। তাকে গল্প বলবে কে? গল্প না শুনলে বিনির ঘুম আসে না। অমলা দুজনকে অনেক বোঝাল। শেষ পর্যন্ত টেলিফোন করতে হলো সুধাময়কে। নাইটগার্ড শিম্পাঞ্জির ব্লক থেকে ঘুরে এসে জানাল বিনি অন্যান্য শিম্পাঞ্জিদের সঙ্গে চমৎকার আছে। কথাটা বাচ্চাদের জানাতে তারা একটু শান্ত হল। অনেক রাত্রে সবাই ঘুমুলে সুধাময় এবং অমলা একটা কান্না শুনতে পেল। ওটা আসছে নিচের ঘর থেকে। নিঃশব্দে ওরা নিচে নামল। বকুলের ঘরের দরজা ভেজানো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। অমলা তাকে ডাকতে যাচ্ছিল কিন্তু সুধাময় তাকে ইঙ্গিত করল চুপ করতে। বকুলের কান্নার সঙ্গে শব্দ মিশছে। কাঁদতে কাঁদতে গল্প বলছে সে। ডাইনী শয়তানকে বলে রাজপুত্রকে ছাগল করে দিয়েছে। এবার ফোঁপানি সাক্রামিত হল অমলার গলায়। দরজা খুলে সোজা ভেতরে ঢুকে বকুলের হাত ধরল, 'ওঠ, চল, ওপরের ঘরে শুবি চল। বিনিদের ঘরে অনেক জায়গা আছে।' সামান্য স্নেহ পেয়ে মেয়েটা কেঁদে উঠল সজোরে।

সুধাময়ের ঘুম ভাঙল কচি হাতের ধাক্কায়। চোখ মেলে সে দেখল টিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে। ওপাশে নিনি আর দরজায় বকুল। টিনি বলল, 'বাবা আমাদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে চল। বিনিকে দেখব।'

'সে কি! এই সকালে।'

এবার নিনি বলল, 'ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, বাবা।'

অমলা উঠে পড়েছিল আগেই, বলল, 'যাওনা, একটু ঘুরে এসো।'

বাস্কেটভর্তি ফল এবং কেক নিয়ে ওরা চিড়িয়াখানায় এলো। তখন সবে দরজা খুলেছে কিন্তু দর্শক নেই। ওরা শিম্পাঞ্জিদের ব্লকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কাউকে দেখতে পেল না। টিনি এবং নিনি চিৎকার করল, 'বিনি, বিনি!' কয়েকবার ডাকার পর বিনিকে দেখা গেল। খুব অলস পায়ে সে রেলিং-এর ওপাশে দাঁড়াল। সুধাময়ের মনে হলো এক রাত্রেই বিনির চেহারায় সভ্যতার যে পালিশ ছিল সেটা মুছে গেছে। টিনি বলল, 'কেমন আছিস বিনি?' বিনি চুপ করে রইল। নিনি জিজ্ঞাসা করল, 'কাল খেয়েছিলি?' বিনি উত্তর দিল না। টিনি বলল, 'আমার কষ্ট হচ্ছে যে!' বলে কেঁদে ফেলল। এবার বিনি হাত বাড়িয়ে টিনির কাঁধে রাখল।

সুধাময়ের নিজেরও কষ্ট হচ্ছিল। সে দ্রুত বাস্কেট থেকে ফল আর কেক বের করে রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে ভেতরে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফল তুলে নিয়ে খেতে লাগল বিনি। কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর সুধাময় বলল, 'এবার চল। আমরা না গেলে বিনির বন্ধুরা এগুলো খেতে আসবে না।'

যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, তবু সবাই পা বাড়াল। নিনি বলল, 'বিনির কষ্ট হচ্ছে না, না বাবা।'

সুধাময় জবাব দিল না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বকুল তখনও খাঁচার সামনে

দাঁড়িয়ে। ডাকতে গিয়েও থেমে গেল সুধাময়। বিনি হাত বাড়িয়ে কেক দিতে চাইছে বকুলকে, বকুল মাথা ঝাঁকাচ্ছে, কিছুতেই নেবে না সে। শেষ পর্যন্ত বকুলের একটা হাত ধরল বিনি, অন্যহাতে কেক গুঁজে দিল। তারপর লাফাতে লাফাতে চলে গেল ভেতরে। হতভম্ব বকুল কেক নিয়ে এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

এইসময় নিনি বলল, 'জানো বাবা মা না আজ বকুলকেও কেক দিয়েছে। টিনি বলল, 'বিনি তো দ্যাখেনি, তাই।'



বেঁচে থাকা

ট্র্যাংগুলার পার্কের সামনে অবনীভূষণ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। আশেপাশের দোকানগুলো বন্ধ আছে। যে দোকানটায় ও তড়কা রুটি খায় সেটাও ঝাঁপ টেনে দিচ্ছে, চেয়ারগুলো টেবিলের উপর পা তুলে শোয়ানো। অতএব আজ রাত্রে খাওয়া হলো না। অবনীভূষণ অবশ্য খাওয়ার জন্যে তেমন কোনো কিছু বোধ করছিল না। একটু আগেই শেষ বাসটা গড়িয়াহাটের দিকে গেছে। সেটা থেকেই নামল অবনী।

বসন্ত রায় এখন চুপচাপ। ফুটপাত ধরে হাঁটছিল অবনী। আর একটা দিন কাটলো। কলেজ স্ট্রীট থেকে রাত দশটায় বেরিয়ে হেঁটে নন্দন রোড। তারপর এই শেষ বাস-এর ভিড়ে মিলে মিশে আসায় একটাও পয়সা খরচ হলো না। অবশ্য দশ পয়সার রিস্ক ছিল। ওটা নিতেই হয়। কাঁহাতক আর হাঁটা যায়। রাসবিহারীর মোড় থেকে এই তিনটে স্টপেজ অবশ্যই ফাউ।

আর একটা দিন কাটলো, অথচ কিছুই হলো না পরমেশটার কথা বুলি হয়ে যাচ্ছে ইদানীং। ওকে আর বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু না করেও উপায় নেই। লাইনে নাম ডাক আছে। মোটর সাইকেলটা কভার করেছে সম্প্রতি। আজকের অপারেশনে পরমেশ ওকে এড়িয়ে গেল। ঠিক হ্যায়! অবনী চারমিনারটা ছুঁড়ে ফেলল। এই সময় ও কুকুরগুলোর ডাক শুনতে পেল। কশো কুকুর আছে এ পাড়ায়? শাল'রা রোজ রাত্রে ওকে দ্যাখে, অথচ। অবনীর চারপাশে কোনো লোকজন নেই অথচ সম্মিলিত সারমেয় চীৎকার ওকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ করল। এ পাড়ায় কোনো নেড়ি কুত্তা নেই। দামী কুকুরগুলো যারা চীৎকার করছে তারা কেউ রাস্তায় বেরুবে না। কিন্তু অরুণদার কাছে রিপোর্ট হয়ে যেতে পারে। তাহলে এখানকার আস্তানা থাউজেন্ড ভোল্ট হয়ে যাবে। প্রথমদিন অরুণদা বলেছিল, 'এখানে আসতে চাও, আমার আপত্তি নেই। আমার অফিস দশটা টু আটটা। এই টাইমটা অ্যাভয়েড করবে। আর ওপরের ফ্ল্যাটের বাড়িওয়ালা যেন কোনো কমপ্লেন না করে।' বাংলায় এম এ দেবার পর অরুণদার সঙ্গে আলাপ। তখন দু একটা গল্প লিখতো অবনী। আর অরুণদা একটা কাগজ করত। ব্যাস। অরুণদার এই অফিসটা শালা সি. আই-এর টাকায় চলে। কালচারাল ব্যাপার সব। মারো ঝাড়ু। অরুণদা অবশ্য ওকে স্নেহ টেহ করে। এমের পর তিনটে বছর ফিউজ হয়ে গেল। অরুণদা কি চেষ্টা করলে একটা চাকরি দিতে পারত না? আজ দেড়মাস এখানে আছে অরুণদার সঙ্গে দেখাই হয় না। অবশ্য এখন আর চাকরির জন্যে ওর কোনো নোলা নেই। কারণ বয়সটা থাউজেন্ড হর্স পাওয়ার নিয়ে ছুটছে। এজ লিমিট বার।

অরুণদার অফিসের সামনে ছোট বাগান। লম্বা লোহার গেট। ওপরে বাড়ি-

ওয়ালার ফ্ল্যাট। অবনী দেখল গেট বন্ধ। দশটায় তালা পড়ে। একবার চারপাশে চোখ বোলাল ও কোনো মানুষ বা রাউণ্ডের পুলিসের মুখ দেখতে পেল না। খাঁজে খাঁজে পা রেখে ও লোহার গেটটার উপর উঠতেই বাড়িওয়ালার কুকুরটা হাঁউমাউ করে উঠল। অবনী ধীরে সন্তর্পণে নেমে বাগানটা পেরিয়ে অরুণদার দেওয়া ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে অফিসের দরজা খুললো। আশেপাশে সমস্ত বাড়ি আলো নেবানো। এ পাড়ার লোকগুলো তাড়াতাড়ি বিছানায় যায়, আর তিন প্রহর রাত্রে যারা ফেরে তাদের গাড়ি আছে।

বিরাট হল ঘর। দেয়ালে দামী দামী ছবি। এ সব ছবির মানে বুঝতে পারে কি করে লোকে অবনীর বোধগম্য হয় না। ডিম লাইটটা জ্বালালো ও। অনেকগুলো ঘর। সব ঘরেই ছবি, ম্যাগাজিন। অবনী জমাপ্যান্ট ছেড়ে বাথরুমে গেল। সারা দিন ধরে হাঁটাহাঁটি। গেঞ্জি আণ্ডারওয়ারে বোঁটকা গন্ধ ছাড়ছে। দারুণ বাথরুম। মোজায়েক করা, শাওয়ার বাথটব সব আছে। অবনী বিবস্ত্র হয়ে শাওয়ার খুলে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকল। তারপর অরুণদার মার্গো সোপ দিয়ে গেঞ্জি আণ্ডারওয়ার কাচতে শুরু করল।

এখন রাত একটা। মেঝেতে শব্দ হচ্ছে গেঞ্জি কাচার। সাবানটায় ভালো ফেনা হয় না। শব্দটা একটু আস্তে করার চেষ্টা করল সে। দারুণ ফোর্সে শাওয়ার থেকে জল পড়ে। আগে যে মেসটায় সে ছিল সেখানে কল দিয়ে বাচ্চা ছেলের পেচ্ছাপের থেকেও সরু জল পড়ত। বড়লোকদের কেতাই আলাদা।

স্নানটান সেরে অফিস ঘরে এসে দুটো টেবিল জোড়া দিয়ে স্টোর রুমের কোণায় গোঁজা বিছানাটা নিয়ে এসে ভালো করে পাতল। এখন একটু ক্ষিদে ক্ষিদে পাচ্ছে। অবনী আর একটা চারমিনার ধরালো। ধরিয়ে অরুণদার বসার ঘরটায় ঢুকলো। দারুণ সাজানো। এই ঘরটা রাস্তার দিকে। কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরের আলো ঢোকে। অবনী অরুণদার রিঃলভিং চেয়ারে বসে দুটো পা ছড়িয়ে দিল টেবিলের উপরে। টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া একটা চিরকুট। অবনী পড়ল, 'টেলিফোনটা অফিসের জন্য।' তার মানে ? এটা কি অবনীকে উদ্দেশ্য করে ! কি বলতে চায় অরুণদা ! শালা ফরেন মানি নিয়ে অফিস, তার ফুটুনি ! খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠল অবনী। একবার ভাবল অরুণদার বাড়িতে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে এভাবে ইনসাল্ট করার কারণটা কি। ও রিসিভার তুলে ডায়াল করল। রিং হচ্ছে ওপাশে। কেউ ধরছে না। এখন রাত কটা ? দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল অবনী, একটা কুড়ি। নিশ্চয়ই অরুণদা ঘুমোচ্ছে। ওর বউটা যা মুটকী ! রিং হচ্ছে। অবনী চারমিনার টানতে টানতে শুনলো ওপাশে কেউ এসে রিসিভার তুললো। মেয়েলি গলা। ঘুম জড়ানো। 'হ্যালো, হ্যালো।'

অবনী দুবার হ্যালো শুনে বলল, 'কাল সকালেই যেন মালটা আসে, বুঝলেন !'

'মাল ! কিসের মাল !' ভদ্রমহিলার অবাক গলা।

'রসগোল্লা। এটা কি কে সি দাসের দোকান নয় ?'

'রং নাম্বার।' বলে ঘটাং করে লাইন কেটে দিলেন ভদ্রমহিলা। অবনী প্রাণ খুলে কিছুক্ষণ হাসলো তারপর আবার রিসিভার তুললো। কাকে ডায়াল করা যায় !

কোনো নাম না পেয়ে এমনি কয়েকটা নাম্বার ঘোরালো ও। এবার বেশ কিছু ক্ষণ অপেক্ষার পর একটি হেঁড়ে গলা ধরল, 'হ্যালো।'

অবনী বলল, 'ইয়েস, আপনার স্ত্রী কোথায় ?'

ওপারের গলায় বিস্ময়, স্ত্রী, কেন বলুন তো ?'

'দরকার, জরুরী দরকার। লালবাজার থেকে বলছি।'

'লালবাজার ? ও-ও তো বাপের বাড়িতে।'

'না সেখানে নেই।'

'নেই মানে ?'

'আপনি ইমিডিয়েটলি ডাফরিন হসপিট্যালে চলে যান। সিরিয়াস অবস্থা! হারি প্লিজ।' অবনী ফোনটা কেটে দিল। অবনী আন্দাজ করল লোকটা এখনই ডাফরিনে ছুটবে। এবং গিয়ে দেখবে ওটা একটা বাচ্চা হবার হাসপাতাল। লোকটার মুখের চেহারাটা তখন কেমন হবে ? হো হো করে হাসতে হাসতে অবনী উঠতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। একি হলো। অবনীর দুচোখে বিস্ময়। এত রাত্রে কোনোদিন ফোন আসে নি তো। নাকি ওর মতো কোনো পার্টি মজাকি করছে। রিসিভার তুলল ও, 'হ্যালো।'

'হ্যালো, আপনি কি করছেন কি ? কড়া গলার স্বর।

'মানে ?'

'মানে এত রাত্রে মেঝেতে কি আওয়াজ করছেন ? আপনার মনে রাখা উচিত এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, আমি কমপ্লেন করবো।' ওধারে গলা উত্তেজিত।

শালা বাড়িওয়ালা। অবনী একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর কাটা কাটা গলায় বলল, 'আপনি কি ড্রাঙ্ক ?'

'মানে ?'

'রং নাম্বার!' ফোনটা নামিয়ে রেখে পা টিপে টিপে এসে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ল অবনী। আঃ। আরাম। আর একটা দিন কাটলো অবনীভূষণের। আগামীকাল কিছু বিজনেস আছে। নাটে নাটে লাগলে বাড়িওয়ালার থোড়াই কেয়ার। মনে মনে গুনগুন করতে লাগল, 'শালার চামড়ায় বানাবো ঢাক, তেরে কেটে তাক। অবনীভূষণ ঘুমিয়ে পড়ল।

উল্টোডাঙ্গার তিন নম্বর লাল বাড়িটায় পরমেশকে পেয়ে গেল অবনী। কাল রাত্রে খাওয়া হয় নি কিছু। আজ ঘুম থেকে উঠেই স্নানটান সেরে বেরিয়ে পড়েছে। বেরোবার সময় গেটে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা। লেক থেকে চেনবাঁধা কুকুরকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরছে। অবনী মুখোমুখি হতেই হেসে বলল, 'ভালো আছেন মেসোমশাই।' ভদ্রলোক দুটো ভ্রূ কুঁচকে ভেতরে ঢুকে গেলেন। অবনী মনে মনে একটা সুন্দর খিস্তি করে নিল। তারপর পাঞ্জাবী দোকানটা থেকে পেট পুরে খেয়ে উল্টোডাঙায় চলে এলো পরমেশকে ধরতে। এখন ওর পকেট খালি। পরমেশকে এখানেই পেয়ে গেল।

পরমেশ টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে লিখছিল, অবনীকে দেখে সরিয়ে নিল

কাগজপত্র। এই বাড়িটার মালিক মাড়োয়ারী। বহুত ব্যবসা আছে। নিচে কাঠের আড়ৎ। পরমেশ ওকে দেখে বাঁ চোখ কুঁচকে কি ভাবল তারপর বলল, যাক ভালই হয়েছে তুই এসে পড়েছিস।'

অবনী একটা চেয়ার টেনে নিল, 'কালকে তুই শালা আমাকে বাতেলা দিলি কেন?'

'বাতেলা? তোকে! ধ্যাৎ, ধ্যাৎ, ওসব ফালতু কাজ তুই করবি কেন? আমি তো তোকে জানি। পরমেশ হাসল।

'কাজটা কি ছিল?'

'ঐ আর কি! থ্রি-বি রুটের একটা স্টেট হাম্পু করতে হলো।

'কত মাল ছেড়েছে?'

'দুই। পাঁচটা সাকরেদ ছিল। হাতে কিছু থাকে না দিয়ে-থুয়ে।' পরমেশ নির্বিকার।

মনে মনে অবনী পরমেশকে জরিপ করল। হাতে কিছু না রাখার মাল পরমেশ নয়। শালা। কোনো রিস্ক ছিল না কাজটায়। আলিপুরের মোড়ে বাস থামিয়ে দুটো আওয়াজ দিলেই প্যাসেঞ্জাররা পালাবে। তারপর টিনটা উপুড় করে ট্যাঙ্কের মুখটা খুলে দিয়ে দেশলাই ছুঁড়ে দেওয়া। বাস। সিংজি নগদ পেমেন্ট করে। পার স্টেট বাস দুহাজার। পুলিস আসার আগেই পরমেশ নিশ্চয়ই পার্ক স্ট্রীটে বসে বিয়ার টানছিল। একটা স্টেট বাস পুড়লে দুহাজার খরচ, আসবে হাজার গুণ। আরও একটা প্রাইভেটের পারমিট পাবে সিংজি। শালা। অবনী দেখলো টেবিলের ওপর খবরের কাগজের ফাস্ট পেজে পোড়া বাসের ছবি।

অবনী বলল, 'আছিস ভালো। কিছু ছাড়ো এবার।'

'কত?'

'পাঁচ।'

'অসম্ভব। দুশো দিতে পারি। অ্যাডভান্স।' পকেট থেকে টাকা বের করল পরমেশ।

'অ্যাডভান্স কেন?'

'আজকের অপারেশনটার জন্যে। ভালো দাঁও আছে। আমি ভেবে দেখলাম তোকে নিয়েই করব। তেওয়ারীকে ও মাল আমি নিতে দেব না।' অবনীর সামনে দুটো একশ টাকার নোট রাখল পরমেশ।

'কাজটা কী?' অবনী টাকাটা পকেটে রাখল।

'তেওয়ারী তিন নম্বরের লাইনে আজ রাত্রে যাবে। কেন যাবে খবর পাইনি। এমনি যাবার মাল ও নয়। এ সব ব্যাপার লিক হলে অবনী—।' পরমেশ থামল হঠাৎ।

'বলতে হবে না।' হাসল অবনী, ওয়াগনের ব্যাপার নাকি গুরু।'

'না ওসব ব্যাপার না। তুই এক কাজ কর। একটা মাল ডেলিভারী আছে। আমিই যেতাম, তুই এসেছিস. ভালো হয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে ঠিক দশটায় গ্লোবের সামনে যাবি তেওয়ারীর লোক থাকবে ওখানে। বাঁ হাতে রুমাল

জড়ানো। তোকে দেখে রুমালটা খুলবে, আর বাঁধবে। মালটা দিয়ে চলে আসবি।'

'তেওয়ারীর লোক?'

'হ্যাঁ বস্। তেওয়ারী আমার বহুদিনের দোস্ত।' বলে পরমেশ টেবিলের নিচ থেকে ছোট এয়ার ব্যাগটা বের করে অবনীর সামনে রাখল। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পাঁচমাথার মোড়ে কফি হাউসের সামনে চলে আসিস।'

এয়ার ব্যাগটা নিয়ে অবনী ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায় গ্লোবের সামনে পৌঁছালো। এখন এ দিকটায় বেশী লোকজন নেই। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে ও গ্লোবের কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বেশ ভারী ব্যাগটা। ট্যাক্সীতে আসতে আসতে ও খুলে দেখেছে অন্তত গোটা কুড়ি গ্রেনেড আছে। কোথা থেকে যে পায় পরমেশ। আর এই সব অস্ত্র ও তেওয়ারীর হাতে তুলে দিচ্ছে যে তেওয়ারীকে আজ রাত্রে প্রয়োজন হলেই হাপিস করে দেবে পরমেশ, তাজ্জব ব্যাপার সব। এইজন্যই পরমেশকে গুরু বলতে ইচ্ছে করে।

অবনী চোখ রাখছিল রুমাল বাঁধা হাতে কেউ আসছে কি না। মিনিট তিনেক কাটলো। শালা এ অবস্থায় যদি পুলিস ধরে নির্ঘাত তিন বছর জেল। 'মারত্মক অস্ত্রসহ সমাজবিরোধী গ্রেপ্তার' খবরের কাগজের হেডিং হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে তো পরমেশই ওকে এখন ধরিয়ে দিতে পারে। একটু ঘাম জমলো ওর শরীরে। ঠিক এই সময় ওর চোখে পড়ল একটি ডাঁসা মেয়ে গ্লোবের ভিতরে ঢুকলো। বাঁ হাতের কব্জিতে রুমাল বাঁধা। ও একটু অবাক হল। এই মেয়েটা কি তেওয়ারীর লোক? ইম্পসিবল, হতেই পারে না। মেয়েটা রুমাল খুলছে আর বাঁধছে। এক একবার এদিক ওদিকে দেখছে। তেওয়ারীর রিক্রুট তো দারুণ জিনিস। অবনী এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। তারপর ফিসফিস করে বললো, 'চলুন'।

কপালে ভাঁজ ফেলল মেয়েটি 'মানে?'

'তেওয়ারী?' অবনী আস্তে করে কথাটা ছেড়ে দিল।

মেয়েটি হাসল, 'হ্যাঁ, দিন।'

'এখানেই নেবেন? চলুন না কোথাও বসা যাক।' অবনী উদার হলো।

মেয়েটি হাসল, আমার শুধু নিয়ে যাবার কথাই ছিল কিন্তু।'

'আমার শুধু দেবার। একটু অবাধ্য হই না, আপত্তি আছে?'

'বেশ চলুন। কোথায় বসবেন?'

অবনী মেয়েটিকে নিয়ে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকল। সলিড স্বাস্থ্য মেয়েটির। কথাবার্তা চটপটে। অবনীর পাশে বসল ও। অবনী একটা হাত মেয়েটির পেছনে চেয়ারের হাতলে রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কদ্দিন লাইনে?'

'লাইনে?' মেয়েটি চোখ তুলে দেখল অবনীকে, 'ও, তিন মাস।'

সব শালাই তাই বলে। মনে মনে ভাবল অবনী।

'ভালো লাগে?' অবনী গাঢ় করতে চাইল গলার স্বর।

'এই আরম্ভ করলেন তো। সেদিন এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ পেছনে ঘুরে

আলাপ করলেন। শুরুতেই আমি বললাম, 'দেখুন আমি কিন্তু প্রফেসনাল। শুনেই ভদ্রলোক চম্পট।'
'বাঃ তিনমাসেই বেশ কথা শিখে গেছেন তো। এরপর কত মাস কত হাজার মাস চলে যাবে দেখতে দেখতে।'
'মোটেই না। আমি বেশীদিন এ কাজ করব না।'
'কি নাম ?'
'বীথি।'
'আসল নামটা !'
'বীথি !'
অবনী একটা হাত এবার বীথির কাঁধে রাখল। বীথি জিজ্ঞাসা করল আপনার নাম ?'
অবনী হেসে পর্দা সরিয়ে বেয়ারাকে ডাকল, খাবার বলল, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'পরমেশ।'
'ও আপনি ?' মেয়েটির চোখ চকচকে হলো। আপনার কথা তেওয়ারীর কাছে শুনেছি।'
অবনীর হাত মেয়েটির গলায় নেমে এল। টগবগে স্বাস্থ্য মেয়েটির। অবনীর খুব ইচ্ছে হল মেয়েটার বুক ছুঁয়ে দ্যাখে।
'তুমি প্রফেসনাল না !'
'কেন ?' মেয়েটি হাসল।
'কত নাও ?'
'কেন যাবেন ?'
'যদি যাই।'
'বেশ তো মালটা ডেলিভেরী দিয়েই আমি ফ্রি।'
একটু আদর করল অবনী, 'কত নাও ?'
'পঁচিশ, আর ঘর ভাড়া পনের। পুলিসের ঝামেলা নেই। যাবেন ?'
'উম্‌ম্‌ আগে একটু গরম হই।'
'বাব্বা।'
'থাকো কোথায় ?'
'টালীগঞ্জে। বাড়ি ছিল পাকিস্তানে।'
'আবার পাকিস্তান কেন ? উম্‌ম্‌। বাবা আছে ?'
'হু।' মেয়েটি অবনীর কোলের কাছে সিটিয়ে এল। গদগদে ভাব। অবনীর মনে হচ্ছিল ও মরে যাবে।
তোমার মা দারুণ দেখতে না ?'
'অ্যাঁ আবার মেয়েকে ছেড়ে মাকে কেন ?'
'উম্‌ম্‌ তোমাকে দেখে। দারুণ দেখতে তুমি। দারুন জিনিস। উম্‌ম্‌। তোমার বাবা আছে তাহলে। কি করে। উম্‌।'
'বাবা। মেয়েটি হাসল, 'বাবা রাস্তায় রাস্তায় হাঁকে চা-ই-ই সি-ট্‌ কা-পড় চাই-

ই-ই। প্রায় অবিকল বৃদ্ধের গলা নকল করে মেয়েটি চীৎকার করে উঠল। থতমত খেয়ে গেল অবনী। বেয়ারাটা ছুটে এসে পর্দা ফাঁক করে দেখে সরে গেল। আর অবনীর পা থেকে মাথা অবধি চীৎকারটা পাক খেতে লাগল। ওর মনে হল একজন বৃদ্ধ কাঁধে সস্তা ছিট কাপড় ফেলে হাতে একটা লোহার সিক নিয়ে রোদজ্বালা দুপুরে গলিতে গলিতে ঘুরছে আর কুঁজো শরীর বেঁকিয়ে চীৎকার করছে, ছিট কাপড় চাই। আর তার মেয়ে ওর পাশে বসে গদগদে শরীরে বলছে 'চাই-মাংস-চাই।'

মেয়েটির চোখে বিস্ময়. 'কি হল!'

'কিছু না।' অবনী বলল, কিন্তু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ওর সমস্ত শরীর গুটিয়ে আসছিল, হঠাৎ ও বলল চলুন উঠে পড়ি।'

'কেন খাবেন না?'

'না। ভাল লাগছে না।'

'আমার সঙ্গে যাবেন তো!'

'আজ থাক।'

অবনী হাসল, 'আজ বোধহয় আর গরম হবে না।'

মেয়েটি অবাক চোখে কিছুক্ষণ দেখল তারপর ব্যাগটা তুলে নিল। অবনী বলল, 'সাবধানে যাবেন। ওতে কি আছে জানেন না বোধহয়।' মেয়েটি কোনো কথা না বলে গটগট করে বেরিয়ে গেল। অবনী বেয়ারাকে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল মেয়েটি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে এমনভাবে যাচ্ছে যাতে যে কোনো মুহূর্তেই কারোর সঙ্গে ওর ধাক্কা লেগে যেতে পারে। আর তারপরেই অবনী কিছুক্ষণ বিস্ফোরক বয়ে নিয়ে যাওয়া মেয়েটাকে দেখল। হঠাৎ তার মনে হল ব্যাপারটা খুব ছেলেমানুষী হয়ে গেল। তার ক্রিয়াকাণ্ডের পেছনে কোনো যুক্তি খুঁজে পেল না। শালা সব মানুষই তো ফিরিওয়ালা। তা নিয়ে ন্যাকামো করার কি আছে। অবনী দুচোখ দিয়ে মেয়েটাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু মেয়েটাকে আর দেখা গেল না। অবনীর খুব আফসোস হল, নিজেকে জুতো'তে ইচ্ছে করল ওর।

সোদপুরের একটু আগে যেখানে রেল-লাইনটা বাঁক নিয়েছে, সেখানটায় মোটর-সাইকেল থামাল পরমেশ। সারাটা রাস্তা পরমেশ সমানে খিস্তি করেছে অবনীকে। বহুৎ দেরী করে এসেছে ও কফি হাউসে। অবনী বোঝাতে চেয়েছে ওর কোনো দোষ নেই। দুপুর থেকে সারা কলকাতা জুড়ে বোমা বাজী। ট্রাম বন্ধ। ট্যাক্সি আসতে চায় না। কিন্তু পরমেশ অবনীর মুখে হুইস্কির গন্ধ পেয়েই খিস্তি করতে শুরু করল। বলেছে, শালা তোকে টাকা দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবনী স্বীকার করেছে, হ্যাঁ আজ দুপুরে ও চার পেগ মাত্র খেয়েছে ব্লু ফক্সে বসে। সেটা এমন কিছুই নয়। কিন্তু পরমেশ এখনও গরম। বি টি রোড ধরে আসতে আসতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। খুব জোরে চালাচ্ছিল পরমেশ। পেছনের সিটে বসে ঘাম ছুটে গিয়েছিল অবনীর। পরমেশ টাইট প্যান্ট আর গেঞ্জী শার্ট পরেছে। দুটোই কালো। ভ.ল মানিয়েছে।

সেণ্ট মেখেছে নাকি। দারুণ গন্ধ ছাড়ছে। গলায় সোনার চেনাটা চিকচিক করেছে। শালা।

এখান থেকে স্টেশনে হেঁটে যেতে হবে। ঠিক স্টেশনে নয়। তার আগেই ইয়ার্ড। লম্বা কয়েকটা মালগাড়ি সব সময়েই সেখানে পড়ে থাকে। এ সব জায়গা ওদের জানা। মোটর সাইকেল একটা দোকানের সামনে রেখে পরমেশ দোকানদারকে কি যেন বলল ফিসফিস করে। তারপর ওরা হাঁটতে লাগল। একটু এগিয়ে পরমেশ পকেট থেকে একটা গ্রেনেড বের করে অবনীকে দিল, 'এটা রেখে দে। দরকার না হলে ইউজ করিস না।' অবনী গ্রেনেডটা পকেটে রেখে দিল। ওরা নিঃশব্দে হাঁটছিল। ছোট একটা কালভার্ট পেরিয়ে এল এরা। এদিকে জনবসতি নেই বললেই হয়। ওরা রেললাইন থেকে দূরত্ব বাঁচিয়ে হাঁটছিল। পরমেশ কথা বলছে না এখন। মাঝে মাঝে নজর বুলিয়ে নিচ্ছে চারধারে। এদিকটায় ছোট জঙ্গল মতন। এরপরেই ইয়ার্ড। ওরা একটা বড় নর্দমা পেরিয়ে এল। সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ওরা রেললাইন ধরে হাঁটতে লাগল এবার। দারুণ জোনাকি জ্বলছে চারধারে। অন্ধকারটা তাই একটু পাতলা। হাওয়া দিচ্ছে মৃদু মৃদু। পরমেশ দাঁড়াল একটা ঢালু জায়গা দেখে। তারপর বলল, 'অবনী তুই এখানে শুয়ে পড়। শিষ দিলে গুঁড়ি মেরে উঠে আসবি।' বলে ও রেল-লাইনের পাশ ঘেঁষে অন্ধকারে চলে গেল। আসবার সময় পাখি পড়া করে ও অবনীকে বুঝিয়েছে কি কি করতে হবে। মোটা টাকার ব্যাপার। অবনী শুয়ে পড়ল খোয়া বিছানো মাটিতে।

পকেটে হাত দিয়ে অবনী গ্রেনেডটার অস্তিত্ব অনুভব করল। একটা মাত্র গ্রেনেড ওর সঙ্গে। পরমেশ ইচ্ছে করেই ওকে বোধহয় বেশী কিছু দিতে চায়নি। পরমেশের কাছে রিভলভারটা নিশ্চয়ই আছে। সব জায়গায় শালা বেইমানি। একটা আলাদা দল করবে যে পরমেশকে ছেড়ে তারও উপায় নেই। পার্টির ব্যানারে না গেলে আজকাল লাইন বন্ধ। এম-এ পাশ করার পর, বেকারির দিনগুলোতে পরমেশ তাকে হাত ধরে বাঁচার রাস্তা দেখিয়েছে। তবু শালা ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তেওয়ারীর সঙ্গে পরমেশের দোস্তি আছে এ কথা সবই জানে। তেওয়ারী পেটো গ্রেনেড সাপ্লাই করে। ওর স্টক শর্ট পড়ে গিয়েছিল বলে পরমেশের কাছ থেকে কিছু মাল আজ কিনলো ও। তেওয়ারীটা শালা এক নম্বরের হারামী।

অবনী চিৎ হয়ে শুলো। আকাশ ভরা তারা। উঃ কত যে তারা আকাশে। দারুণ লাগে দেখতে। অবনীর মনে পড়ল ছেলেবেলায় তমলুকে ওদের বাড়ির উঠোনে বসে ও তারা গুনবার চেষ্টা করত। বাবার কথা মনে পড়ল। তিনমাস আগে চিঠি পেয়েছিল, 'এম-এ পাশ করিয়া এখন অবধি একটি চাকুরি জোটাইতে পারিলা না।'

অবনী হাসল।

পর পর দুটো লোকাল ট্রেন চলে গেল। মাটিতে কাঁপন অনুভব করল সে। ঠিক সময় শিষ শুনতে পেল অবনী। মাথা তুলে দেখল। সমস্ত জায়গাটা

অন্ধকার। গুঁড়ি মেরে জঙ্গলটার পাশে গিয়ে বসল ও। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। একটা মাত্র গ্রেনেড। ছোট ছোট কয়েকটা ঝোপ এখানে। পরমেশের গলা শুনতে পেল ও। ফিসফিস করে ডাকছে, 'এদিকে আয় বাঁ দিকে।'
অবনী বাঁ দিকে সরে এল। পরমেশ হাঁটু গেড়ে বসে কি যেন দেখছে। অবনী দেখবার চেষ্টা করল। সামনে ফাঁকা রেললাইন। ইয়ার্ডে মালগাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ অন্ধকারে কিছু নড়তে দেখলো সে। মূর্তি দুটো স্পষ্ট হল। আর একটু পরে ও বুঝতে পারল ওদের মধ্যে একজন তেওয়ারী। ওরা উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। পরমেশ চাপা স্বরে কি একটা বলল। তারপর এগিয়ে গেল গুঁড়ি মেরে। এখন অবনীকে একটু বাঁ দিক দিয়ে পরমেশকে ফলো করতে হবে। পরমেশ আচমকা ফায়ার করবে। করে মাল হাতাবে। থলিটা নিয়েই অবনীকে দেবে। অবনী সেই মাল নিয়ে বাঁ দিক দিয়ে ছুটবে। পরমেশ ডান দিক দিয়ে ঘুরে মোটর সাইকেলের কাছে ফিরে যাবে। অবনী যেমন করেই হোক মালটা নিয়ে ডানলপ ব্রীজের তলায় পরমেশের জন্যে ঘণ্টাখানেক বাদে অপেক্ষা করবে। এই নির্দেশ। কিন্তু মালটা কি হতে পারে? পরমেশ খবর পাইনি বললেও অবনীর দৃঢ় বিশ্বাস পরমেশ সব নাড়ীনক্ষত্র জানে। অবনী আরও কয়েক পা এগোল। তেওয়ারীরা মালগাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। একটা টর্চ জ্বললো দূরে অন্ধকারে। সম্ভবত রেল-পুলিস।
পরমেশ এগিয়ে যাচ্ছিল গুঁড়ি মেরে। হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতা খান খান করে পর পর তিনটে ফায়ারিং হলো। সঙ্গে সঙ্গে দুটো গ্রেনেড অবনীর ডান দিকে ফাটলো। জায়গাটা মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল। অন্ধকারটা যেন ঝলসে গেল। আর সেই স্বল্প আলোয় অবনী দেখল পরমেশ মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। দূরে স্টেশনের দিকে হইচই শুরু হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। কারা যেন দুপদাপ করে ছুটে বেরিয়ে গেল অবনীর পাশ ঘেঁষে। অবনী হতভম্ব হয়ে পড়েছিল প্রথমটায়। তারপর দৌড়ে পরমেশের দিকে এগিয়ে গেল। রেললাইনের ওপর পরমেশ পড়ে আছে। বাঁ হাতটা উড়ে গেছে। প্যান্টটা পুড়ে গেছে। ফিকে জোনাকির আলোয় অবনী দেখল পরমেশের সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। আচমকা গুলি এবং গ্রেনেড খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অবনী হাঁটু গেড়ে বসে পরমেশকে চিৎ করে শুইয়ে দিল। পরমেশের ঠোঁট কাপছে। বুকে হাত দিল অবনী। ভিজে গরম রক্ত হাতে লাগল। অবনী কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ওকে এখান থেকে কি করে সরানো যায়। পরমেশকে বাঁচানো দরকার। অবনীর কান্না পাচ্ছিল।
স্টেশনের দিকে চীৎকারটা বাড়ছে। মুহুর্মুহু টর্চ জ্বলছে। পরমেশ গোঙাচ্ছে। কানটা মুখের কাছে নিয়ে গেল অবনী। 'শা-লা-সা-লা-নো—বেইমানী—'। অবনী শুনলো। অবনীর বলতে ইচ্ছে করল, 'গুরু আমি আছি। তেওয়ারীকে আমি জবাব দেব।' অবনী পরমেশকে তুলতে চেষ্টা করল। অসম্ভব। এত ভারী শরীর নিয়ে অবনী এক পা হাঁটতে পারবে না। কারা যেন, সম্ভবত রেল পুলিশের দল টর্চ জ্বালিয়ে ছুটে আসছে দেখতে পেল অবনী। দু তিনবার

রাইফেলের আওয়াজ করল পুলিশগুলো। ওরা এগিয়ে আসছে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ— ? অবনী উঠে কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর ঘুরে পরমেশকে শেষবার দেখল। আর সেই সময় ওর নজরে পড়ল পরমেশের গলার সোনার চেনটা চিকচিক করছে অন্ধকারে। অবনী পরমেশের মাথার কাছে এগিয়ে এসে এক ঝটকায় ছিঁড়ে নিল হারটা। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। চটচট করছে। ছেঁড়ার সময় পরমেশের মাথাটা ঝাঁকুনি খেল। অবনী পরমেশের খোলা চোখের সাদা মণি অন্ধকারেও দেখতে পেল।

পুলিশগুলো প্রায় এগিয়ে এসেছে। অবনী ছুটতে আরম্ভ করল এবার। তিন চারটে রাইফেলের গুলি ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ ওর মনে হলো পরমেশটা যদি না মরে যায়, যদি হাসপাতালে চাঙ্গা হয়ে ও সব ফাঁস করে দেয়—অবনীর নামটা-ও। বেইমান কাকে বলল ? অবনীকে ? হার ছেঁড়ার সময় পরমেশের চোখ খোলা ছিল। অবনী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। তারপর'পকেট থেকে পরমেশের দেওয়া গ্রেনেডটা বের করে পরমেশের রক্তাক্ত শরীরটা যে দিকে শুয়ে আছে সেইদিকে ছুঁড়ে দিল। প্রচণ্ড শব্দে গ্রেনেডটা ফাটল। অবনীর শব্দটা ভালো লাগল।

অবনী আবার দৌড়োতে লাগল। পুলিসগুলো এগিয়ে আসছে। ফায়ারিং হচ্ছে ও সেই বিরাট নর্দমার কাছে এসে পড়ল। রক্তাক্ত হারটা কোথায় রাখবে ভেবে না পেয়ে মুখে পুরে নিয়ে অবনী নর্দমার মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। নর্দমার নোংরা পচা স্রোতে অবনী ভেসে যাচ্ছিল। এই পাঁক এবং পূতিগন্ধে অবনী এক সেকেণ্ডও থাকতে পারত না, কিন্তু পরমেশের রক্ত মাখা হারের নোনতা স্বাদ ওর জিভ মুখ শরীরকে একটা আলাদা জগতে নিয়ে যাচ্ছিল। বেঁচে থাকার জন্যে দারুণ লোভে অবনী বুঝতে পারছিল যে এই নর্দমার স্রোতেই ও সবচেয়ে নিরাপদ।

জমা জমি

চাষযোগ্য ভূমির বড়ই অভাব এই গ্রামে। সেই কবে পূর্বপুরুষরা পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে-মাটি নিজেদের জন্য চিহ্নিত করে গিয়েছিল তার বেশী খুব একটা বাড়েনি। এক পুরুষ আগেও জঙ্গল কাটা যেত, জমির শরীর বাড়ানো যেত সুবিধে পেলে। এখন সরকার সেটাও বন্ধ করেছেন। তাছাড়া এই পাহাড়ের মাটিতে এত পাথর যে চাষ সহজ নয়। অনেক খাঁ খাঁ প্রান্তরে দিনরাত হাওয়ারা খেলা করে। বিনি পয়সায় সেই জমি দিলেও কেউ মুখ ফেরাবে না। অতএব যেটুকু চাষযোগ্য জমি তার ওপরে মায়া প্রতিটি পরিবারের সারা বছরের পেট ভরার যা অবলম্বন। কিন্তু তাই বা ভরে কই? দিন দিন নতুন মানুষ আসছে সংসারে। তাদের পেটের জায়গা বাড়ছে। অথচ জমি বাড়ছে না এক ফোঁটাও।

এই গ্রামের মানুষেরা শহরে যায় না, যেতে চায় না। বড় শহর নয়, মোটামুটি গঞ্জ এলাকা বলতে মানেভঞ্জন, তাও আট ঘণ্টার হাঁটাপথ! সেখানে গেলে যে কাজকর্ম পাওয়া যায় না তা নয়। মাল বইবার লোক দরকার হয় ব্যবসায়ীদের। হাতে নগদ পয়সা আসে। কিন্তু তা নিয়েও ঝামেলা আছে। আরও দশবিশটা গ্রামের মানুষ সেই একই ধান্দায় হাজির হয় সেখানে! এর ওপর আছে খোদ মানেভঞ্জনের বেকাররা। ওরা তাদের ভাল চোখে দেখে না। ফলে দিন দিন কাজ কমে যাচ্ছে দ্রুত। আরও দূরে যে শহর দার্জিলিং সেখানে নাকি খুব বড় বড় মানুষ থাকে, এই গ্রামের মানুষ অত দূরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। আশেপাশের জঙ্গলে আছে প্রচুর কাঠ। মেয়েরা তাই চুপিসাড়ে নিয়ে আসে ভোজালি চালিয়ে। এখন বুক ফুলিয়ে কাঠ কাটার দিন নেই। মাঝে মাঝেই ফরেস্ট গার্ডরা টহল মারে। তবু কাঠ আসে গ্রামে। শীতকালে যখন হুহু বাতাস করাত চালায় তখন ওই কাঠ প্রাণ বাঁচায়। দুটো মাস তো সাদা হয়ে যায় গ্রামটা বরফে। জমির মুখ দেখা তো দূরের কথা, গাছেরপাতাও চেনা মুশকিল হয়ে পড়ে। তখন যার উনুনে আগুন জ্বলে তার মতো ভাগ্যবান আর কে এই তল্লাটে! ওই জঙ্গলে এককালে জানোয়ারগুলোকে পাওয়া যেত। খিদে পেলে তীর ছুঁড়ে তাদের কাঁধে তুলে আনা যেত অনায়াসে। এখন জঙ্গলটাও খাঁ খাঁ করে। তার ওপর আছে ওই ফরেস্ট গার্ড। সবসময় শাসিয়ে যায়, খবরদার, বনের পশুর গায়ে কেউ হাত দেবে না। সব সরকারী মাল।

জঙ্গল সরকারী মাল, জঙ্গলের পশুও সরকারী মাল, তাহলে জঙ্গলের মানুষ কেন সরকারী মাল হিসেবে ঘোষিত হবে না? এই সরল সত্যটি কেন ওদের মাথায় ঢোকে না? তাহলে ওদের দেখভাল করার দায়িত্ব পড়ত ফরেস্ট গার্ডদের ওপর। সারা বছর ওই চাষের জমি আর কতটুকু খাবার যোগান দিতে পারে? কম্বলটা সমস্ত শরীরে জড়িয়েও কাঁপুনি যাচ্ছিল না মানে লেপচার। বাতাসের

দাঁত গজিয়েছে এর মধ্যেই। গাছের পাতাগুলো লাল থেকে হলুদ হয়ে যাচ্ছে। শেষ ফসল কাটা হয়ে গেছে প্রত্যেকের। এখন জমি খাঁ খাঁ করছে। কদিন বাদেই সাদা বরফে ঢাকা পড়ে যাবে চৌদিক। মানে তাদের জমিটাকে দেখাচ্ছিল। এই জমি তাদের পরিবারের পনের জনের পেট ভরায় কোনো রকমে।

আগামী বছরে পনের বছর পূর্ণ হয়ে ষোলয় পা দেবে মানে। বংশের ধারা অনুযায়ী চেহারা হয়নি, বেশ ছিপছিপে এবং লম্বাটে, মুখের চামড়া মোমের মতো মোলায়েম। দাড়ি দূরের কথা ফিনফিনে লোমও উঁকি মারেনি নাকের তলায়। চোখের পাতায় সুন্দর ভাঁজ আছে যা কিনা এই গ্রামের আর কারো নেই। মানে একবার পেছন ফিরে তাকাল। গ্রামের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানেই তাদের বাড়ি। আর ওই বাড়িতেই আজ দুপুর থেকে চলছে ব্যাপারটা। জবরদস্ত আলোচনা। থুক্ শব্দ তুলে থুথু ফেলল সে। তারপর দূরের সান্দাকফু পাহাড়ের দিকে তাকাল। অন্তত দশবার গিয়েছে সে সান্দাকফু। কোনো মজা নেই, শুধু সাদা সাদা পাহাড়গুলোকে দেখতে পাওয়া ছাড়া। তা সেই দেখতে আসে কাঁহা কাঁহা থেকে মানুষজন। হেঁটে সান্দাকফুতে পৌঁছে এমন ভাব করে যেন রাজ্য জয় করে এল। এই গ্রামের পাশ দিয়েই উঠতে হয় ওদের। ওসব দৃশ্য দেখা বেশ মজার। এক হাত জিভ বেরিয়ে এসেছে চড়াই ভেঙে. ফোঁস ফোঁস করে জিজ্ঞাসা করে, 'কিতনা দূর?' তা এইরকম একটা দল তাকে নগদ বিশটা টাকা পাইয়ে দিয়েছিল তিন হপ্তা আগে। চারজনের দলের সঙ্গে কোনো কুলি ছিল না। কাঁধের ব্যাগটা এত ওজনদার হয়েছিল যে সেগুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল মানে। এমন কিছুই না। লোকগুলো কতরকম খাবার খেয়েছিল পথে, ভাগ পেয়েছিল সে। জীবনে কখনও ওইরকম খাবার জিভে পড়েনি তার। তারপর থেকে একটা নেশা হয়ে গেছে মানের। এই ঢালু জায়গাটায় এসে বসে থাকে সে। আবার যদি কোনো বাঙালিবাবুর জিভ বেরিয়ে আসে তাহলে পকেটে কাগজ আসবে। কাগজের বড্ড দাম এই গ্রামে।

মানে হলো। ওপরে যাওয়ার শৌখিন বাবুদের আজ আর পাওয়া যাবে না। ঠাণ্ডা বাড়ছে হুহু করে। আলো কমছে। সে একবার পেছন ফিরে তাকাল। নিশ্চয়ই এতক্ষণে যা সিদ্ধান্ত নেবার নেওয়া হয়ে গিয়েছে। সিদ্ধান্ত দুটো, হয় বড়াভাবী বেরিয়ে যাবে, নয় থাকবে। রিম্বিক থেকে বড়াভাবীর বাপ আর ভাইও এসেছে। জোর ব্যাপার।

মানে চোখ বন্ধ করে বড়া ভাই-এর মুখ মনে করতে চেষ্টা করল। দুকুড়ি দশ বছর বয়স ছিল লোকটায়। সবসময় হাসতো। পরিবারের কর্তা হিসেবে সব দায় নিজের কাঁধে নিত। দুঃখ পেলেও হাসিটা ছিল মুখে। মানের যখন তিন বছর বয়স তখন বাপ মারা যায়। মা গিয়েছিল জন্ম দিয়েই। বড়া ভাই তার বাপ হয়ে গেল। বড়া ভাই-এর বাচ্চা নেই, বড়াভাবী তার মা হলো না কিন্তু। তার জন্যে ছিল মরা বাপের মা। তার কাছেই পরিবারের সব বাচ্চাদের থাকতে হতো। সে বুড়িও চোখ বুজেছে বছর তিনেক। বড়া ভাই ছিল মাটির মানুষ। লেপচাদের কথা খুব ভাবত সে। লেপচারা সংখ্যায় দিন দিন কমে যাচ্ছে, বেশির ভাগই

সাহেবদের ধর্ম নিয়ে নিয়েছে। বড়া ভাই-এর এসব ব্যাপার একদম পছন্দ ছিল না। প্রায়ই তাদের কাছে ওই খারাপ লাগার কথা বলত। বলত, আমাদের পরিবারের যেন কোন ভাঙন না দেখা দেয়। ওই জমি আমাদের পনের জনের রক্তের মতন। ওই জমি আমাদের মা, আমাদের একই সঙ্গে বেঁধে রাখবে।
কিন্তু বড়ভাবী একদম মানা করত না বড়া-ভাইকে। সারাদিন ঝগড়াই লেগে থাকত। বুড়ি দাদি গজগজ করত, একটা বাচ্চা পেটে দিতে পারলেই নাকি ঝগড়া থেমে যাবে। কিন্তু মাথার ওপরে যে ভগবান আছে সে নিজের কাজকর্ম ভাল করে বোঝে না। তাছাড়া বড়াভাবীর গায়ে নানান দুর্নামের গন্ধ লাগতে শুরু করেছিল। এই গ্রামের নিয়ম হল কোনো বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে নটঘট করলে কড়া শাস্তি হবে। কিন্তু অভিযোগ তুলতে হবে সেই মেয়ের স্বামীকে। বড়াভাই সব জেনেও চুপ করে বসে থাকত। তারপর হঠাৎ এই সেদিন পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল বড়াভাই-এর। আর দুদিনেই শরীর স্থির। সারা গ্রামের মানুষ বলেছিল, এরকম লোক আর জন্মাবে না।
কিন্তু তাতে কার কি লাভ হল ? বড়া ভাবী এবার চলে যাবে রিশিবকে। যাওয়ার সময় পনের ভাগের দুভাগ জমি সঙ্গে নিয়ে যাবে। তার আর বড়াভাই -এর অংশ। ওই জমি চলে গেলে পেটে হাত পড়বে সবার। জমি যদি ছেড়ে দিতে না চায় তো পরিবারের বাকি লোক তা কিনে নিতে পারে বড়ভাবীর কাছ থেকে। কিন্তু সে-টাকা কই ? খামোকা নিজের জমির জন্যে টাকা দিতে ধার করবে কেন সবাই ? কিন্তু আর একটা আইন আছে লেপচা পরিবারে। জমি বাঁচাবার জন্যে যে আইন করে দিয়েছিল পূর্বপুরুষেরা। সেই আইনে বড়াভাবীকে বেঁধে রাখা যায়। আর তাই নিয়ে আলোচনা সভা বসেছে বাড়ির উঠোনে। মেজ ভাই এই সভার উদ্যোক্তা।
মানে আর একবার বাড়ির দিকে তাকাল। অন্ধকারের পাতলা চাদর ঝুলবে এখনই। সে খানিকটা চড়াই ভেঙে পরিত্যক্ত চালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এই চালাটা ছিল একটা বুড়ির। তার না ছিল জমিজমা না ছিল সন্তান। লোকের কাছে হাত পেতে বেঁচে থাকত। কিন্তু মানুষটা ছিল অদ্ভুত। প্রত্যেক বাচ্চা ছেলেকে বলত আমি মরলে আমার বাড়িটা তোর। ওই বাড়িতে হাওয়া ঢোকে, বরফ আটকায় না, জল হলে ন্যাতা হয়ে যায়। কে থাকতে যাবে সেখানে ! বুড়ি মরার পরও কেউ হাত দেয়নি, চালাটা অমনি আছে। মানের মতলব এল, এটাকে সারিয়ে নিয়ে থাকলে কেমন হয় ! গাঁয়ের আর পাঁচজন যদি আপত্তি না না করে তাহলে বেশ একা একা থাকা যাবে ! এই সময় কলরব শোনা গেল। চারটে মেয়ে কলবলিয়ে উঠে আসছে নিচের ঝোরা থেকে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় ভরা কলসি। মানের খেলার সাথী ছিল একদিন। বড় হয়ে যাওয়ার পর ওরা এখন ছেলেদের সঙ্গে মেশে না। মানেকে দেখামাত্র ওদের হাসি বেড়ে গেল। কলসি নামিয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল। তারপর ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে মুখরা সে হাত নেড়ে বলে উঠল, 'এ মানে, ছি ছি, আজ তুই ওইরকম নোংরা জামা পরে আছিস, ছি ছি।'

মানে নিজের জামা দেখল, মোটেই নোংরা নয়। তাছাড়া এর অনেকটাই তো কম্বলের তলায় ঢাকা আছে। সে বলল, 'যা ভাগ! নিজের কাম কর 'কাম ?' মেয়েগুলো আরও গলিত হলো যেন। তারপর একজন গালে হাত রেখে বলল, 'পেট ভরে মিঠাই খাব কিন্তু। মানেভঞ্জন থেকে আনবি না সুখিয়াপোখরি ?'

'মিঠাই ? মিঠাই কেন খাওয়াতে যাব তোদের ?'

'আই বাপ! আজ বাদে কাল তোর বিয়ে আর মিঠাই খাবো না ?' সঙ্গে সঙ্গে হাসির বাজনা বাজল যেন। তারপর ওরা কলসি তুলে নিল আবার মাথায়। এবং এতক্ষণ যে মেয়েটি একদম কথা বলছিল না, সঙ্গিনীদের হাসির সঙ্গে তাল রাখছিল মাত্র, সে বলে উঠল, 'ওই বুড়ি জমিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাক।'

এই কথায় কোনো হাসি বাজল না। ওদের শরীর দ্রুত গাঁয়ের দিকে ফিরে যাওয়া মাত্র বাতাসে হাঁক ভেসে এলো, 'মানে, এ মা-নে, মানে দা-জু-উ-উ।'

হাঁকটা দিচ্ছে ওর মেজ ভাইপো। মাত্র আট বছর বয়স, তার খুব ন্যাওটা। কিন্তু বুড়ি জমিকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে বলল কেন মেয়েটা? ওই জমি তাদের প্রাণ, অন্নদাতা, তাদের রক্ত। ওই জমিকে ভালোবাসবে না তো তোকে জড়াতে যাব আমি? মেয়েটির উদ্দেশে একটি গালাগাল সজোরে উচ্চারণ করতেই তাকে আবিষ্কার করে ফেলল ভাইপো, 'এ দাজু, সবাই তোমাকে খুঁজছে আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ ? চল, চল।'

'খুঁজছে কেন ?' মানে খেঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে কি দরকার ? বড়াভাবী বাপের বাড়িতে চলে যায় নি ?'

দ্রুত মাথা নাড়ল ভাইপো। না, যায় নি। তার মানে পরিবারের জমি পরিবারেই থাকছে। একটু ভালো লাগা শুরু হতে না হতেই আর একটা দম বন্ধ উত্তেজনা জন্ম নিল বুকে। মেজ ভাই গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে অনেক কথা বলেছে। কিন্তু সঠিক উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়নি। আজকের সভায় স্থির ছিল যদি বড়াভাবীর বাড়ি ছেড়ে যাওয়া বন্ধ করা যায় তাহলে সেই সন্ধানটি আজকেই মিটিয়ে ফেলা হবে। মানের সমস্ত রক্ত কম্বলের তলাতেও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

উঠোনে আগুন জ্বলছে। জংলী কাঠের আগুন। পরিবারের এবং গাঁয়ের মাতব্বররা সেই আগুনের চারপাশে জড় গোল হয়ে বসে ধূমপান করছে। চার-পাশে ঘরের আড়াল থাকায় এখানে হাওয়া ঢোকে না, ঠাণ্ডাটা কম। মেয়েরা কেউ এই আলোচনায় নেই। তারা বাচ্চাদের নিয়ে ঘরে ঘরে কান পেতেছে। মানে সভায় ঢুকে শরীর থেকে কম্বলটা খুলল। আগুনের তাতে চমৎকার গরম ছড়াচ্ছে। মেজভাই তাকে দেখে বলল, 'এই যে, মানে এসে গিয়েছে। আয় মানে, এখানে বস।' এত আদর করে তাকে কখনও ডাকেনি মেজভাই। মানে একবার সমবেত মাতব্বরদের দিকে তাকাল, তারপর আগুনের সামনে গিয়ে বসল।

মেজভাই বলল, 'বড়া দাজু, আপনি কথা শুরু করুন।'

বড়া দাজ্‌ হলেন এই গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। চার কুড়ির ওপর বয়স। মানে চোখ তুলে দেখল বড়াভাবীর বাবা কিংবা ভাই এই আলোচনা সভায় নেই। ওরা কখন চলে গিয়েছে তা সে জানে না। বড়া দাজ্‌ বললেন, 'এ বড় খুশীর কথা, খুশীর কথা। ভগবান আমাদের পেট ভরানোর মতো জমি বেশী দেননি। যা দিয়েছেন তাই আমরা যত্ন করে রাখতে চাই। পাহাড়ের নিচের মানুষদের অনেক জমি, সেখানে ভগবান অনেক জল দেন, খুব ফসল ফলে। আমাদের মেহনত করতে হয় অনেক বেশী কিন্তু তাও পেট ভরে না। সেই জমি যদি ভাগ হয়ে যায়, কেউ তার অংশ নিয়ে চলে যায় তাহলে সাক্ষাৎ মৃত্যু। এসব কথা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ. মানে?'

মানে মাথা নাড়ল, সে বুঝতে পারছে।

'ভালো। তোমরা চার ভাই। তোমাদের বড় ভাই-এর মতো মাটির মানুষ আমি দেখিনি। ভালো মানুষদের ভগবান খুব দ্রুত টেনে নিয়ে যান তাঁর কাছে। তোমার মেজভাই অত্যন্ত বিচক্ষণ। খুব ঠাণ্ডামাথার মানুষ। তোমার সেজভাই-এর ওপর ভগবান করুণা করেন নি। জন্ম থেকেই সে হাঁটতেও পারে না, কথা বলতে পারে না। বড় কষ্ট তার। আর ছোটভাই হিসেবে তোমার জন্যে আমরা গর্ব করি। কি সুন্দর স্বাস্থ্য দিয়েছেন ভগবান তোমাকে। সেজভাই-এর সব খামতি তোমার মধ্যে তিনি পূরণ করে দিয়েছেন। এখন কথা হলো, তোমার বড়া ভাই মারা যাওয়ার পর তোমার বড়াভাবী কি করবেন! তার বয়স মাত্র দুই কুড়ি চার। এখনও তাকে যৌবন ছেড়ে যায়নি। কোনো সন্তান নেই। সে আবার বিবাহ করতে পারে। তার বাপ আজ এসেছিল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। যাওয়ার সময় সে নিয়ে যাবে জমির ওপর তার দাবি, স্বামীর অংশ। বুঝতেই পারছ তোমাদের সংসারের ওপর কি আঘাত নেমে এসেছিল। তোমাদের এমন অর্থ নেই যে অংশটা বড়াভাবীর কাছ থেকে কিনে নেবে। ওরা তো ছাড়বেই না। কিন্তু আমাদের আইনে, ধর্মে যে বিধান আছে তা সবাই মানতে বাধ্য। বিধানটা হলো যদি স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রীকে বিবাহ করবে তার সবচেয়ে বড় অবিবাহিত দেওর। সে যদি বিবাহিত হয় তাহলে তার পরের ভাই। যদি কোনো ভাই অবিবাহিত না থাকে তাহলে জেঠা বা কাকার ছেলেদের সঙ্গে ওই বিবাহ হতে পারে।'

বড়া দাজ্‌ নিঃশ্বাস ফেলল, 'কিন্তু তোমার বড়াভাবী এসব বিধান শুনতে চাইছিল না। তোমার মেজভাই বিবাহিত অতএব সেজভাই-এর এই পবিত্র অধিকার ভোগ করার কথা। সে অবিবাহিত। কিন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বড়াভাবী। আমাদের বিধানে অবশ্য এ ব্যাপারে সমর্থন করা আছে। এখন একমাত্র তুমিই অবিবাহিত এবং তোমাদের জমি এবং বড়াভাই-এর প্রতি সম্মান দেবার সুযোগ পেয়েছে। এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?'

মানে শূন্য চোখে আগুনের দিকে তাকাল। বড়াভাবীকে বিয়ে করতে হবে তাকে? আজ সকাল থেকে এই ভয়টা তাকে টোকা মেরে যাচ্ছিল। এখন আগুনের সামনে বসে তার শীত আরও বেড়ে গেল। বড়াভাবীর মাথার চুলে

পাক ধরেছে। খুব কাছে গেলে সেই দুই একটা বেরিয়ে আসা সাদা চুলকে দেখা যায়। শরীর বেশ ভারী। বুক দুটো পাথরের মতো সান্দাকফু পাহাড়কে কেটে বসিয়ে দেওয়া। সে যখন জন্মেছিল তখন বড়াভাবীর বয়স এক কুড়ি সাত। মানের কোনো দিকে মন ছিল না। সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করতে চাইল। সে বিয়ে করবে একটা পনের ষোল বছরের মেয়েকে যার এই শীতেও নাকের ডগায় টলটলে ঘাম জমে। একটা বুড়ি মোষের সঙ্গে এরা কেন তাকে জুতে দিচ্ছে? ওই বুড়ি যদ্দিন মারা না যাবে তদ্দিন সে বিয়ে করতে পারবে না। যদি দু'কুড়ি বছর পর বুড়ি মারা যায় তাহলে সে নিজেও বুড়ো হয়ে যাবে। আর তখন কে তাকে বিয়ে করবে? মানের শরীরে কম্পন এলো।

আর এই সময় বড়া দাজু বলল, 'মানে, তুমি রাজী?'

সে কিছু বলার আগেই মেজভাই উঠে দাঁড়াল, 'হ্যাঁ। ও রাজী। আমি মানেকে জানি। ওর মতো শান্ত ভাল ছেলের দাদা বলে আমি গর্বিত। ও কখনও আদেশ অমান্য করে না। তাছাড়া এই জমিকে ও প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসে। এবারে ও সারা মরসুম আমার সঙ্গে চাষ করেছে। এর ওপরে আরও একটা কথা আছে। আমাদের বড়া দাদার বিধবা বলেছে যে এই পরিবারের কাউকে যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে মানেকেই করবে। অন্য কাউকে নয়। মানে তার পছন্দের সম্মান রাখবে। মানে, ভাই আমার, হ্যাঁ কি না?'

মেজদাদার কথাগুলো হঠাৎ বিবশ করে দিল মানেকে। সে সম্মোহিতের মতো ঘাড় নাড়তেই সমবেত মানুষ হর্ষধ্বনি করে উঠল। মেজভাই হাত জোড় করে বলল, 'তাহলে আর দেরী নয়। দ্বিতীয় বিবাহে তো বেশী নিয়মের দরকার হয় না। আজই কাজ সেরে ফেলা যাক।' বড়া দাজু সম্মতি দিলেন এই প্রস্তাবে।

পাহাড়ে রাত নামে সন্ধ্যের আগেই। আর সেটা ঘন হয় বাতাসের ঝাপটা লাগলেই। নিয়ম কানুন চুকে গেলে মানে চোরের মতো বসেছিল। গাঁয়ের বিভিন্ন ঘর থেকে যারা এসেছিল তারা রাতের দোহাই দিয়ে ফিরে যাওয়ার আগে শুনল এর পরের পূর্ণিমায় খাওয়া দাওয়া হবে। শেষ লোক যে গেল তার নাম পূরণ। জাতবজ্জাত লোকটা। হাতে কাঁচা পয়সা আছে। জমির ধার ধারে না, মানে-ভঞ্জন দার্জিলিং-এ গিয়ে টুরিস্টবাবুদের গাইড হয়। যাওয়ার আগে সে কানে কানে বলে গেল, 'তোর বউ-এর খাঁই খুব। শরীরটা যেন চোরাবালি। চট করে ডুবে যাস না যেন। তোকে আমার হিংসে হচ্ছে রে।'

শেষ কথাগুলো যে একদম বুক থেকে বলা তাতে সন্দেহ নেই। তার ডবল বয়সের ওই লোকটা এতদিন তাকে পাত্তাই দিত না অথচ আজ এমন ভঙ্গীতে বলে গেল যেন কতকালের বন্ধু। শালার যে বড়াভাবীর ওপর নজর ছিল তা এই গ্রামের কার না জানতে বাকী আছে। মানে উঠল। বিয়ের পর বউকে সে-রাতের মতো সরিয়ে নেয় না কেউ, কিন্তু বড়াভাবী নিজেই উঠে গেছে তার নিজের ঘরে যেখানে সে বড়াভাইয়ের সঙ্গে শুতো।

মানের নিজের কোনো ঘর নেই। আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে বুড়িদাদির ঘরে

তার রাত কাটতো। সে-ঘরে নিশ্চয়ই এখন রাত কাটানো যাবে না। মানে বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই তাকে দেখতে পেল মেজভাই, 'আই, কোথায় যাচ্ছিস ?'

'ঘুরতে।'

'মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ? এই ঠাণ্ডায় কেউ বাইরে যায় !' তারপর কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল মেজভাই, 'আজ তুই আমার বুকে শান্তি এনে দিয়েছিস মানে। এই জমির অংশ চলে গেলে আমাদের পরিবারটা বাঁচত না। ওই পুরণ শালা জমিটা কিনবার জন্যে ঘুরঘুর করছিল। তুই বাঁচিয়েছিস। যাক, এখন এই তুই ওকে বড়াভাবী বলে ভাববি না, নিজের বউ-এর মতো দেখবি। প্রয়োজনে কড়া হবি। যা ঘরে যা।'

'কোন্ ঘরে ?'

'বড়া দাদার ঘরে।'

'না। ওই ঘরে আমি শোব না। বড়াভাই আমার বাপের মতো।'

মেজভাই হকচকিয়ে গেল, 'তাহলে ? আমাদের আর একটা নতুন ঘর তুলতে যে সময় লাগবে !'

'লাগুক। তাতে আমার কি ? আমি চললাম, বুড়ির চালায়।'

'বুড়ির চালা ? ওখানে তো হাওয়া ঢোকে।'

'ঢুকুক। আমার কম্বল আছে।' কথাটা বলে হন হন করে হাঁটতে লাগল মানে। তার খুব রাগ হচ্ছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন হুটহাট করে ঘটে গেল যেন সে একটা পুতুল।

ক্রোধ মানুষের অন্য অনুভূতিগুলিকে ভোঁতা করে দেয়। মানে জানলই না ঠাণ্ডার কামড় কতখানি। চালায় ঢোকারপর সে প্রথম ঠাণ্ডা টের পেল। কম্বলের তলায় শরীরটা কনকন করছে। চালাটা নোংরা নয়। বোধহয় বাচ্চারা এখানে খেলা করে বলেই বেশী ধুলো জমেনি। ধুলো জমলে নাকে গন্ধ আসতো। ফাঁক ফোকর দিয়ে বাতাস আসছে। একটা দেওয়াল ঘেঁষে বাঁশের খুঁটির ওপর বাঁশ পেতে খাট করা। কোনো বিছানাপত্র নেই। দরজা একটা আছে বটে তবে সেটা ঠাণ্ডা বাঁচানোর জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে নয়। একটা আলো সঙ্গে রাখলে ভাল হতো। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় যে উত্তেজনাটা বুকে ছোবল মারছিল এখন সেটার মাজা ভেঙেছে। অন্ধকারেরও নিজস্ব একটা আলো থাকে। চোখ সয়ে নিয়ে সেই আলোটাকে আবিষ্কার করে। মানে সেই আলোর ফাঁক-ফোঁকরগুলো ভর্তি করতে চাইল। প্রায় মিনিট দশেকের চেষ্টায় বাতাস ঢোকা বন্ধ হল। কিন্তু এটা অত্যন্ত সাময়িক প্রতিরোধ। একটু ঝড় উঠলে বা বরফ পড়লেই যে-কে সে-ই হবে।

বাঁশের মাচাটা কনকন করছে ঠাণ্ডায়। আর একটা কম্বল আনলে হতো। বাবুরা পাহাড়ে বেড়াতে যায় এক ধরনের থলি নিয়ে। শরীরটাকে ঢুকিয়ে দিলে আর ঠাণ্ডা লাগে না। সেরকম একটা হলে বেশ হতো। কম্বল মুড়ি দিল মানে। এই চালাটা কারও নয়। জমিটায় পাথর বলে কোনো মালিক নেই। এই চালাটাই

সারিয়ে নিলে কেমন হয়। বড়া দাজুর কাছে অনুমতি নিতে হবে। অবশ্য গাঁয়ের লোকেরা পাঁচটা ওজর দেখাবে সঙ্গে সঙ্গে।

শরীরটায় ঠান্ডা কিছুতেই যাচ্ছে না। মানে উঠল। ঘরের কোণায় কয়েকটা মোটা কাঠ দেখেছিল। সেগুলো জড়ো করে কয়েকটা কুঁচো কাঠে দেশলাই ঠুকল সে। যদিও এই কাঠে রস নেই তবু ধরানো খুব মুশকিল। ফু দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত আগুনের দেখা পেল। তারপর সেটাকে লালন করতে করতে আরও একটু বাড়ল। দুটো হাত সেঁকে নিল মানে। আর তার পরেই চোখে পড়ল একটা নেড়ি জুল জুল করে তাকে দেখছে মাচার নিচে বসে। এটার বোধ হয় এটাই আস্তানা এখন। তাড়াতে গিয়েও মন পাল্টালো সে। থাক বেচারা। আগুনটা মাঝখানে বাড়ছে। বেশ তাত ছড়াচ্ছে। চালায় একটা লালচে আভা কাঁপছে। আবার কম্বলটাকে টেনে নিল সে। মোটা কাঠের গুঁড়িটায় আগুন ধরেছে। সারারাত জ্বলবে নিশ্চয়ই। শরীরে আর তেমন ঠান্ডা ভাব নেই। শুধু বাঁশের খাঁজগুলো পিঠে লাগছে। চোখ বন্ধ করল মানে। আজ তার বিয়ে হয়ে গেল। কত সোজা ব্যাপার যেন। অথচ সে বিয়ে করতে পারত একটা ডাঁসা মেয়েকে। ওই আজ যারা কলসী মাথায় করে জল নিয়ে এসেছিল তাদের সবচেয়ে চুপচাপ মেয়েটাকে। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। নিজের শরীরে যে যৌবনের ফুলকি জম্মেছে সেটা কিছুদিন থেকেই বুঝতে পারছিল সে। কিন্তু—। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতেই দরজায় শব্দ হল। কেউ যেন শব্দটা ইচ্ছে করেই করল। দরজাটা খুলল এবং বন্ধ হল। তারপরেই চাপা গলায় প্রশ্ন, 'এখানে এসে শোওয়া হয়েছে যে ?'

মানে সাড়া দিল না। বড়াভাবীর বলার ধরন এই রকম। সে যখন বাড়ন্ত হল, হাত পায়ের গুলি শান্ত হল তখন থেকেই ওইরকম ঠোকরানো কথাবার্তা।

'আজকের রাতে কেউ আলাদা শোয় নাকি ?'

'আমি এখানেই শোব।' চোখ না খুলে বলল মানে।

'এখানেই শোব ? ই-হি ! শোব বললেই হল ! শুতে দিচ্ছে কে ? এই খোলি। মাঠের মধ্যে আমি শুতে পারব না। ওঠ, ঘরে চল। লোকে বলবে কি !' শেষ বাক্যটা এমন নরম গলায় যে চোখ না খুলে পারল না মানে। আর খুলতেই সে চমকে উঠল।

বিয়ের আসরে বড়াভাবীকে সে দেখতে পায়নি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা ছিল তার। ঘোমটার ফাঁকে চিবুকের যে অংশ দেখা যাচ্ছিল সে দিকেও নজর দিতে ইচ্ছে করেনি। কোনো আকর্ষণ বোধ করেনি সে ওদিকে তাকাতে। কিন্তু একি সাজ সেজেছে বড়াভাবী ! গায়ে কম্বল জড়ানো বটে কিন্তু মাথার চুল খুব কায়দা করে বাঁধা, মুখে পাউডার, খোঁপায় ফুল, আর দুহাত ভর্তি নানান রঙের চুড়ি। কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে। প্রতিদিনের আটপৌরে গন্ধটা একটুও শরীরে নেই।

বড়াভাবী ততক্ষণে মাচায় এসে বসেছে। বসে বলল, আমার অবশ্য ওই বাড়িতে থাকতে একদম ইচ্ছে করে না। আমি তো বাপের বাড়িতে চলে যাব বলে ঠিকই

করেছিলাম। ওখানে কত ছেলে আমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। শুধু ওখানে কেন, এই গ্রামে নেই নাকি। যেমন ধর পুরণ। সে বলেছিল তুমি বাপের বাড়িতে চলে যাও আমি তোমাকে সাদী করে ফের এই গ্রামে নিয়ে আসব। কিন্তু লোকটা ধান্দাবাজ, একসঙ্গে পাঁচটা মেয়ের পেছনে ঘোরে। তার-পর যখন তোমার মেজভাই আমার হাতে পায়ে ধরল, বলল, জমি বাঁচাও, বিধান মানো আমার বাপটাও যখন তাই বোঝালো, তখন আমি বললাম, মরে গেলেও ওই রুগ্দি নুলো দেওরটাকে বিয়ে করতে পারব না। বিয়ে যদি করতেই হয় তো তোমাকে।' কথাটা বলে হাত বাড়িয়ে মানের চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে মদির হাসল সে, 'তরতাজা জোয়ান, যত বয়স হবে তত গাছের মতো মজবুত হবে। এই রকম জোয়ান না হলে সুখ হবে কি করে বল। তাই রাজী হয়ে গেলাম। চল, ওঠ, ঘরে যাই।' দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে হাই তুলল বড়াভাবী।

'আমি এখানেই থাকব।' মিন মিন করে বলল মানে।

'এখানে কেন? এই নোংরা জায়গায় আমি থাকতে পারব না' ফোঁস করে উঠল গলার স্বর।

'বড়াভাবী, তুমি আমাকে মাপ করে দাও।'

'ব-ড়া-ভা-বী।' হি হি করে হেসে উঠল, যেন এর চেয়ে হাসির কথা সে জীবনে শোনেনি, 'আমি আজ থেকে তোমার বউ, তুমি আমার সম্পত্তি। ওসব বলে খবরদার ডাকবে না।'

দুচোখ বড় করে তার রক্ত দেখাল যেন সে। 'আমার নাম নিমা। তাই বলবে।' মানে ঢোঁক গিলল, 'ওই ঘর বড়াভাই-এর। ওখানে গেলে—।'

'ও এই কথা। দূর পাগল। তোমাদের বড়াভাই একটা মানুষ ছিল নাকি। একটা পিঁপড়ের ক্ষমতাও ওর চেয়ে বেশী ছিল। যে পুরুষ বউকে সুখ দিতে পারে না সে আবার পুরুষ নাকি? তার জন্যে মন কেমন করার কোনো দরকার নেই। চল।' এবার হাত ধরে টানল নিমা।

হঠাৎ ভেঙে পড়ল মানে, 'আমার মন মানছে না।'

'কেন? মন মানছে না কেন? আমি কি খারাপ? গ্রামের সব ছোঁড়াবুড়ো আমায় পেলে বর্তে যায় তা জানো?' গর্জে উঠল নিমা, 'নাকি অন্য মতলব। কোনো বাচ্চা মেয়ের কাছে ফেঁসে গেছ এর মধ্যে। ডাগর ছাগল পেয়ে রাক্ষুসিরা তো ছাড়ে না। সত্যি বল?'

'না, আমি ওসবের মধ্যে নেই।'

'নেই তো? ভাল। শোন, তোমায় একটা কথা বলি। ওই যে হাড়জিরজিরে বাচ্চা মেয়েরা ওরা কোনো কম্মের নয়। এক হাঁটু ঝোরায় স্নান করতে কি মজা লাগে? স্নানের জন্যে চাই ডুব জল, ইচ্ছে মতন সাঁতার দেওয়া যায় যেখানে। কথাটা মনে থাকবে?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল মানে, 'তা হোক, তবু আজ আমি এখানে থাকি।' কিছুক্ষণ কথা না বলে নিমা ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন মতলবটা বুঝতে চাইল। আগুনটা এখন জব্বর জ্বলছে। তার লাল আভায় নিমার মুখটা

রহস্যময় দেখাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে দরজার কাছে গেল। বাইরে মুখ বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিল, 'আই বাপ, কি ঠাণ্ডা!' তারপর দরজাটা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করল কিছু সময়, 'এটা তো বন্ধই হয় না। না হোক, এত ঠাণ্ডায় আর কে আসবে! সরো কম্বলটা পেতে দিই ওই মাচার ওপরে। একটা নিচে আর একটা গায়ে দেব। তুমি ততক্ষণে আগুনটা আরও জোরদার করে দাও। তাহলে রাতটা গরমে গরমে কাটবে।' চোখ মটকে হাসল নিমা।

হুকুম পালন করতে করতে বড়াভাবী, না, নিমার সুবৃহৎ নিতম্ব দেখে মানে আরও জবুথবু হয়ে যেতে লাগল। এই মেয়েমানুষটাকে খুড়ি, জেঠি এবং বড়াভাবী ছাড়া অন্যকিছু ভাবা যায় না। এখন ওর মতলব এই চালাতেই রাত কাটানো। মানে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে আগুনে ধরিয়ে নিল। তারপর চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল তার কি করা উচিত। ভেবে কুল পাচ্ছিল না সে।

'উঃ কি ঠাণ্ডা রে বাবা। আমাকে সুখটানটা দাও তো।'

মানে চোখ তুলে দেখল একটা সাদা পাইথন তার সামনে নড়ছে। ওটা যে নিটোল হাত যার কোথাও আবরণ নেই, কম্বলের তলায় শোওয়া শরীরটা থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে প্রত্যাশায় আঙুল নাড়ছে তা বুঝতে সময় লাগল। সে সম্মোহিতের মতো বিড়িটা এগিয়ে দিতেই লাল ফুলকিটা টিপের মতো আর একটা ঠোঁটে আটকে গেল যেন। তারপর ভুল করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বিড়ির শেষ অস্তিত্বটাকে আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে ডাকল, 'এই, এসো।'

মানে এবার আবিষ্কার করল বড়াভাবী কিংবা নিমা যে কি না এখন থেকে তার বউ সমস্ত কাপড়জামা ওপাশে ছেড়ে রেখে কম্বলের তলায় শুয়ে আড় ভাঙছে আর সেই ভঙ্গিমায় কম্বল সরে যাওয়ায় আগুনের রঙ লাগছে খোলা চামড়ায়।

'এসো, এসো না!'

জঙ্গলে আগুনের হাত শক্তিশালী হলে বাতাস তার বন্ধু হয়ে যায়। কোনো ঝরনার সাধ্য নেই সেই আগুন নেবায়। এই নিস্তব্ধ চরাচরে, বাইরে যখন ধারালো বাতাস বইছে শীতের ছুরি মুখে, কোথাও কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই তখন আগুনের বুকে কাঠের জোড়গুলো ফাটছিল নিঃশব্দে।

এত ক্লান্তি এই জীবনে আসেনি মানের। একটা দেশলাই কাঠি যখন একগাদা শুকনো কাঠের ওপর পড়ে তখন আগুনের চেহারাটা বদলে যায়, কাঠিটাই পুড়ে মরে। ভোরের আগে হাতে পায়ে ধরেছিল নিমা। বারংবার ক্ষমা চেয়েছিল, নিষ্কৃতি চেয়েছিল এই রাত্রের জন্য। একটা পনেরো বছরের উদ্দামতার কাছে হার মেনেছিল সে। জ্বলে ওঠার পর মানে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। সেই নিঃশ্বাসে সমুদ্র শুষে নেওয়ার পর তাকে দেওয়ার কিছু ছিল না নিমার। পরাজিতা অথচ ভীষণ সুখী দেখাচ্ছিল তাকে। এখন চালার মাঝখানে জ্বালানো নিবন্ত আগুনে শিশুর মতো তার ঘুমন্ত মুখটা দেখে উঠে দাঁড়াল মানে। ক্লান্ত শরীরে কিন্তু ঘুম আসছে না।

সমস্ত শরীর কম্বলে মুড়ে দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসতেই ঠাণ্ডা চাবুক কষালো। মানে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার শরীরে একটুও শক্তি নেই। কিছুদিন আগে তার এইরকম অবস্থা হয়েছিল। ওদের জমির পাশে যেখানে পাহাড়ের শুরু সেখানে খানিকটা সমান জায়গা আছে। সারাদিন কোদাল নিয়ে মাটি কুপিয়েছিল সে। অনেকটা জমি কোপানোর পর যে আনন্দ তা টুক করে চলে গেল বিকেলবেলায়। কোদালের ফলা ঠং করে বাজল পাথরে। জমির তলায় পাথরের আস্তরণ। তখন যে ক্লান্তি শরীরে এসেছিল এটা সেইরকম। কোথায় যাচ্ছিল খেয়াল নেই, পাতলা অন্ধকারে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ ও মাটির গন্ধ পেল। তারপর মুখ তুলে দেখল সামনের আকাশে লালের ঘোর লেগেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার শরীরের রঙ পাল্টাচ্ছে। আর সে দাঁড়িয়ে আছে তাদের শূন্য চাষের জমির সামনে।

এই ফসলকাটা হয়ে যাওয়া ক্ষেত আর কোনোকালে বাড়বে না। উবু হয়ে বসে ভাঙ্গা মাটিতে হাত রাখল মানে। বড়াভাবী কিংবা নিমা অথবা তার বউয়ের মা হবার বয়স ফুরতে আর বেশী দেরি নেই। অথচ সে বাপ হতে পারে আরও দুকুড়ি বছর। তদ্দিন যদি বড়াভাবী কিংবা নিমা অথবা তার বউ বেঁচে থাকে তাহলে তার বংশধর আসবে না। না এলে সংসার বাড়বে না। বড়াভাই ছেলে-মেয়ে রেখে যায়নি। সেজভাই পঙ্গু, অথর্ব। সে-প্রশ্নই নেই। চারভাই-এর এই জমিটা আর কিছুকাল পরেই মেজভাই-এর দুই ছেলের হয়ে যাবে। চার থেকে দুই-এ'। কাল রাত্রে সোহাগের সময় মেয়েছেলেটা বলেই ফেলল সে আর বাচ্চা চায় না তাতে যৌবন মরে যায়। এ থেকে আর একটা রহস্যের আড়াল সরলো। বড়াভাই-এর কি সবটাই দোষ ছিল?

মানে আরও কয়েক পা হাঁটল। সেই পাহাড় কেটে সমান করা জমিটার সামনে ও এখন। এই জমি কেউ ছোঁয় না, কারো লোভ নেই। সারাদিন কুপিয়ে যখন সে এর তলায় পাথরের আস্তরণ পেয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল হতাশায় তখন গ্রামের মানুষ হেসেছিল। এই অচাষযোগ্য জমির ওপর কারও লোভ নেই, তাই মমতাও নেই। মানে নিজেদের চাষযোগ্য জমিটার দিকে তাকাল। মেয়েমানুষটাকে বিয়ে করে সে ওই জমিটাকেই শুধু বাঁচায়নি, জমির অনেক দায়ও বাঁচিয়ে দিল। এখন থেকে ফসল খাবার মুখ কমবে এই পরিবারে।

হাত বাড়িয়ে পাথুরে জমির মাটি স্পর্শ করল সে। শিশিরে কাদা কাদা হয়ে আছে। এই মাটি ফসল ফলাবে না, তাই কারো আকাঙ্ক্ষা নেই, ভালবাসা নেই এর ওপর। কিন্তু এর তলায় যে পাথরের আস্তরণ তার সীমা কতদূর। পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরে নিশ্চয়ই চলে যায় নি। ওই পাথরের আস্তরণের নিচে নিশ্চয়ই নরম মাটি আছে উর্বর হয়ে। একবার যদি পাথরের আস্তরণটা তুলে ফেলা যায়—মানে রোমাঞ্চিত হলো। পাওয়া যায়? একথা কেউ তাকে বলেনি।

দূরে কুয়াশায় ঢাকা বাড়ির চালাটার দিকে তাকিয়ে সে রোমাঞ্চিত হলো। সামান্য মাটি খুঁড়ে সে পাথরটাকে আবিষ্কার করেছিল কিন্তু আরও খুঁড়লে যদি

উর্বর মাটি কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বলেছে পাথরের শক্তিও সীমিত। তাহলে ? জ্যা-মন্তু তীরের মতো মানে ছুটল তাদের বসতবাড়ির দিকে, একটা কোদাল খুঁজতে।

আবিষ্কার

বড়মামা হরিদ্বার থেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন আজ সকালে ওঁরা ফিরছেন। ওঁরা মানে বড়মামা আর আমার বাবা। টেলিগ্রাম পেয়েই ছোটমামা চিৎকার করে উঠেছিল, সমস্ত বাড়িতে উত্তেজনাটা ছড়িয়ে পড়ল। আমি তখন মায়ের পাশে বসে পড়ছিলাম, টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে বড়মামী দৌড়ে এলেন, 'মায়া, ও মায়া; জামাইকে পাওয়া গেছে। এই দ্যাখো উনি টেলিগ্রাম করেছেন।' প্রথমে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি বড়মামীকে কেন এত উত্তেজিত দেখাচ্ছে। চোখ মুখ খুশী খুশী, ভারী শরীরটা নিয়ে হাঁপাচ্ছেন। খবরটা মুখে বলেই হলো না বড়মামী টেলিগ্রামের ভাষাটা পড়লেন, হরিদ্বার থেকে সীতেশকে সঙ্গে নিয়ে বড়মামা শুক্রবার কোলকাতায় ফিরছেন। আমার বাবার নাম সীতেশ, সীতেশ রায়। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর কেমন করে উঠল। আমার বাবাকে ছবিতে ছাড়া আমি দেখিনি এবং আজই শুক্রবার।

বড়মামী ততক্ষণে আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন, "এ বড় পয়া মেয়ে রে। এর জন্যেই শেষ পর্যন্ত জামাইকে পাওয়া গেল।' বড়মামীর এই একটা বাতিক। যখনই এ সংসারে কোনো ভালো খবর হবে তখনই বলবেন ওটা আমার জন্যে হচ্ছে। আমার চোখ, চিবুক, কপাল নাকি এমন লক্ষ্মীমন্ত যে ঘুম থেকে উঠে আমার মুখ দেখলে দিনটা ভালো যায়। কথাটা বড়মামা পর্যন্ত বিশ্বাস করে ফেলেছেন। বাড়ি থাকলে রোজ ভোরে ওঁর চিৎকার ভেসে আসে, 'শোনকু, জলদি এসো।' আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে উনি চোখ খুলে আমার মুখ দেখে 'মা, মা' বলে চেঁচিয়ে বিছানা ছাড়েন, সেই বড়মামা আমার বাবাকে নিয়ে আজ আসছেন।

আমি কথাটা শোনা অবধি বড়মামীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ মায়ের দিকে তাকাতে দেখতে পেলাম মা চোখ বন্ধ করে আছে। বড়মামী বললেন, 'মায়া, যা হবার তা হয়েছে। আর অভিমান করে থাকিস না। তুই সহজ হ, সহজ হলে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়।' মা মুখে কিছু জবাব দিল না, শুধু একটু মাথা নাড়ল। বড়মামী এবার আমাকে নিয়ে পড়লেন, 'শোনকু, চটপট স্নান করে নিবি, আজ যে তোর স্কুল নেই ভালোই হয়েছে। আমি যাই ওদিকটা দেখি।'

বড়মামী চলে গেলে আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারছিলাম না। মা তেমনি শুয়ে আছে, কোনো কথা বলছে না, চোখ বন্ধ। বড়মামী এইমাত্র যেসব কথা বলে গেলেন সেগুলো কেন বললেন তা আমি জানি না। আমার সামনে কোনোদিন এসব আলোচনা এ বাড়িতে হয়নি। মায়ের সঙ্গে বাবার কি খুব ঝগড়া হয়েছিল? হঠাৎ দেখলাম মার চোখের কোণ দুটো চিক চিক করতে করতে ভরে

উঠল। মনে হলো মায়ের নিশ্চয় আবার শরীর খারাপ করছে, আমি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম। মা ঘাড় নেড়ে এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল। উত্তেজিত হলে মায়ের জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে। মা বলল, 'খুকু তোমার বাবা আসছেন। একটা ভালো জামা পরবে। বাড়িতে ঢুকলেই গিয়ে প্রণাম করবে আর কি চাই, না চাই দেখবে।' আমি বললাম, 'কেন ?'
মা আমার ঘাড়ে হাত দিল, 'বাবার কাজ মেয়েরাই করে। তুমি যখন খুব ছোট্ট ছিলে তখন উনি তোমায় খুব ভালোবাসতেন।'
'তাহলে চলে গেল কেন ? সন্ন্যাসী হয়ে গেল কেন ?'
'কেউ কেউ ওরকম হয়।'
'আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করব ?'
'না। এতদিন পর উনি আসছেন, কি রকম আছেন আমরা কেউ জানি না। কেউ দুঃখ পায় এমন কাজ করো না।'
আমি আর মা মামার বাড়িতে থাকি। এটা আসলে দিদার বাড়ি। আমার যখন আট বছর বয়স তখন দিদা বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাজার হাড় ভেঙেগ ফেলেন। তারপর দীর্ঘকাল বিছানায় পড়ে থেকে পাঁচ রকম রোগে ভুগে ভুগে শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন। পড়ে যাওয়ার আগে দিদা খুব ডাকসাইটে ছিলেন। শুনেছি উনিই জোর করে আমাদের এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। দিদার অসুখের সময় মায়ের শরীর ভালো ছিল। মামারা নার্স রাখতে চেয়েছিল মা রাজী হয়নি। দিনরাত মা তখন দিদাকে নিয়ে পড়ে থাকত। যন্ত্রণা যখন বাড়ত তখন দিদার চিৎকার পাড়ার সবাই শুনতে পেত। স্কুল থেকে ফিরেই আমি দিদার পাশে গিয়ে বসতাম। দিদার একটাই কথা ছিল, 'শোনকু, তোকে অনেক বড় হতে হবে। অনেক লেখাপড়া শিখতে হবে। তোর মার সব কষ্ট তুই দূর করবি।'
মায়ের কি কষ্ট আমি ঠিক বুঝতাম না তখন। তবে একটা জিনিস অনুমান করতাম, বাবা নেই বলেই বোধহয় দিদা ওকথা বলছেন। আমাদের ক্লাসের সব মেয়ের বাবা আছে শুধু আমার নেই। কিন্তু তাই বলে তো আমার কোনো কষ্ট হয় না। মায়েরও যে হয় তা বলি কি করে! মা তো কখনো বাবার কথা বলে না। বড়মামার কোনো ছেলেমেয়ে নেই, ছোটমামার বিয়ে হয়নি। এ বাড়িতে আমি একা মেয়ে। বাবা না থাকায় আমার কোনো অভাব নেই, দিদার ঘরে মা-বাবার বিয়ের একটা ছবি আছে। বাবার মুখটা হাসি হাসি, ফর্সা এবং খুব ভালো লোক মনে হয়। কিন্তু মা যে কি ভীষণ সুন্দর তা বোঝাতে পারব না। মা পাশে থাকলে মনে হয় আমার আর কিছু দরকার নেই। আমি নাকি মায়ের চেহারাটা পেয়েছি। দিদার কথায় মা একবার বলেছিল, 'দেখো, আমার কপালটা যেন না পায়।' মাকে খুব কম হাসতে দেখেছি আমি, কিন্তু মা এত শান্ত যে পাশে বসে থাকতে কি আরাম!
দিদার যাওয়ার পর বড়মামী দিদার জায়গা নিলেন। বড়মামী মায়ের চেয়ে অনেক বড়। মনে আছে যাওয়ার আগে দিদা একদিন বড়মামীকে হাত ধরে

বলেছিলেন, 'তুই কথা দে আমায়, মায়া-শোনকুর ভার তুই নিবি ?' ঘরে কেউ ছিল না, আমি ঢুকতে গিয়ে শুনে ফেলেছিলাম। সত্যি, বড়মামী আমায় ভীষণ ভালোবাসে। আমার মায়ের তো টাকা পয়সা বেশী নেই কিন্তু বড়মামী আমার কোনো অভাব রাখেনি। আমি মায়ের কাছে পড়তাম। পড়তাম মানে মায়ের অসুখ না হওয়া অবধি পড়তাম। এখন একজন বুড়ো মাস্টারমশাই আসেন। কিন্তু আমার মায়ের কাছে বসে পড়তেই ভালো লাগে। অসুখটার পর মা আর জোরে কথা বলতে বা পড়াতে পারে না। কিন্তু আমার পড়া শুনে মা মাথা নেড়ে বলে দেয় আমি ঠিক পড়ছি কিনা। পড়াশুনায় আমি কখনো দ্বিতীয় হইনি। আজকাল দিদার মতো মাও বলে আমাকে খুব বড় হতে হবে। সেই হবে উপযুক্ত জবাব—কোন্ প্রশ্নের তা আমি জানি না। দিদা যাওয়ার কয়েক মাস পর থেকেই মায়ের অসুখটা ধরা পড়ল। বড়মামা বলেন দিদার জন্য পরিশ্রম করেই নাকি মায়ের এরকম হয়েছে। হার্টের অসুখ। মাথা ঘোরে, শরীরে একটুও জোর পায় না মা। দিনরাত শুয়ে শুয়ে এখন কাঠির মতো রোগা হয়ে গিয়েছে। মায়ের খাটের পাশে একগাদা ওষুধ আর আমি।

বড়মামীর কাছে শুনেছি আমার বাবা নাকি খুব ভাল ডাক্তার ছিলেন। প্রচন্ড পসার ছিল, রুগী দেখতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতেন। ঠিক আমি হবার পর নাকি বাবা বেহালার কোনো সাধুবাবার প্রতি আকৃষ্ট হন। তারপর কি হল কে জানে বাবা প্রাকটিস ছেড়ে দিয়ে সেই সাধুর কাছে পড়ে থাকতেন দিনরাত। কারো কথা শুনতেন না। শুধু রাত্রে বাড়ি ফিরলে নাকি আমার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে বসে থাকতেন। রাত্তিরে আমায় জড়িয়ে ধরে না শুলে বাবার ঘুম আসতো না। একথাটা শুনেই আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। আমি যখন সেই ছোট্টটি ছিলাম তখন বাবা আমাকে এতো ভালোবাসতেন ? তাহলে ছেড়ে গেলেন কেন ? কেন হঠাৎ এক সকালে আর দেখা গেল না বাবাকে। সেই বয়সের কোনো কথা কারো মনে থাকে না। যাওয়ার সময় বাবা কি করেছিলেন আমি জানি না। গৌতম বুদ্ধের সেই ছবিটা ইতিহাস বইতে দেখেছি। বুদ্ধদেব স্ত্রী ও সন্তানকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু বাবাকে কিছুতেই আমি গৌতম বুদ্ধ ভাবতে পারি না। তারপর নাকি বাবাকে অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছিল। কিন্তু সব বিফল হয়েছে। মাঝে মাঝে কেউ খবর দিত বাবাকে কাশীতে দেখা গেছে, কেউ এলাহাবাদে দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে বড়মামা ছুটে যেতেন সেখানে কিন্তু পাওয়া যেত না। যারা দেখেছে তারা বলেছে বাবা নাকি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে, চট করে চেনা যায় না। এ সময় মা দিদাকে খোঁজাখুঁজি করতে নিষেধ করে। যে ইচ্ছে করে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে তাকে ধরতে ছোটার কোনো মানে হয় না। মায়ের জেদের জন্যই বোধহয় শেষপর্যন্ত মামারা হাল ছেড়ে দিলেন। বড়-মামী বলেন যে বাবার কথা চিন্তা করে করে নাকি মা এই হার্টের অসুখটা বাধিয়েছে। এবার বড়মামা অফিসের সঙ্গীদের সঙ্গে হরিদ্বারে বেড়াতে গিয়ে-ছিলেন। সেখান থেকে হঠাৎ এই টেলিগ্রাম। বিশদ কিছু লেখা যায় না টেলিগ্রামে। তাই আমরা কেউ বুঝতে পারছিলাম না বড়মামা কিভাবে বাবার

দেখা পেলেন, কি করে বাবাকে রাজী করালেন ফিরে আসতে। ছোটমামা আর বড়মামীই জল্পনা কল্পনা করছিলেন। মা, এসব ব্যাপারে কোনো কথা বলেনি, যেন আজকের দিনটা অন্যদিনের থেকে আলাদা নয়।

ছোটমামা বাজারে যেতেই আমি স্নান সেরে নিলাম। এবার পাওয়া পুজোর জামাটা পরেছি যেটায় আমার গোড়ালির চার ইঞ্চি ওপর অবধি ঢাকা থাকে। বয়সের তুলনায় আমার শরীর খুব বড়সড়। মা আর বড়মামীর চোখ দেখে পা ঢেকে বসতে বসতে বিরক্তি ধরে যায়।

ট্যাক্সিটাকে আমিই প্রথমে দেখলাম। ভাড়া মিটিয়ে বড়মামা নেমে এলেন তারপর গেরুয়া পরা এক সন্ন্যাসী। বাবাকে দেখবার জন্য যে কৌতূহলটা বুকের মধ্যে ছটফট করছিল সন্ন্যাসীকে দেখার পর যেন হঠাৎই সেটা স্থির হয়ে গেল। পায়ে খড়ম, খালি গা, বুক অবধি কালো দাড়ি। মাথার চুল জটা হয়ে পাকিয়ে পিঠে নেমেছে, সঙ্গে একটা লাল ঝোলা। আশেপাশের বাড়ির অনেকেই অবাক হয়ে ওঁকে দেখছিল। আমার বাবা বলে নিশ্চয়ই কেউ চিনতে পারছে না। কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে কি রকম করল। এই লোকটা আমার বাবা ? বড়মামা যখন সদর দরজার কড়া নাড়ছে তখন আমি জানলার খড়খড়ি ছেড়ে এক দৌড়ে মায়ের কাছে। একটা হাত চোখের ওপর রেখে মা শুয়েছিল, হাতটা ভীষণ রোগা আর সাদা। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'মা ওরা এসেছে।'

হাতটা সরিয়ে মা আমার দিকে তাকাল। আমি আবার বললাম, 'বড়মামারা এসেছে।'

'তোর বাবা ?' মা খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করল।

'একজন সন্ন্যাসী, না না তান্ত্রিক, বড়মামার সঙ্গে এসেছেন।'

ঠিক এইসময় আমি বড়মামার চিৎকার শুনতে পেলাম, শোম্কু, শোম্কু, জলদি চলে এসো, দেখে যাও কে এসেছে।'

আমার যেতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। একটা অপরিচিত অস্বাভাবিক মানুষকে বাবা বলতে একদম ইচ্ছে করছিল না। মা বলল, 'যাও, প্রণাম করে এসো।' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে সন্দেহটা এসে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি সত্যি ও আমার বাবা না হয় ? বড়মামা তো ভুলও করতে পারেন।'

মায়ের মুখটা কিরকম হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত আমার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে মা বলল, 'পোড়ারমুখী তোর কপালে যে কি লেখা আছে। যাও।'

কথাটার মানে বুঝতে পারলাম না। ঘুরে দাঁড়াতেই বড়মামীকে ছুটে আসতে দেখলাম, 'তুই এখনো এখানে ? চল চল, তোর বাবা এসে গেছে। মাকে বলেছিস ? গিয়ে প্রণাম করবি। যা, আমি আসছি।' বড়মামী মায়ের কাছে এগিয়ে যেতে আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। কি রকম আড়ষ্ট হয়ে গেলাম আচমকা, নিজেদের বাড়িতেই যেন বাইরের লোকের মতো হাঁটছি। বাইরের ঘরের পর্দার সামনে এসে একটু দাঁড়ালাম। একটা মোটা অচেনা গলা কথা বলছে, 'আপনাদের বাড়িটা দেখছি একই রকম রয়ে গেল। আধুনিক হননি, এটা সুলক্ষণ।'

বড়মামার গলা শুনলাম, দু রাত ট্রেনে আসা হলো, হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করলে হতো না।'
'বিশ্রাম ? বিশ্রাম করবে আয়েসী গৃহীরা। যাক, রাত্রের ট্রেনের ব্যবস্থা করে রাখবেন।'
'একটা দিন থেকে গেলে হতো না ?' বড়মামা কেমন গলায় বললেন।
'আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেই এখানে আসতে সম্মত হয়েছি।'
বড়মামার জুতোর শব্দ এবং সেইসঙ্গে 'কোথায় গেলে সব' চিৎকারে আমি চমকে উঠে পর্দায় হাত দিলাম। বাইরের ঘরে ছোট কাঠের টেবিল ঘিরে বেতের সোফাসেট। বড়মামা দাঁড়িয়ে আছেন সোফার পাশে। ঘরের এক কোণে একা পড়ে থাকা ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন তান্ত্রিক, মানে আমার বাবা। আমায় দেখতে পেয়ে বড়মামা বললেন,' এই যে শোম্কুমা, দ্যাখো তোমার জন্য কাকে নিয়ে এসেছি।' একগাল হেসে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে ওঁর দিকে নিয়ে গেলেন বড়মামা। লম্বায় আমি এখন প্রায় বড়মামার চিবুক ছুঁয়েছি। তাই ইজিচেয়ারে বসা মানুষটা আমার দিকে ঘাড় তুলে তাকালেন। আমার খুব লজ্জা, না লজ্জা ঠিক নয়, খুব অস্বস্তি লাগছিল। নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। পা ভরতি ধুলো, গোড়ালি ফাটা ফাটা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম উনি একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বড়মামা বললেন, 'খুব ভাল মেয়ে হয়েছে, পড়াশুনায় খুব মাথা।'
চোখ না সরিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম কি ?'
আমি বলার আগেই বড়মামা বললেন, 'ওকে আমরা শোম্কু বলে ডাকি, ভাল নাম সুবর্ণলতা। মা রেখেছিল।' ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল শরীরটা ঝিম ঝিম করছে, সব কিছু ঘোলাটে দেখছি আমি। অথচ চোখ সরিয়ে নিতে পারছিলাম না কিছুতেই।
'বয়স কত হল ?'
'চৌদ্দ।' বড়মামা জবাব দিলেন।
'এ কি বাকশক্তিরহিত ? তুমি কথা বলছ না কেন ?' ওর গলার স্বরে কেঁপে উঠলাম।
আমি কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। বড়মামা বললেন, লজ্জা পাচ্ছে, কোনোদিন দ্যাখেনি তো! সে বয়সের কথা কারো মনে থাকে না।'
হঠাৎ ওঁর গলার স্বর অন্যরকম শোনাল, 'কিন্তু এ কি আমার কন্যা! আমি এরকম অশুভ লক্ষণযুক্তা কন্যার জন্ম দিয়েছিলাম!'
'কি অদ্ভুত কথা ?' বড়মামার গলায় বিস্ময়, 'শোম্কু ভীষণ পয়া মেয়ে।
জোরে জোরে মাথা দোলালেন উনি, 'থামুন। এ কন্যা ঘোর অলক্ষুণে। আমি এর ললাটের লিখন পড়ে শিহরিত হচ্ছি। যথাশীঘ্র সম্ভব এর গোত্রান্তেরের ব্যবস্থা করুন। এ মেয়েকে গৃহে রাখলে এঁর নিকটাত্মীয়ের জীবনহানি হবে।'
ঠিক সেইসময় বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে ছোটমামা বাইরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

'আরে জামাইবাবু না ? উরেব্বাস, কি পালটে গেছেন। একদম তান্ত্রিক তান্ত্রিক চেহারা।' ছোটমামা বিস্ময় কাটাতে পারছিল না যেন।

'আমি গৃহী নই, ওই সম্বোধন আমাকে করো না।' ওঁকে বলতে শুনলাম !

'ও সরি সরি, একদম খেয়াল ছিল না। আরে শোঙ্কুটা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে কেন ? হোয়াট হ্যাপনড ? এই কি হয়েছে তোর ?' ছোটমামা এগিয়ে এসে আমার হাত ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন হুঁশ ফিরে পেলাম। চট করে হাত ছাড়িয়ে এক ছুটে ভেতরে ফিরে এলাম আমি। কখন যে কাঁদতে আরম্ভ করেছিলাম জানি না। এখন আমি চোখে মুখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সোজা মায়ের ঘরে গিয়ে ফোঁপাতে লাগলাম।

মাথায় হাতের স্পর্শ পেয়ে কোলে মুখ গুঁজে দিলাম। মা কোনো কথা বলছিল না, আমায় একটাও প্রশ্ন করছিল না। শুধু আমার মাথার মধ্যে মায়ের কাঁপা হাত এলোমেলো ঘুরছিল। কাঁদতে কাঁদতে অনুভব করছিলাম পৃথিবীতে এর চেয়ে সুখের জায়গা আর কোথাও নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বড়মামী আমাদের ঘরে এলেন, 'মায়া, উনি হাতমুখ ধুয়ে পুজোয় বসেছেন। পুজা সেরে কথা বলবেন। সেই চেনা মানুষটার হাবভাব কেমন পাল্টে গেছে। আগের মতো তুমি বলতে পারলাম না। যাক তোর দাদার কাছে শুনলাম উনি এখন খুব নাম করা সাধক, প্রচুর ভক্ত।'

মা বললো, আমাকে কি করতে হবে ?'

'উনি বললেন বাড়ির ভেতর প্রবেশ করবেন না। শুদ্ধ বাংলায় কথা বলেন। তা তুই আস্তে আস্তে বাইরের ঘরে চল। পুজো হয়ে গেলে—।'

মা হাসল, 'আমার তো দেখার কোনো আগ্রহ নেই। দাদা নিয়ে এসেছে যাকে তার ইচ্ছে হলে এখানে আসতে পারে।'

'বুঝলাম কিন্তু লোকটা যখন সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে তখন ওকে তো নিয়মকানুন মানতে হবেই। হাজার হোক তোর স্বামী, নে ওঠ। কাপড়টা বদলে আমার সঙ্গে চল। বড়মামী মাকে বোঝাচ্ছিলেন। ঠিক এ সময় বোধহয় ওঁর খেয়াল হলো আমার কথা, আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, 'এই বুড়ো মেয়ে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে পড়ে আছিস কেন ? আরে এ কাঁদছিল নাকি ? হ্যাঁরে তোর বাবা কিছু বলেছে নাকি ?'

আমি জবাব দিলাম না। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। আমি অপয়া মেয়ে ? আমার জন্যে নিকটাত্মীয় মারা যাবে ? নিকটাত্মীয় মানে—। দিদা কি আমার জন্য মারা গেছেন ! কেমন কাঁপুনি লাগছিল শরীরে। গোত্রান্তর মানে যে বিয়ে তা আমি জানি। আমি আবার ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললাম। বড়মামী বারবার জিজ্ঞাসা করতে আমি বলে ফেললাম কথাগুলো। হঠাৎ রেগে গেল মা, কেমন কাঠ কাঠ গলায় বলল, 'এতবড় ধেড়ে মেয়ে কেঁদে মরছিস লজ্জা করছে না ? কেউ তোকে অন্ধ বলল আর তুই অন্ধ হয়ে গেলি ? চোখ খুলে আর দেখবি না ?'

বড়মামী বললেন, 'এ ভারী অন্যায় কথা। এতদিন পরে এসে এসব কথা বলার

কি দরকার ছিল। যাক, ওসব মনে রাখিস না। তুই তাহলে তৈরী হ।'
পায়ের শব্দে ছোটমামাকে দেখতে পেলাম, 'দাদার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?'
বড়মামী বললেন, 'কেন ?'
'এই লোকটাকে ধরে আনতে গেল কেন ? কিছু মনে করিস না দিদি, তোর হয়ত খারাপ লাগছে কিন্তু আমি লোকটাকে পছন্দ করছি না। শালা বউ-মেয়েকে ভাসিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলি আবার অ্যাদ্দিন বাদে ফিরে এসে শোনকুকে যা তা কথা বলেছে। ওসব গেরুয়া ফেরুয়া একদম বুজরুকি, কিস্যু বিশ্বাস করি না আমি। এই শোনকু ওঠ, আমি আজ অফিসে যাব না, কোথাও বেড়িয়ে আসি। ছোটমামা আমার হাত ধরে তুলল।
'না, ও কোথাও যাবে না।' মা বলল।
'আমি তাহলে নেই। রাত্রে বাড়ি ফিরব।' ছোটমামা বেরিয়ে গেল। বড়মামী নিশ্চয় খুব অস্বস্তিতে পড়েছিলেন, কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়লেন, যা হবার তা তো হয়েছে। একটা দিন তো থাকবে—ভেবে দ্যাখ কি করবি।'

আমাকে আর ওঘরে যেতে হয় নি। ফল মিষ্টি ছাড়া কোনো গৃহীর রান্না উনি খান না তাই ঝামেলা কম বড়মামীর। কিন্তু বেলা বাড়তে বাড়িতে লোক আসতে আরম্ভ হল। পাগলাসাধুর যারা শিষ্য তারা নাকি বাবা কোলকাতায় এসেছেন এ খবর পেয়ে দর্শন করতে আসছিলেন। বড়মামা কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না কোলকাতার মানুষরা এই খবর এত তাড়াতাড়ি কি ভাবে পেল! বাইরের ঘরটায় লোক উপচে পড়েছে। মিষ্টির বাক্স মালা ফুলে ভরতি। বড়-মামাকে তারই তত্ত্বাবধান করতে হচ্ছে। উনি সেই ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে ভক্তদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। পাগলাসাধু নাকি দেহরাখার আগে ওর কথা ভক্তদের বলে গিয়েছিলেন কিন্তু ওর পক্ষে কোনক্রমেই কোলকাতায় আসা সম্ভব নয়। দুতিনবার পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি ভক্তদের দেখেছি। বড়ো বড়ো মানুষগুলো কেমন বিগলিত মুখে বসে আছে। ভক্তরা এসে যাওয়ায় বড়মামা আর মাকে নিয়ে যেতে পারে নি ও'র কাছে। বড়মামীকে বলে রেখেছেন সন্ধ্যে-বেলায় স্টেশনে যাওয়ার আগে সাক্ষাৎ করবেন। মা কিন্তু তেমনি শুয়ে আছে। বাইরের ঘরে এত লোকের আনাগোনা, কিন্তু মায়ের ঘরে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।
এখন আমি মানুষটাকে আমার বাবা বলে ভাবতে পারছি না। অথচ এত লোক ও ঘরে এসে কেমন নির্দ্বিধায় ও'কে বাবা বলে ডাকছে। মা যতই বলুক সন্দেহটা বারবার মনের মধ্যে থাবা খুলছে। আমি কি সত্যি অপয়া। মায়ের অসুখ কি আমার জন্যে! ছোটমামা নাকি বড়মামাকে বলেছে শোনকুর বিয়ে হয়ে গেলে জামাইবাবুর কোনো দায় থাকবে না বলে ওইসব বলেছে। আমি কি ও'র দায় ?
এইরকম করে টরে দিনটা কেটে গেল। শেষপর্যন্ত বড়মামা জোর করে ভক্তদের সরিয়ে দিলেন। ঘণ্টা দুই বাদে ট্রেন। টিকিটের ব্যবস্থা এর মধ্যেই এক ফাঁকে

করে রেখেছেন বড়মামা। বড়মামী এখন ঘোমটা মাথায় ও ঘরে দাঁড়িয়ে। উনি যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। বড়মামা বললেন, মায়ার শরীর খুবই অসুস্থ। এ ঘরে আসতে কষ্ট হবে, যদি অনুগ্রহ করে একবার ভেতরে যান।' পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি শুনলাম কথাগুলো। বড়মামা ওঁকে এখন আপনি করে বলছেন, সকালে বলছিলেন না।

'না, গৃহাভ্যন্তরে আমি প্রবেশ করতে অক্ষম। তাছাড়া এখন আমি স্ত্রীকন্যার অস্তিত্ব স্বীকার করি না। সংসার-ধর্ম সন্ন্যাস-ধর্মের শুরুতেই মৃত হয়ে যায়। আমি শুধু একজন রমণীকে দর্শন দিতে পারি। ওর গম্ভীর গলা শুনলাম। বড়মামী বললেন, 'তবু যদি একবার বিবেচনা কর। মায়া খুবই অসুস্থ, বুকের অসুখ।'

'জানি। এই জাগতিক কষ্ট থেকে উদ্ধার পেতে ওর দেরী নেই। আপনারা কন্যার বিবাহ দিন। আমার এক শিষ্যের সুপুত্র আছে। যদিও তার বয়স ত্রিশ বত্রিশ কিন্তু বড় ধার্মিক ছেলে। ওরা ওই পাত্রের জন্য একটি সুন্দরী অল্পবয়সী অর্থাৎ গৌরী সন্ধান করছে। এই কন্যাকে সেখানে দান করুন।' ওঁর সিদ্ধান্ত শুনে আমি নিজের অজান্তে চিৎকার করে উঠলাম, না।'

আমার সমস্ত শরীর গরম হয়ে গেল। মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে। পর্দা সরিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'বড়মামা, ওর কোনো কথা তুমি শুনো না। পাজী খুব খারাপ লোক। ওকে চলে যেতে বল।'

মামা মামী ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে উনি হেসে উঠলেন, 'উম্মাদিনী। লক্ষণ স্পষ্ট। ঠিক আছে, ওর মাতার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে। তাকে সতর্ক করে যাই।'

ওকে এগোতে দেখে দুহাত তুলে দরজা আগলে দাঁড়ালাম আমি, 'না কক্ষনো না। আমার মায়ের কাছে ওকে যেতে দেব না আমি।'

বড়মামী ছুটে এলেন, 'কি পাগলামী করছিস শোনকু। ছাড়, রাস্তা ছাড়।' জোর করে আমায় সরিয়ে নিয়ে গেলেন বড়মামী।

বড়মামার পেছন পেছন ওকে মায়ের ঘরের দিকে যেতে দেখলাম। বড়মামী আমায় শক্ত করে জড়িয়ে থাকায় আমি নড়তে পারছি না।

দরজায় দাঁড়িয়ে বড়মামা বললেন, 'মায়া এদিকে তাকা, ও এসেছে।

'কে?' মায়ের গলা পেলাম।

'সতীশ, মানে—।' বড়মামা কি ভাবে বলবেন ভাবছিলেন।

'দাদা, আমার কাছে সে মৃত। আজ শোনকু ওঘর থেকে ঘুরে আসার পর আমি শাঁখা নোয়া খুলে রেখেছি। আমি এখন বিধবা।'

উনি ভেতরে ঢোকেননি তখনো। কথাগুলো শুনে সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে বাইরের ঘরে চলে এলেন। বড়মামী আমাকে ছেড়ে দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। মামা অসহায় ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে ঘরের দিকে চলে গেলেন।

এখন রাত আটটা। ওরা ঘন্টাখানেক আগে চলে গেছে। বড়মামী রান্নাঘরে।

ছোটমামা ফেরেনি এখনো। আমি মায়ের পাশে বসে পড়ছি। পড়তে ইচ্ছে করছিল না। মা জোর করে বসিয়েছে। বড়মামী অনেক করে বললেও মা আর শাঁখা নোয়া পরেনি। আমার বাবা অনেক আগে মাকে কেন ছেড়ে গিয়েছিলেন জানি না। কিন্তু ওঁর ফিরে আসার কি দরকার ছিল। পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে ভাল রেজাল্ট করতে হবে। এই পৃথিবীতে আমি আর মা এখন একা। বাবার জন্যে আমি গোপনে গোপনে একটা আশা করতাম, আজ সেটা মরে গেল। আমি যে অপয়া নই সেটা প্রমাণ করতে হবে। মাকে আমি মরতে দেব না। সন্ধ্যে থেকে মা খুব সহজ হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। আমার বাঁ হাতটা মায়ের গায়ের ওপর ছিল। পড়তে পড়তে এমন তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম একসময় কোনো খেয়াল ছিল না হঠাৎ অনুভব করলাম আমার হাতের তালুর নীচে কি যেন নড়ছে। কোনো জ্যান্ত জিনিসকে মুঠোয় ধরলে যেমন লাগে। চমকে গিয়ে মায়ের দিকে তাকালাম। পরম নিশ্চিন্তে মা এখন ঘুমুচ্ছে। আর আমার হাতটা ওর বুকের ওপর। আমার হাতের তলায় মায়ের হৃৎপিন্ড।

